যে আলো ছড়িয়ে গেলো সবখানে

অভিজিৎ রায়-এর ৪৪তম জন্মদিন উদযাপন উপলক্ষে লেখা



মুক্তমনা
MUKTO-MONA

সম্পাদকীয়

প্রকাশিত হলো ই-বই 'যে আলো ছড়িয়ে গেলো সবখানে'। মুক্তমনার আহবানে সাড়া দিয়ে ২০১৫ সনে অভিজিৎ রায়ের ৪৪ তম জন্মদিন উপলক্ষে বাংলা এবং ইংরেজি ভাষায় যারা লিখেছিলেন অভিজিৎ রায় ও মুক্তচিন্তা চর্চার পথে তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নিয়ে, তাদের লেখাগুলোর সংকলন আকারে প্রকাশিত হলো ই-বইটি।

২০১৫ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারি 'একুশে বইমেলা' থেকে ফেরার পথে ইসলামি জঙ্গিদের চাপাতির আঘাতে নিহত হবার পূর্ব পর্যন্ত মুক্তমনা প্রতিষ্ঠাতা অভিজিতের সম্পৃক্ততা ছিল বিজ্ঞান, মুক্তচিন্তা, মানবতাবাদ, সাহিত্যসহ অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে। তিনি অনলাইনেই শুধু লেখালেখি করেন নি, একইসাথে বাংলাদেশের মুক্তচিন্তার আন্দোলনকে দেশে-বিদেশে নিয়ে গিয়েছেন এক অনন্য উচ্চতায়। অভিজিৎ রায় বাংলায় লিখেছেন এবং সম্পাদনা করেছেন দশটি বই। তিনি ছিলেন, আছেন ও থাকবেন সারা বিশ্বের মুক্তচিন্তক, স্বাধীনচেতা, উদারমতাবলম্বীদের বন্ধু হয়ে।

ই-বইটি প্রকাশনায় যারা বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছেন, লেখা পাঠিয়েছেন মুক্তমনার পক্ষ থেকে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা। 'যে আলো ছড়িয়ে গেলো সবখানে' ই-বইটি বিনামূল্যে বিতরণের জন্য উন্মুক্ত।

মুক্তমনা
১২ সেপ্টেম্বর, ২০১৬

মুক্তমনা MUKTO-MONA

সূচিপত্র

অভিজিৎ রায়ের ৪৪তম জন্মদিন উদ্‌যাপন উপলক্ষে লেখা

মুক্তমনা MUKTO-MONA

শুভ জন্মদিন অভি

বন্যা আহমেদ



তোমাকে চিঠি লিখি না অনেক দিন। আজকের দিনে চিঠি না লিখলে তুমি অভিমানী হাসি হেসে বলতে, “হুঁহুঁ, তুমি কতদিন ধরে আমাকে চিঠি লেখ না সেটার হিসাব কিন্তু আছে আমার কাছে।” যে কম চিঠি লিখত সেই যেন হেরে যেত। এটা বোধ হয় তোমার করা নিয়মগুলোর একটা, তাই না? এভাবে নিষ্ঠা ভরে হাতে চিঠি লেখাটা কিভাবে শুরু হয়েছিল আমাদের মধ্যে? এক বাসায় থেকেও বছরের পর বছর চিঠি লিখেছি আমরা একজন আরেক জনকে। অদ্ভুত সব নিয়ম ছিল তোমার। তোমার সাথে সম্পর্ক হওয়ার পর অবাক হয়ে দেখলাম ঝগড়ার পর যে প্রথম আত্ম সমর্পণ করে সেই নাকি জেতে! খুব অদ্ভুত লেগেছিল এই পুরো ধারণাটা প্রথমে শুনে। গোঁ ধরে, শক্ত হয়ে বসে থেকে জেতাটাই নাকি জেতা নয়, বরং মহত্ত্ব দেখিয়ে আগে এসে ভাব করে সেই নাকি জেতে!

সেদিন আমার-তোমার হাতে লেখা কয়েকশো চিঠি নিয়ে বসেছিলাম মাটিতে পা ছড়িয়ে বসে। আমি তোমার লেখা চিঠিগুলো সযতনে তুলে রেখেছিলাম। হাসপাতাল থেকে বাসায় এসে তোমার ড্রয়ারগুলো খুলে দেখলাম তার একটাতে তুমিও একইভাবে আমার চিঠিগুলো সব একসাথে করে জমিয়ে রেখেছ। আর তো কোনদিন তুমি চিঠি লিখবেনা, তাই আমার তোমার সব চিঠিগুলো মিলিয়ে দিয়েছি এক সাথে। তোমার সেই সিঙ্গাপুর থেকে পাঠানো ফেড-এক্সের বড় বড় প্যাকেটগুলোতে।

২০০৩ সালে লেখা একটা চিঠিতে দেখলাম তোমাকে এই রবীন্দ্রসংগীতটা পাঠিয়েছিলাম,

অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া--

দেখি নাই কভু দেখি নাই এমন তরণী বাওয়া॥

কোন্ সাগরের পার হতে আনে কোন্ সুদূরের ধন--

ভেসে যেতে চায় মন,

ফেলে যেতে চায় এই কিনারায় সব চাওয়া সব পাওয়া॥

পিছনে ঝরিছে ঝরো ঝরো জল, গুরু গুরু দেয়া ডাকে--

মুখে এসে পড়ে অরুণকিরণ ছিন্ন মেঘের ফাঁকে।

ভেবে দেখলাম, সবই আসলে এখনো একইরকম আছে, শুধু গানটার সবগুলো ক্রিয়াপদ আজ অতীত কালে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। আমরা শেষ চিঠি আদান প্রদান করেছিলাম ১৪ই ফেব্রুয়ারি, ২০১৫, ভ্যালেন্টাইন্স ডে তে, সেই জাপানিজ রেস্টুরেন্ট এ বসে, দেশে রওনা দেওয়ার একদিন আগে। তোমাকে সেদিন যে চিঠিটা লিখেছিলাম সেটা আবারো পড়লাম, পড়তে পড়তে মনে হলো, আচ্ছা, এটাই কেন তোমাকে লেখা শেষ চিঠি হতে হবে? তুমি না হয় আর লিখতে পারবে না, কিন্তু আমি তো পারি। উত্তর না হয় না'ই বা পেলাম, পার্থিব তিথিডোরে বাঁধা আর নাইবা থাকলাম। উত্তর'ই বা কেন পেতে হবে তোমাকে লিখতে হলে? দেখেছ, আমার কত ধৈর্য বেড়েছে, কতই না খারাপ কথা বলেছ জীবনে আমার ধৈর্যের অভাব নিয়ে!

তুমি হাসছ নিশ্চয়ই রবীন্দ্রসংগীত দেখে। রবীন্দ্রনাথের সাথে আমার ভালোলাগা খারাপ লাগার সেই অস্তি-নাস্তির বিরোধটা কোনদিনও আর মিটলোনা কিন্তু। রবীন্দ্রসংগীত না থাকলে আমি এই দেড় বছরে বারবার যেন মারা যেতাম। রবীন্দ্রনাথের সাথে আমার

কতই না বিরোধ - তার রাজনৈতিক-দৃষ্টিভঙ্গি, শ্রেনী-দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে, তার নারী-দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে; কিন্তু তার গানে এসে যেন এক অজানা ভাল লাগায় বিলীন হয়ে যাই। জানো, আমাদের সেই বাসাটার লম্বা করিডোরে ঘণ্টার পরে ঘণ্টা হেঁটেছি আর গান শুনেছি। এটাই আমার থেরাপি, এটাই আমার নিজেকে একসাথে ধরে রাখার অস্ত্র যেটা কক্ষনো আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। এত ডাক্তার, এত সাইকিয়াট্রিস্ট এর ভিড়ে এই গানগুলোই ছিল আমার সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয়।

তোমার জন্মদিনটা কাছে আসতে থাকলে আমি ক্রমশ অস্থির হয়ে উঠতে থাকি। কী অদ্ভুত না? ২৬ শে ফেব্রুয়ারিতে এমনটা হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু কেন যেন ওই দিনটাতে এরকম লাগেনি। তোমার জন্মদিনটা আমার দিকে কী যেন এক অবোধ্য অসহনীয় ভার নিয়ে ধেয়ে আসতে থাকে। তৃষাও বারবার বলছে এ দিনের কথা। জানো, ও এখনো তোমার হয়ে ওকালতি করার চেষ্টা করে। সেদিন বলছিল, 'ড্যাড কত্ত সুখী একটা মানুষ ছিল, তুমি যদি ওকে ব্যায়াম করার জন্য এত জোরাজুরি না করতে তাহলে ওর অতটুকু দুঃখও থাকতো না।' সেই আগের মতোই মনে হচ্ছিল কষে দুটো থাপ্পড় দেই।

এ বছর তোমার বয়স ৪৫ হতো। আমি নিশ্চিত যে স্নিগ্ধা তোমাকে আবারো আরেকবার মনে করিয়ে দিতো যে তুমি আমাদের চেয়ে বয়সে তিন বছরের ছোট হলেও পঁয়তাল্লিশের পরে সবাই বয়সে সমান হয়ে যায়। আর তুমি খুবই উল্লসিত হয়ে সুযোগের সদ্ব্যবহার করে বলতে, তোমাদের মত বয়স্ক মহিলাদের চেয়ে আমি সবসময়েই ছোট থাকবো!

বারবার কেন চমকে উঠি বলতো? দেড় বছর পার হয়ে গেল? দেড় বছর কি অনেকটা সময়? নাকি অল্প সময়? নাহ এই প্রথম ভাবিনি সময় পেরিয়ে যাওয়ার কথা। প্রায়ই ভাবি, প্রায়ই মনের ক্যালেন্ডারে বসে বসে দিন গুনি, সপ্তাহ গুনি, সেই ২৬ তারিখ থেকে শুরু করে। মজার ব্যাপার হচ্ছে যতবারই ভাবি ততবারই চমকে উঠি! কিন্তু কেন উঠি চমকে? সময় তো বয়ে চলারই কথা, তাই না? কিন্তু তারপরও এই নিত্য-বহমান অনিত্যের স্রোতে বারবার যেন ধাক্কা খাই। মাথা আর মনের এই যুদ্ধটার অর্থ কি আমরা কোনদিন বুঝবো? আমরা কি কোনদিন জ্ঞানের সেই মোহনায় পৌঁছব যখন এরা দুজন একই লয়ে চলবে? নাকি এরা আসলে সম লয়েই চলে, এদের আপাত-দ্বিচারিতাটার গূঢ়ার্থটা আমরা ধরতে পারি না। এত জ্ঞানবিজ্ঞানের ছড়াছড়ি চারদিকে, কিন্তু আমরা এখনো কতকিছুই জানি না, কতকিছুই বুঝি না। এটা নিয়েও আমরা কতই না আলোচনা করেছিলাম, নাকি বিতর্ক করেছিলাম, নাকি স্রেফ ঝগড়া?

কী অদ্ভুত এক আসা যাওয়ার পার্থিব গল্পে ভুলে থাকি আমরা। কত গল্প, কত ছল, কত বলা কথার মালা, কত না বলা কথার কষ্ট। কিন্তু একবার আসলে তো যেতেই হবে, গল্প একবার শুরু হলে তো সেই নটে গাছটাও মুড়োবে, তাই না? আজকাল প্রায়ই ভাবি, দুঃখ আর আনন্দ কি আসলেই দুটো বিপরীত ধারা? নাকি একই ধারার দুটো রূপ, একই স্কেলের দুই প্রান্ত। দুটি বিপরীত প্রান্ত বাঁকিয়ে গোল করে ধরলেই কি ওরা এক জায়গায় মিলেমিশে একাকার হয়ে যাবে না?

দুঃখ পেলেই কেন কষ্ট পেতে হবে? অতীতের কোন খারাপ স্মৃতি, কষ্টের স্মৃতি আমাদের ব্যথা দেয়, আবার দেখ অতীতের ভাল স্মৃতিগুলোও বেদনা দেয়। তখন আবার ভাল গল্পগুলো এখন আর নেই কেন ভেবে আমরা শোকে মুহ্যমান হই। কেন তা হবে? যুক্তি দিয়ে চিন্তা করলে কি তাই হবার কথা? সুখের কোন স্মৃতি ছিল এতোটা সময় ধরে, সেটা কি একধরনের আনন্দের প্রবহ হয়ে উঠতে পারে না?

মনে আছে, তোমার আমাকে সময়ের বৈজ্ঞানিক ধারণাটা বোঝানোর কথা ছিল আর আমার তোমাকে মিউটেশনের বংশগতীয় ব্যাখ্যা বোঝানোর কথা ছিল? আমি আমার কাজটা সম্পূর্ণ করেছিলাম। তুমি কিন্তু করোনি। এটা অবশ্য ঠিক, বেশ কয়েকবারই চেষ্টা করেছিলে তুমি। যতবারই মনে হয়েছে বুঝেছি ততবারই আবার পরক্ষণেই মনে হয়েছে কিসব গাঁজাখুরি কথাবার্তা। রাজর্ষির ঠিক এমনটা হয়েছিল মহাভারত নিয়ে আমাকে শেখাতে গিয়ে। পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে কিছু বললেই তুমি বেশ তেড়ে এসে বলতে 'পদার্থবিজ্ঞানের নীতিগুলো না থাকলে তোমার জীববিজ্ঞানের 'জ'ও শুরু হতে পারতো না।'

সে যাক, সময় নিয়ে যা বলছিলাম, তুমি যে শুধু সময়ের ধারণাটা আমাকে বুঝিয়ে দিয়ে যাওনি তাই'ই নয়, আমাকে এ বিষয়ে আরও বিভ্রান্ত করে দিয়ে চলে গেছ। ২৬ শে ফেব্রুয়ারির পর থেকে আরও তালগোল পাকিয়ে গেছে সবকিছু, সময় ব্যাপারটা আমার মাথায় পুরোই অবোধ্য হয়ে গেছে।

আদিতে তো সময় ছিল না, এখন কেন আছে? সময় না থাকলে কিই'বা হতো বলোতো? তাহলে কী অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সব মিলে মিশে একাকার হয়ে যেত? আর সময়ের সাথে মানুষের সচেতনতার ব্যাপারটা যুক্ত করলে তো আর কথাই নেই। ধরো সময় কি সবসময়ই পরিবর্তনের সাথে যুক্ত? আমাদের সচেতন সত্তা কি শুধু বর্তমানের সাথেই সম্পর্কিত? কিন্তু বর্তমানটা তো বড্ড ক্ষণিকের। এই আছে, এই নেই। আমরা তো অতীতের কথা মনে রাখতে পারি আবার ভবিষ্যতের প্রত্যাশায় দিন গুনি। তাহলে কি

আমাদের সচেতন সত্তা বর্তমানের ক্ষণিকের গণ্ডি পেরিয়ে অতীত আর ভবিষ্যতেও বিস্তৃত? কিন্তু সেটাই বা কী করে সম্ভব?

দেখো আমাদের অস্তিত্বের কত কিছুই না বৈপরীত্যে ভরা! এই অন্তহীন মহাবিশ্ব আমাদের অস্তিত্ব নিয়ে একেবারেই উদাসীন। কোন উদ্দেশ্য নেই, লক্ষ্য নেই, বিক্ষিপ্ততার তান্ডব সর্বত্র। কিন্তু তার মাঝেই আবার আমাদের উদ্ভব তো ঘটেছেই, আর আমরা পাগলপারা হয়ে এই উদ্দেশ্যহীনতার উদ্দেশ্য খুঁজে চলেছি কতভাবে। এই দ্বৈধতা আমাদের অস্তিত্বের, আমাদের চেতনার সর্বত্র বিস্তৃত। যেমন ধরো, আমরা উদ্দেশ্যহীন এই মহাবিশ্বের জ্বলন্ত সব বিধ্বংসী অগ্নিকুন্ড দিয়ে পরিবেষ্টিত হয়ে থেকে, নিজেদের ধূলিকণার চেয়েও তুচ্ছাতিতুচ্ছ অস্তিত্বের বাহাদুরিতে আপ্লুত হয়ে কী সুন্দর করে ভেবে নেই আমাদের সারা জীবনটা দুধেভাতে-সুখেই কাটবে। মহাবিশ্বের অনন্ত মহাপ্রলয় আমাদের গায়ে আঁচড়টাও কাটতে পারবে না। সেটা কি আর হয়? 'সংসারের এই দোলায় সংশয়েরি ঠেলা' তো অমোঘ নিয়মেই লাগবে। বিশ্বের নিয়মের বিপক্ষে দাঁড়ালে তো নিয়ত দুঃখ পেতেই হয় তখনি তো "বেজে উঠে পঞ্চমে স্বর, কেঁপে উঠে বন্ধ এ ঘর"। কিন্তু তারপরেই আবার সেই আদি প্রশ্ন চলে আসে, তাহলে দুঃখ ব্যাপারটার অর্থই বা কী।

মাথা আর মনের দ্বন্দ্বে জর্জরিত হয়ে আছি তো সেই ছোটবেলা থেকেই। মনে আছে তুমি বলতে এই পৃথিবীতে আমরা বড্ড মিসফিট। জানো আমি যখন বলি যে আমি এত কিছুর পরও নিজেকে এই ছন্নছাড়া পৃথিবীর অনেক মানুষের চেয়ে ভাগ্যবান মনে করি তখনো কিন্তু বুঝেই বলি। এখানেও সেই দ্বৈধতা। ওই ছোটছোট অভাগা চিবক মেয়েগুলো, আইসিসের হাতে ইয়াজিদি যৌনদাসীরা, প্যালেস্টাইনের হররোজ নিপীড়িত মানুষ আর হাজার হাজার সিরিয়ান আফগানিস্তানী সবহারা উদ্বাস্তু মানুষগুলোর চেয়ে ভাগ্যবান তো বটেই আমি। চারদিকে কতই না হানাহানি মারামারি, লোভের আগুনের লেলিহান শিখায় জ্বলেপুড়ে যাচ্ছে কত দেশ কত সভ্যতা। বলতো এই ধরাকে শুচি করার সেই অগ্নিস্নান ঘটবে কবে?

অথচ এই ছোট্ট পৃথিবীটা উদ্দেশ্যহীনতার অঞ্জলি ভরে আমাদের যে উপহার দিয়েছিল তা দিয়েই কিন্তু দিব্যি ভাল থাকতে পারত আমাদের এই সাতশো কোটি সদস্য। কিন্তু তাই কি আমরা হতে দিতে পারি? পারি না। তাই জীবনানন্দকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছে, পৃথিবীর এই ভীষণ অসুখ তবে কীসে সারবে? সারবেনা হয়ত কখনই। কিন্তু সারানোর চেষ্টাটাও থামবে না হয়ত কোনদিন।

আমাদের সম্পর্কটা কতখানি ভাল ছিল সেটা নিয়ে কেউ বলতে আসলে কেমন যেন বিরক্ত হয়ে উঠি। দুটো মানুষের বছরের পর বছর একসাথে থাকাটাই অনেক কষ্টসাধ্য একটা ব্যাপার। সেই দুটো মানুষ যদি সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন দুটো মানুষ হয় তাহলে কাজের পরিমাণটা আরও অনেক বেড়ে যায়। আর তার উপরে আবার প্রকৃতির নিয়মে সদা নিভে আসা প্রেমের বাতিকে বারবার প্রজ্বলিত করে একসাথে থাকা তো রীতিমত একটা দুঃসাধ্য ব্যাপার। সেই দুঃসাধ্য সাধনেই ব্রতী হয়েছিলাম আমরা দুজনে। অন্যসব যুগলের মতই ঝগড়া তো আমরা কম করিনি, ছেড়ে চলে যাওয়ার প্রান্তে এসে পৌঁছেছিলাম বহুবারই। আর একটু মৃদুমন্দ বাতাস লাগলেই টুপ করে পড়ে যেতে পারতাম ওপ্রান্তে।

লুকিয়ে ফারাবির মত ইতরটার সাথে বিতর্ক (আমার মতে নোংরা ক্যাচাল) করার পর কতগুলো দিনই না খারাপ ছিল আমাদের সম্পর্ক! এটা আর জোড়া লাগার কথাও ছিল না। চিঠিগুলো সাক্ষী হয়ে আছে সেই উত্তাল সময়টার। ওই সময়ের চিঠিগুলো পড়ে বুঝলাম দুজনার কী পরিমাণ অক্লান্ত প্রচেষ্টায় আবার জোড়া লেগেছিল আমাদের সম্পর্কটা। না জোড়া লাগা বললে ভুল হবে, আবার নতুন করে শুরু করেছিলাম, নতুন করে প্রেমে পড়েছিলাম মাথা দিয়ে, মন দিয়ে, আরও কিছুদিন একসাথে থাকতে চাই আমরা দুজন এটা ভেবে। জানো স্নিগ্ধাকে ২৫ শে ফেব্রুয়ারি রাতে (তুমি যেদিন দীপনের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলে) বলেছিলাম, ও যখন আমাকে নামিয়ে দিচ্ছিল আমাদের বাসায়, ‘ গত কতগুলো মাস আমাদের এত্ত ভাল একটা সময় যাচ্ছে যে আমার ভয় হয় এটা বেশীদিন থাকবেনা’। তারপর ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই যা ঘটলো....। কুসংস্কারে বিশ্বাস করতে পারলে হয়তো ভাবতে পারতাম যে ওটা প্রিমোনিশান বা দৈব-পূর্বাভাস টাইপের কিছু একটা হয়তো।

মাঝে মাঝেই ভাবি, আমাদের দুজনার মাঝের সংযোগটা ঠিক কোথায় ছিল? নাকি তা সীমাহীন সম্ভাবনার মাঝে পরিণদ্ধ ছিল। সাধারণত সমাজে যা থাকে- অর্থনৈতিক, সামাজিক, সন্তানের স্বার্থ এসব কোন কিছু দিয়েই বাধা ছিল না আমাদের সম্পর্ক।

তুমি আমাকে লিখতে বলতে। এই একটা জিনিস নিয়েই জোরাজুরি করেছো তুমি, আর কিছু নিয়ে কি করেছো কখনো? মনে পড়ে না। আমি লিখি না কেন - আমার পছন্দের বিষয়গুলো নিয়ে, রাজনীতি এবং অর্থনীতির চিন্তাগুলো নিয়ে, আমার ব্যক্তিগত অনুভূতি নিয়ে - মুক্তমনায় আরও লিখি না কেন, এ নিয়ে কতই না বলেছ, বারবার বলেছ। বিশেষ করে ব্যক্তিগত কোন বিষয় নিয়ে লেখালেখি আমি খুব অপছন্দ করি। আমার কেন যেন

মনে হয়, আমার ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ-ভালোবাসা-পাওয়ার আনন্দ-হারানোর কষ্টগুলো একান্তই আমার, এখানে আমার খুব কাছের দুই একজন ছাড়া আর কারো প্রবেশ থাকা উচিত নয়। আর তাছাড়া আমি এগুলো জানানোর প্রাসঙ্গিকতাও খুঁজে পাইনি কখনো। ফেসবুকে তোমার জন্মদিনটা দেখা যায় বলে কতই না হাসাহাসি করছিলাম, শ'য়ে শ'য়ে 'শুভ জন্মদিন' শুনে মনটা নারসিসিস্টিক ভালোবাসায় ভরে গেছে কিনা জানতে চেয়েছিলাম। মনে পরে আমার ক্যান্সারের সার্জারির সময় আমাকে নিয়ে যে লেখাটা লিখেছিলে সেটার জন্য কত বিপদে পড়েছিলে তুমি?

অনেকেই বলে আমাদের চিঠিগুলো প্রকাশ করা উচিত। এই কথাটা শুনলেই এক ধরণের স্বার্থপর ক্ষোভে মনটা ভরে ওঠে আমার। মনে হয়, ইশ, এগুলো এখন একান্তই আমার। আমাদের একজন কমন বন্ধু কিছুদিন আগে বেশ মজার একটা কথা বলেছে। বলেছে আমার নাকি সাহস নেই ব্যক্তিগত জিনিসগুলো সবার সাথে শেয়ার করার। এভাবে কখনোই ভেবে দেখিনি কিন্তু। আমার সাহস কম এ কথাটা শুনতে আমি একদমই অভ্যস্ত নই, তাই জোরে হেসেই উঠেছিলাম। কিন্তু সে যাই হোক, এবার ভেবেছি আমার এই জমা হয়ে থাকা কথাগুলো প্রকাশ্যেই লিখব তোমার জন্মদিনে। হয়তো তুমি খুশী হতে দেখলে, এই ভেবে। তোমার মুক্তমনাতেই না হয় লিখলাম। তোমাকে এখন সত্যিকারের চিঠি লেখার কোন দৈব-সুযোগ থাকলে দৈব-পোষ্ট বক্সে এভাবেই লিখে চিঠিটা ফেলে দিয়ে আসতাম।

তুমি সব বইতে লিখতে যে আমি তোমার সব চেয়ে বড় সমালোচক। কিন্তু জানো আমি এখন ভেবে দেখলাম তুমিও আমার সবচেয়ে বড় সমালোচক ছিলে। সারকাজম, হাসিঠাট্টা, খোঁচাখুঁচি তো আমাদের সবধরনের কথাবার্তা, যোগাযোগের একটা অবশ্যম্ভাবী অংশ ছিল। তুমি আমাকে যেভাবে চিনতে, যেভাবে সমালোচনা করতে সেটা মনে হয় না আর কেউ কোনদিন করেছে। তুমি আমার চেয়েও বেশী কড়া ফেমিনিস্ট ছিলে। হাসাহাসিও তো করতাম আমরা সেটা নিয়ে অনেক। তাই কখনোই তোমার সামনে আমার শক্ত আবরণটুকু ভেদ করে অত্যন্ত গভীরের অরক্ষিত অংশগুলো উন্মোচন করতে দ্বিধা বোধ করতে হয়নি।

তুমি ডাক দিয়েছ কোন্‌ সকালে কেউ তা জানে না,

আমার মন যে কাঁদে আপন মনে কেউ তা মানে না।।

ফিরি আমি উদাস প্রাণে, তাকাই সবার মুখের পানে,

তোমার মতো এমন টানে কেউ তো টানে না।।

আকাশে কার ব্যাকুলতা, বাতাস বহে কার বারতা,

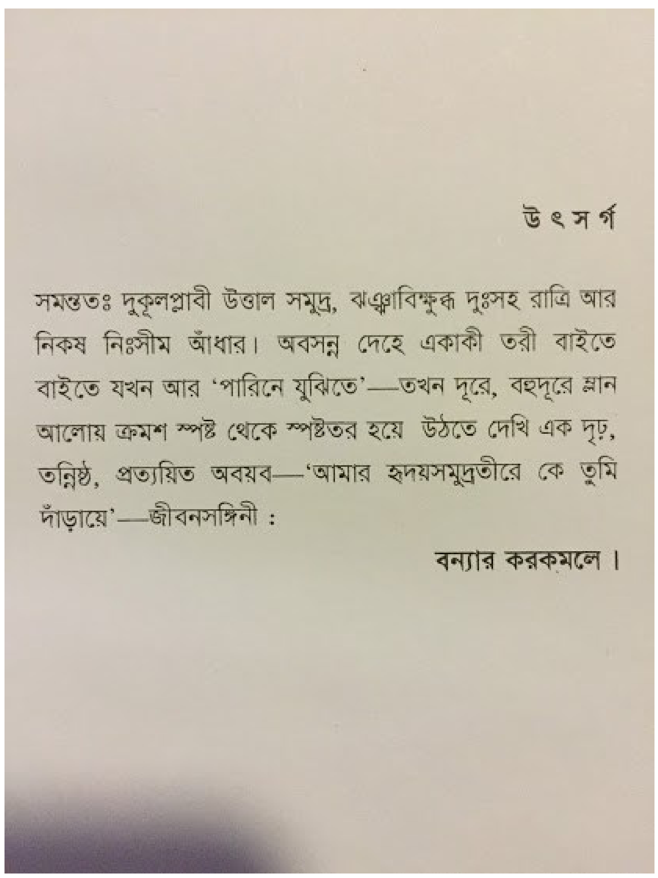
এ পথে সেই গোপন কথা কেউ তো আনে না।।

জানো, আমি তোমাকে দিনের নানা কাজে সারাদিন কখনই মিস করি না, কিন্তু হাজারো ছোট জিনিসে মনে পড়ে যায় কতকিছু। রেস্টুরেন্টে বসে পানির গ্লাসটা টেবিলে উল্টে ফেলে দিলে তোমার কথা মনে পড়ে। মনে হয়, তুমি থাকলে বলতে, 'এই যে আমাকে আর তৃষাকে সারাক্ষণ টেবিল ম্যানার নিয়ে জ্ঞান দাও, আসলে মেসটা তুমিই সবচেয়ে বেশী কর।' সন্ধ্যাবেলাগুলো কেমন যেন দুঃসহ হয়ে ওঠে, মনে হয় আমি আর এর ভার নিতে পারছি না, দিনটা ফুরোলেই তো পারে। মনে আছে আমার এত প্রাইভেট থাকা, বিভিন্ন সময়ে অনমনীয় সব কর্পোরেট সিদ্ধান্ত নেওয়া এগুলো দেখে বলতে 'বাম মতাদর্শে বিশ্বাস কর কিন্তু আসলে তুমি একটা ইন্ডিভিজুয়ালিস্টিক ক্যাপিটালিস্ট অ্যাসহোল।' আমরা দুজনেই দুজনের সবচেয়ে বড় সমালোচক ছিলাম, হয়তো সেটাই আমাদের পরবর্তী স্তরে ওঠার পাথেয় হিসেবে কাজ করতো।

তোমার সাথে আমার বেশ কয়েকটা ঝগড়া বাকিই থেকে গেল। আমি কিছুতেই তোমার উপর থেকে একটা রাগ সরাতে পারছি না। তুমি কেন এত্ত অসতর্ক, এত নির্লিপ্ত ছিলে সবকিছু নিয়ে? এটা নিয়ে তোমার সাথে কতই না ঝগড়া হয়েছে। মনে আছে তোমার কিছু হলে আমার কী হবে ভাবো কিনা জিজ্ঞেস করেছিলাম একদিন তুমি বলেছিলে, 'তুমি অনেক শক্ত মেয়ে, তুমি নিজেই নিজেরটা দেখতে পারো, আমারটাও পারো।' এই কথাটা ভাবলেই আমার অনেক রাগ হতো, মনে হতো দায়িত্ব এড়ানোর জন্য বল এটা। জানো মাঝে মাঝে মনে হয় কেন আমি প্রতিদিন মেলায় যেতে রাজি হলাম? কেন শেষদিন বাধা দিয়েও শেষ পর্যন্ত গেলাম? কিন্তু সাথেই সাথেই সেই চিন্তাগুলো থামাই। বাধা তো তোমাকে ১৩ বছরে বারবার বহুবার সবকিছুতেই দিয়েছিলাম। তুমি এবার দেশে গিয়ে যেরকম খুশী ছিলে সেটা মনে করে নিজেকে থামাই। একুশে ফেব্রুয়ারিতে রিকশা করে ঘুরে ঘুরে তোমাদের ঢাকা ইউনিভার্সিটির সেই পুরনো বাসা, পুরনো উদয়ন স্কুল, তোমাদের সেই আড্ডা মারার জায়গাগুলো দেখাতে দেখাতে তুমি যেরকমভাবে খুশী হয়ে উঠছিলে সেটার জন্য হলেও তো আমার বাধা দেওয়া ঠিক হতো না। ২৬ শে ফেব্রুয়ারির সন্ধ্যায়ও আমরা হাত ধরে মেলা থেকে বেড়িয়ে আসার সময় 'চলো আমরা ইলোপ করি' বলে যেভাবে হেসেছিলে সেটার জন্য হলেও আমার তোমাকে নিষেধ করা ঠিক হতো না।

তুমি প্রায়ই হেসে বলতে 'এত যে ঝগড়া কর, একদিন আমি না থাকলে বুঝবা'। তুমি যা যা বোঝাতে চেয়েছিলে তার সবটা গত দেড় বছরে বুঝেছি কিনা জানি না তবে একটা ব্যাপার বুঝতে পেরেছি- তোমার অনেক দোষ-গুণই অনেক মানুষের মধ্যে আছে, অনেক কিছুই হয়তো পাওয়া যাবে অন্য মানুষের মধ্যে। কিন্তু একটা মানবিক বৈশিষ্ট্যের বড্ড আকাল পড়েছে এই পৃথিবীতে- উদারতা। আমি-তুমি খুব সচেতনভাবেই অনেক কিছুতে ভিন্ন মত পোষণ করতাম দার্শনিক, রাজনৈতিক এবং তত্ত্বগতভাবে, বিতর্ক করতাম, ঝগড়া করতাম - অনেকের চেয়ে বেশীই হয়ত করতাম। কিন্তু মানসিক উদারতার বৃহত্তর বর্ণালিতে এসে সেই ভিন্নতাগুলো কেমন করে যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে যেত। খুব অবাক হয়ে দেখি, চারদিকে মানুষের মধ্যে অনেক কিছু আছে, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সচেতনতা, বুদ্ধি, যোগ্যতা, অযোগ্যতা - কিন্তু উদারতাটা কেমন যেন একটা দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যে পরিণত হয়েছে। তোমার ওই হাসিমাখা উদারতাটুকুই না হয় থাকা আমার একান্ত হয়ে।

তুমি ২০ শে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় আমার হাতে তোমার নতুন বইটা, ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো এক রবি বিদেশিনীর খোঁজে' বইটা দিয়ে উৎসর্গের পৃষ্ঠাটা পড়তে বলেছিলে। তোমার সেই বিশ্বাসটাই আমাকে শক্তি দিক সব ভুলে আবার সামনে এগিয়ে যাওয়ার।



উৎসর্গ

সমন্ততঃ দুকূলপ্লাবী উত্তাল সমুদ্র, ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ দুঃসহ রাত্রি আর নিকষ নিঃসীম আঁধার। অবসন্ন দেহে একাকী তরী বাইতে বাইতে যখন আর 'পারিনে যুঝিতে'—তখন দূরে, বহুদূরে ম্লান আলোয় ক্রমশ স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠতে দেখি এক দৃঢ়, তন্নিষ্ঠ, প্রত্যয়িত অবয়ব—'আমার হৃদয়সমুদ্রতীরে কে তুমি দাঁড়ায়ে'—জীবনসঙ্গিনী :

বন্যার করকমলে।



আলো হাতে অভিজিৎ রায়

প্রদীপ দেব

অভিজিৎ রায়ের লেখা আমি প্রথম পড়ি সাপ্তাহিক যায় যায় দিনে। শফিক রেহমানের সাপ্তাহিক যায় যায় দিন বাংলাদেশে এক সময় বেশ জনপ্রিয় ছিল। অভিজিৎ রায়ের লেখাটির শিরোনাম মনে নেই, তবে বিষয়বস্তু মনে আছে। বাংলা সাহিত্যে যৌনতা প্রকাশের মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ বা এরকম কিছু। লেখাটি এতটাই আধুনিক এবং অন্যরকম ছিল যে অভিজিৎ রায় নামক লেখকের অন্য লেখার খোঁজ করতে শুরু করি।

টেকনোলজিতে আমি খুঁড়িয়ে চলা মানুষ। ইন্টারনেটে যে তিনি বিপুল কর্মযজ্ঞ শুরু করে দিয়েছেন তা জানতেও পারিনি সেই সময়। ২০০৫ সালের শেষের দিকে আজিজ সুপার মার্কেটের বইয়ের দোকান থেকে পেয়ে গেলাম 'আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী'। বইটা পড়ে মনে হলো অভিজিৎ রায় সত্যিই আলো হাতে বের হয়ে পড়েছেন আমরা যারা মনের কোণের অন্ধকারে ঈশ্বরের-ইচ্ছা-ছাড়া-গাছের-একটা-পাতাও-নড়ে-না জাতীয় অন্ধ-বিশ্বাসে ভর করে বেঁচে আছি তাদের চোখ খুলে দিতে। বইটি পড়তে পড়তে মুগ্ধ হয়ে ভাবতে বসলাম - এভাবেও বিজ্ঞান লেখা যায়? এত গভীর অথচ একটুও ভার লাগে না। এত জটিল বিষয় অথচ কত স্বচ্ছন্দ। বাংলায় বিজ্ঞান রচনায় একটা নতুন মাইলফলক স্থাপন করেছেন অভিজিৎ রায় তাঁর প্রথম প্রকাশিত বইয়ের মাধ্যমে।

'আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী'র মলাট-তথ্য থেকে জানতে পারি 'মুক্তমনা' ওয়েবসাইট সম্পর্কে। মুক্তমনা ততদিনে পাঁচ বছর পার করে ফেলেছে। মুক্তমনা শব্দটি এতটাই জুৎসই এবং জোরালো ছিল আমার কাছে যে মুক্তমনার নিয়মিত পাঠক হয়ে উঠতে আমার বেশিদিন সময় লাগেনি। মুক্তমনার যে ব্যাপারটি আমাকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করেছিল তা হলো সত্যিকারের মুক্তভাবে আলোচনার একটা প্লাটফর্ম। গভীর বিশ্লেষণ আর যুক্তির চর্চা চলছে সেখানে।

বাংলাদেশের গ্রামে প্রায় গর্তজীবী হয়ে বেড়ে উঠেছি আমি। সেখানে নিত্যদিন দেখেছি পেশির জোরের জয়। পেশির জোর বেশি না থাকলে নিদেন পক্ষে গলার জোর। বাংলাদেশে সবকিছুই বড় বেশি ব্যক্তিনির্ভর। বস্তুনিষ্ঠতার ঠাঁই সেখানে নেই বললেই চলে। এ ব্যাপারে অনেকের মতো আমারো অনেক ব্যক্তিগত তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে।

বাংলাদেশে আমার পুরো কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় জীবন কেটেছে ইসলামী ছাত্রশিবিরের শাসনে তলোয়ারের ভয়ে মুখে কুলুপ এঁটে। একটা ঘটনার কথা বলা যাক। বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান

বিভাগে প্রফেসর জামাল নজরুল ইসলামের সেমিনার 'কোরান তেলাওয়াত' ছাড়া শুরু হওয়ায় ভীষণ ক্ষুব্ধ হয় ছাত্রশিবির। তাদের সাথে যোগ দেয় বিভাগের অনেক মৌলবাদী ইসলামী-পদার্থবিজ্ঞানী। কিন্তু বিভাগীয় সভাপতি বললেন, "বিজ্ঞানের সেমিনার কি কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান? আকিকা কিংবা জানাজা? জানাজায় গিয়ে আমি বিগ ব্যাং ও ব্ল্যাক হোলের তত্ত্ব আলোচনা করতে শুরু করলে ভালো লাগবে? বৈজ্ঞানিক সেমিনারে ধর্ম টেনে এনো না।" ছাত্র শিবির বললো, "তোমাকে টেনে ব্ল্যাক হোলে ঢুকিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করছি ব্যাটা নাস্তিক।" কার্যত তাই হলো। ছাত্রশিবির ওই প্রফেসরের দিনরাত্রি যন্ত্রণাময় করে তুললো। বাসায় তালা লাগিয়ে দিয়ে মাইক লাগিয়ে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেছে দিনের পর দিন। তবুও সান্ত্বনা যে প্রাণে মেরে ফেলেনি স্যারকে। বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাষ্ট্রীয় প্রশাসন চুপচাপ মজা দেখেছে সেদিন। সেই প্রফেসরের তত্ত্বাবধানে স্নাতকোত্তর গবেষণা করার কারণে আমাকেও সইতে হয়েছে অনেক দুর্ভোগ। সেটা অন্য প্রসঙ্গ।

প্রবীর ঘোষের 'অলৌকিক নয় লৌকিক' এবং অন্যান্য বই পড়ে খুব মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির কাজকর্ম দেখে একটা প্রশ্ন প্রায়ই মনে হতো। তারা ভারতে বসে হিন্দুধর্মের কুসংস্কার ও শোষণ এবং প্রতারণার বিরুদ্ধে যেরকম প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পেরেছেন সাংগঠনিকভাবে। বাংলাদেশে তা কতটুকু সম্ভব? অসম্ভব বলেই মনে হতো আমার। বাংলাদেশে তখন কেউই যে যুক্তিবাদের পক্ষে লিখছেন না তা কিন্তু নয়। আহমদ শরীফ এবং হুমায়ূন আজাদের লেখাগুলো যথেষ্ট উদ্দীপনাময়। কিন্তু তাঁদের লেখায় আবেগ একটু বেশি বলে মনে হয়েছে আমার। একেবারে নিরাবেগ হয়ে যুক্তির কথা বলা খুব সহজ কাজ নয়। কিন্তু সেটা পাবার জন্যই মনের মধ্যে প্রচন্ড একটা তৃষ্ণা কাজ করছিল সব সময়।

মুক্তমনার ফোরামে খোলামেলা আলোচনা চলতে দেখে এবং আলোচনার ধরন দেখে মনে হলো এটার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম এতদিন। মুক্তমনায় দেখলাম যুক্তির আলোয় মনের আঁধার কেটে যাচ্ছে। যে মানুষটি মুক্তমনা দাঁড় করিয়েছেন এবং বিশাল বিশাল প্রবন্ধ লিখে চলেছেন তিনি অভিজিৎ রায়। আমি অভিজিৎ রায়ের লেখা এবং কাজ ভালোবেসে ফেললাম। মুক্তমনার প্রতি নিজের ভালোলাগার কথা জানিয়ে দুই পৃষ্ঠা লিখেও ফেললাম। লিখে ই-মেইল করে দিলাম মুক্তমনার ঠিকানায়। এক দিনের মধ্যেই আমি একটা ই-মেইল পেলাম স্বয়ং অভিজিৎ রায়ের কাছ থেকে। মুক্তমনায় নিয়মিত লেখার ব্যাপারে উৎসাহ জাগানিয়া উদার ই-মেইল।

অভিজিৎ রায়ের মতো এত শক্তিশালী লেখক এবং প্রভাবশালী সম্পাদকের কাছ থেকে আমি এতটা উদারতা আশা করিনি। কারণ আমি মনে করতাম যিনি যত বেশি শক্তিশালী লেখক তিনি তত বেশি অহংকারী এবং তিনি তত বেশি ধরা-ছোঁয়ার-বাইরে। বাংলাদেশের লেখকদের মধ্যে সৈয়দ শামসুল হক আর হুমায়ূন আজাদকে দেখেছি তীক্ষ্ম ভাষায় ব্যক্তিগত ঝগড়া করে জানান দিতে যে কে কত বড়। হুমায়ূন আজাদের লেখা এবং কথায় এত বেশি আমি-আমি-আমি-আমি থাকতো যে মাঝে মাঝে বেশ অস্বস্তিই লাগতো। আমি-কেন-ঈশ্বরে-বিশ্বাস-করি-না খ্যাত প্রবীর ঘোষেরও সব বইতে

দেখেছি তাঁর নিজের প্রশংসা, নিজের কৃতিত্বের কথা। বড় বাঙালি লেখকরা অন্য বাঙালি লেখকের বেশি প্রশংসা কখনোই করবেন না এটাই নিয়ম বলে মেনে নিয়েছিলাম। কিন্তু উজ্জ্বল ব্যতিক্রম দেখলাম অভিজিৎ রায়ের ক্ষেত্রে। এই মানুষটা যেন প্রশংসার সাগর। কারো লেখা একটু ভালো লাগলেই প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠেন। অথচ নিজের ব্যাপারে অসম্ভববিনয়ী।

২০০৫ সাল থেকে ২০১৫- এই দশ বছরে অভিজিৎ রায় আটটি বই লিখেছেন এবং দুটো বই সম্পাদনা করেছেন। এই বইগুলোর প্রত্যেকটাই একেকটা নতুন মাইলফলক। তাঁর সর্বশেষ বিজ্ঞান বই 'শূন্য থেকে মহাবিশ্ব' বাংলা ভাষায় আধুনিক বিজ্ঞানের বইয়ের জগতে অনন্য সংযোজন। এই বইটা তিনি লিখে শেষ করেন ২০১৩ সালে। প্রকাশককে পাঠানোর আগে বইটির পাণ্ডুলিপি আমাকে পড়তে দিয়েছিলেন। এটা ছিল আমার কাছে পরম সম্মানের বিষয়। শুদ্ধস্বর ২০১৩ সালে বইটির পাণ্ডুলিপি জমা নিয়েও ২০১৪ সালের বইমেলায় প্রকাশ করেনি। ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে বইমেলায় বইটি প্রকাশিত হয়। এই মেলাই ছিল অভিজিৎ রায়ের শেষ বইমেলা।

২০০৬ সাল থেকে অভিজিৎ রায়ের লেখার নিয়মিত পাঠক আমি। লেখক অভিজিৎ রায় বাংলাদেশের মুক্তমনা আন্দোলনের পথিকৃৎ। বাংলার তরুণ সমাজে অভিজিৎ রায়ের জনপ্রিয়তা আকাশচুম্বী। মুক্তমনা ব্লগের পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও অভিজিৎ রায় ছিলেন মুখর। যে কোন সামাজিক রাজনৈতিক আন্তর্জাতিক মানবিক সমস্যায় সোচ্চার একটি নাম অভিজিৎ রায়। ব্যক্তিগতভাবে অনেকেই অভিজিৎ রায়ের সাথে পরিচয় এবং বন্ধুত্ব গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু ব্যক্তি অভিজিতের সাথে আমার পরিচয় তেমন ছিল না। দেখা হয়নি কোনদিন। টেলিফোনেও কথা হয়নি। কিন্তু আমার লেখার ব্যাপারে সবসময়েই উৎসাহ দিয়েছেন তিনি। উপমহাদেশের ১১জন পদার্থবিজ্ঞানী বইয়ের একটা ভূমিকা লিখে দিতে অনুরোধ করেছিলাম। বলেছিলাম, সময় করে আমার বইয়ের একটা ভূমিকা লিখে দেবেন? তিনি বলেছিলেন, লিখে দেবো না মানে? আমার বাবা লিখে দেবে। তিনি সত্যিই তাঁর বাবা অজয় রায়কে দিয়ে আমার বইয়ের ভূমিকা লিখিয়ে নিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়। শুদ্ধস্বর আমার পাণ্ডুলিপি জমা নিয়েও যখন বছর দেড়েক প্রকাশের ব্যাপারে কোন উদ্যোগ নিচ্ছিলেন না তখন অভিজিৎ টুটুল ভাইকে বলেছিলেন, দরকার হলে আমার বইয়ের কাজ বন্ধ রেখে হলেও প্রদীপের বইটা ধরেন। এতটা উদারতা অভিজিৎ রায়ের পক্ষেই সম্ভব। ২০০৬ সাল থেকে আমি যা কিছু লিখেছি সব মুক্তমনার পাতায় প্রকাশিত হয়েছে সবার আগে।

২০১৫ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারির পর মুক্তমনার পৃথিবী বদলে যায়। আমূল বদলে যায়। যে বইয়ের মাধ্যমে লেখার মাধ্যমে লেখক অভিজিৎ রায় সমাজ পরিবর্তনের কাজ শুরু করেছিলেন, সেই বইমেলাতেই অভিজিৎ রায়কে চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে খুন করে চুপচাপ ভীড়ের মধ্যে মিশে যায় খুনিরা। বইমেলায় আলো ছিল। বইমেলায় ভীড় ছিল। বইমেলায় সহস্র মানুষ ছিল। সেই মানুষের হাতে মোবাইল ছিল। মোবাইল বের করে ছবি তোলার ইচ্ছে ছিল, সময় ছিল। কিন্তু খুনিকে ধরার সাহস ছিল না কারো। রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত অভিজিৎ রায় ও বন্যা আহমেদকে সাহায্য করার জন্য

হাত ছিল না কারো। তারপরের কাহিনি সবার জানা। কত রকমের আস্ফালন। কত রকমের চরিত্র-হনন। মাস পেরোতেই খুন হয়ে যান ওয়াশিকুর রহমান। তারপর অনন্ত বিজয়। তারপর নিলয় নীল। তারপর। রাষ্ট্র চুপ করে আছে। না, ঠিক চুপ করে নেই; বলছে নাস্তিকরা শাস্তি পাবে। কত রকমের রাষ্ট্রীয় ধারা আছে এখন নাস্তিকদের ধরার জন্য। ধরার পরে ধারায় ফেলে দিলেই হলো। এভাবে কতদিন চলবে জানি না। আশা করি না, তবুও একদিন হয়তো বিচার হবে। পৃথিবী বদলাবে একদিন। অভিজিৎ রায় স্টারডাস্ট হয়ে গেছেন। আগে পরে আমরা সবাই তাই হবো। সেটাই তো মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ। কিন্তু অভিজিৎ রায় আলো জ্বালিয়ে দিয়ে গেছেন। তাঁর হাতের আলো থেকে জ্বলে উঠছে আরো অজস্র আলো। এই আলো কাটবে কোন্ চাপাতিতে? বাঁধবে কোন্ ধারায়?



নৈঋতের মাঝে মানবের গান শুনিয়ে গেলেন যিনি

অংকুর অদ্ভুত

অভিজিৎ রায় এই মানুষটিকে আমি কতদিন ধরে চিনি ? খুব বেশী দিন না হয়তো । দুই বছর বা তার চেয়ে বেশী কিছু সময় হয়তো । তাঁর লেখার সাথে পরিচয় যখন তাঁর 'বিশ্বাসের ভাইরাস' বইটি বের হয় তখন থেকে । কারণ, তখন অনলাইন ভিত্তিক একটি বই বিক্রির প্রতিষ্ঠান হুমকি পেয়ে তাঁর বইটি সরিয়ে নিয়েছিল তাদের বিক্রির তালিকা থেকে। কেন তাঁর বই সরানো হলো সেই আগ্রহ থেকেই মূলতঃ তাঁর লেখা পড়তে শুরু করি । আজ মুক্তমনার এই 'লিখুন আলোকিত হওয়ার গল্প' আয়োজনে যখন ভাবলাম আমিও কিছু লিখি তখন ভাবছি শুরুতেই কি লিখব । আমি যখন ভাবতে বসলাম কি কথা লিখবো তখন সেই অভিজিৎ রায়ের হাত ধরেই লেখার কিছুটা বিষয় খুঁজে নিলাম। অভিজিৎ রায় এই মানুষটি আজ নেই কিন্তু তারপরেও তিনি কিভাবে মানুষকে মোটিভেট করতে পারে বা কেউ যদি তাঁর থেকে কিছু শিখতে চায় সে কি শিখতে পারে তাঁর লেখা থেকে, তাঁর জীবন থেকে সেগুলোই আমার ভাবনার আলোকে একটু লেখার চেষ্টা করছি মাত্র।

আমার কাছে সর্বপ্রথম অভিজিৎ রায়ের যে গুণটি ভালো লেগেছে এবং যেটা আমি গ্রহন করবো বলে মনস্থির করেছি তা হলো, অভিজিৎ রায়ের পড়ার গুণ। একজন মানুষ তখনই একজন ভালো লেখক হয়ে উঠতে পারে যখন তার মাঝে একটি পড়ার আগ্রহ গড়ে উঠে । তাঁর প্রতিটি লেখার বিষয়বস্তু যেমন আলাদা ছিল তেমনি তাঁর লেখা পড়লেই বুঝা যেত এই লেখাটির পেছনে লেখকের শ্রমের কথা। একজন মানুষ কত পড়াশোনা করলে তা নিয়ে এতো গভীরভাবে লিখতে পারে এবং ঐ নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর আলোকপাত করতে পারে সেটা তাঁর প্রতিটা লেখা পড়ার পর আমার মনে হতো । কত দূর এক দেশে বসে তিনি কতই না বিচিত্র বিষয় নিয়ে লেখালেখি করেছেন তা ভাবলেই অবাক লাগে । ভাবি, তাঁর কি কোন দরকার ছিল মানুষের জন্য এসব লেখার ? কত আরাম আয়েসের জীবন তিনি ব্যয় করতে পারতেন কিন্তু তা না করে তিনি অনেক পরিশ্রমের দ্বারা তাঁর এক একটি লেখা দাঁড় করিয়েছেন। তাঁর এই ব্যাপ্ত পড়ার গুণ সত্যিই এখনকার এই সময়ে খুব একটা দেখা যায়না বললেই চলে। কারো কাছে এখন এতো সময় নেই গভীরভাবে কোন বিষয় নিয়ে পড়ার । শুধুমাত্র নিজেদের পড়ার বইয়ের বাদে আমাদের মাঝে বই পড়ার আগ্রহ যে অনেকটাই কমে এসেছে তা আমরা আশেপাশে লক্ষ্য করলেই দেখি। তিনি খুব নীরবেই কাজ করে গেছেন । তাঁর এই পড়ার গুণটি আমাদের সমাজের প্রতি স্তরে দরকার । ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মাঝে এই পড়ার গুরুত্ব যদি আমরা পৌছে দিতে পারি তাহলে কত বড় বিপ্লব খুব নীরবেই যে এই দেশে সংগঠিত হবে তা আমাদের কল্পনার বাইরে। শুধুমাত্র শহর নয়, গ্রামে এবং মফস্বলে এই পড়ার গুরুত্ব আমাদের ছড়িয়ে দিতে

হবে তাহলেই বাজবে অন্ধকার ভাঙার গান। তাঁর এই ব্যাপ্ত বিষয়ের উপর পড়ার গুণ নিজেদের মাঝে সিকিভাগও যদি আমরা নিতে পারি নিজেদের অবস্থারও একটা পরিবর্তন আসবে তা বলাই বাহুল্য। এতো ব্যস্ততা, হরেক রকম কাজের মাঝে থেকেও যদি একজন মানুষ এতো পড়ালেখা করতে পারে তাহলে আমরা আমাদের অলস সময়গুলো কেন একটু পড়ার পিছনে ব্যয় করবো না । এই প্রশ্ন নিজেদের করলে আমরাই উত্তর পেয়ে যাব আশা করি। তাই নিজের মাঝে এই গুণটা আয়ত্ত করার চেষ্টা আমি অব্যাহত রেখেছি এবং সেই চেষ্টা রাখবো আশা করি। এই গুণ রপ্ত করলে একজন নিজে যেমন আলোকিত হবে আশেপাশের সবাই তেমনি সেই আলোর আভায় উদ্ভাসিত হবে এই নিয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। এভাবেই তাঁর এই গুণের কিছুটা যদি আমরা নিজেদের মাঝে নেই তাহলে আমরাও আলোকিত মানুষ হওয়ার পথে এক পা অগ্রসর হবো ।

অভিজিৎ রায়কে নিয়ে স্বল্প জ্ঞানের অধিকারী মানুষের মাঝে যে কথাটা ঘিরে আছে সেটি হচ্ছে তিনি একজন ‘নাস্তিক’ । একজন মানুষ ভিন্ন কিছুতে তার আস্থা স্থাপন করলেই তাকে আমরা নাস্তিক উপাধি দিয়ে দেই। সে যদি বিজ্ঞানের চর্চা করে,যদি ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলে,যদি মুক্তিবুদ্ধির কথা বলে তাকে কেন নাস্তিক ট্যাগ পেতে হবে সেটি আমার বোধগম্য হয় না। হয়তো এর পিছনে আমাদের অন্ধ বিশ্বাস, নতুনকে মেনে না নিতে চাওয়ার মন মানসিকতা, জ্ঞানের চর্চা না করা, খুব স্বল্প পরিমাণ জ্ঞানের উপর নিজেদের আস্থা রাখা এসবই দায়ী বলে আমার মনে হয়। তিনি বলেছেন, ‘আমি নাস্তিক। কিন্তু আমার আশে পাশের বহু কাছের মানুষজন বন্ধু বান্ধবই মুসলিম। তাদের উপর আমার কোন রাগ নেই, নেই কোন ঘৃণা। তাদের আনন্দের দিনে আমিও আনন্দিত হই। তাদের উপর নিপীড়ন হলে আমিও বেদনার্ত হই। অতীতেও তাদের পক্ষে দাঁড়িয়েছি, ভবিষ্যতেও দাঁড়াবো। এটাই আমার মানবতার শিক্ষা।’ হয়তো তাঁর কোন কিছুতে বিশ্বাস না থাকতেই পারে । এই কারণেই যে সে মানুষটি খারাপ মানুষ হয়ে যাবে সেটি কিরকম কথা আমার ঘটে তা কিছুতেই ঢুকে না। যারা বলে তিনি নাস্তিক তাদের মতে নাস্তিকরা দুনিয়ার সবথেকে খারাপ প্রানী, মনে হয় এর চেয়ে নিকৃষ্ট আর কিছু নেই। যদি এমনটি হবেই তবে কিভাবে তারা মানবতার এতো সুন্দর কথা শুনিয়ে যায়। মানুষকে ভালোবাসার কথা বলে। তাঁর প্রবন্ধ ‘ইসরায়েলের বর্বরতার সমাপ্তি হওয়া প্রয়োজন’ সেখানে তিনি লিখে গেছেন, ‘মুসলিম’ তো কোন বিশ্বাস নয়, মুসলিমরা হল রক্তমাংসের মানুষ। যাদের রয়েছে আশা, আকাঙ্ক্ষা, ভালবাসা আর সুন্দরভাবে বেঁচে থাকবার অধিকার।’ তিনি যদি নাস্তিকই হবে তা হলে তাঁর হাত দিয়ে নিশ্চয়ই এই লেখা বের হতো না। যারা তাকে চিনতে পারেননি তাদেরকে আরো পড়াশোনার আহবান জানানো ছাড়া আর কোন উপায় আমার জানা নেই। তাঁর এই মানবতার কথা,ধর্মনিরপেক্ষতার কথা, অপরকে ভালোবাসার কথা সবকিছুই আমাদের আলোকিত হতে সাহায্য করবে বলে আমি মনে করি। যারা আলোকিত হতে চায় তাদের জন্য তাঁর লেখা যথেষ্ট কিন্তু যারা শুনেও কিছু বিশ্বাস করতে চাইবে না, পড়েও দেখবে না তাদের সাথে বৃথা তর্ক করে কোন লাভ আছে বলে আমি মনে করি না । আমিও নিজেও ধর্মনিরপেক্ষ হিসেবেই বেড়ে উঠেছি। তাঁর লেখা সেই পথে আমার জ্ঞানের দুয়ার বিস্তারে ভূমিকা রেখেছে এটাই তাঁর লেখার গুরুত্ব আমার কাছে ।

আর দশটা-পাঁচটা হুমকি পেয়ে বিদেশে গা ঢাকা দেয়া লেখকের মতো ছিলেন না অভিজিৎ রায়। তিনি ছিলেন সাহসী এক কলমযোদ্ধা । যিনি অনেক হুমকি উপেক্ষা করে লিখে গিয়েছেন তাঁর কথা । তৈরি করেছেন আরো মানুষের লেখার একটা প্ল্যাটফর্ম । তাঁর বক্তব্যের সাহায্য নিয়েই বলতে হয় তাঁর সাহসের কথা, 'যারা ভাবে বিনা রক্তে বিজয় অর্জিত হয়ে যাবে তারা বোকার স্বর্গে বাস করছেন। ধর্মান্ধতা, মৌলবাদের মতো জিনিস নিয়ে যখন থেকে আমরা লেখা শুরু করেছি জেনেছি জীবন হাতে নিয়েই লেখালেখি করছি।' এবং এই বক্তব্যের যথার্থতা তিনি তাঁর জীবন দিয়েই প্রমাণ করে গেছেন। বুঝিয়ে গেছেন, যতবার তোমরা ঐ অন্ধকারের বিরুদ্ধে লেখালেখি করবে ততবার তোমাদের উপর আঘাত করতে আসবে ঐ হায়েনার দল। তারা ঐ অন্ধকার থেকেই আসবে। তারা আসবে নীরবে ভীরু, কাপুরুষের মতো। তাদের কলমে কোন জোর নেই, নেই কোন বুদ্ধিমত্তা, নেই স্বাধীনভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা। তারা নতুনের বার্তা শুনতে চায় না। তারা দেখতে চায় না আলোর মুখ। তারা পুরোনো অন্ধকার নিয়ে বেঁচে থাকতেই খুশী। তাই তোমরা যদি আলো আনতে চাও, যদি চাও অন্যকে আলোকিত করতে তাহলে সবসময় বুকে সাহস রেখে, মন দৃঢ়চিত্ত করে তবেই লিখতে হবে ঐ অপশক্তির বিরুদ্ধে । সম্মুখ সমরে যোদ্ধার মৃত্যু আলিঙ্গন করলেও তার সহযোদ্ধারা যাতে কখনোই এই ভয়ে বিচলিত হয়ে পিছপা না হয় সেই কথাই তিনি বলতে চেয়েছেন বারবার। তিনি আমাদের দেশের হাজারো তরুনের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে বলেছেন যুদ্ধাপরাধীর ফাঁসি চাই । শুধুমাত্র বিজ্ঞান, মুক্তবুদ্ধি বা ধর্মনিরপেক্ষতা নয়; তিনি মহান স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধীতাকারী শক্তির বিরুদ্ধে তাঁর সোচ্চার বাণী তুলে ধরেছেন। তিনি বলছেন প্রতিটি জায়গায় এই যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে মানুষকে জাগিয়ে তুলতে হবে নাহলে এই দেশ কখনোই মুক্ত হবে না। তিনি নিজের বেঁচে থাকা অবস্থায় একটি বিচারের সাজা দেখে যেতে চেয়েছিলেন যা তিনি দেখে যেতে পেরেছেন এইটা অনেক আশার কথা।

প্রথার বিরুদ্ধে লিখলেই এই দেশে এক শ্রেণীর বিরাগভাজন হয়ে যেতে হয় । ভিন্ন কিছু উপস্থাপন হলেই এদেশে কণ্ঠরোধ হয়ে যায় । যত ভালো স্কুল, কলেজ এদেশে থাকুক না কেন , যত ব্রিলিয়ান্ট ছাত্রছাত্রী এদেশে বের হোক না কেন, নিজেদের মত ভাবতে না পারলে এমন মানুষদের দিয়ে আমাদের খুব বেশী কোন কাজ হবে বলে মনে করিনা । আস্তিকের সংজ্ঞা পরিবার থেকে নিয়ে বড় হয়ে ধর্মকর্ম পালন করলেই দেশ ফুলে ফসলে ভরে উঠবে না এটা সবার আগে মনে রাখতে হবে। আমাদের সবকিছু দরকার । ভালোর সাথে সাথে খারাপ দরকার , সত্যের সাথে মিথ্যা দরকার। তারপর আমাদের নিজেদের বুদ্ধি, জ্ঞান-গরিমা দিয়ে আমাদের বুঝতে হবে কোনটা আমরা গ্রহন করবো। আমার সবচেয়ে খারাপ লাগে একটা জিনিস তা হলো, শুধুমাত্র লেখার জন্য মানুষগুলাকে হত্যা করা হয়েছে ঠাণ্ডা মাথায় । তারা কারো মসজিদ ভাঙ্গে নাই, মন্দিরে হাত দেয় নাই, কারো গির্জায় আঘাত করে নাই। শুধুমাত্র লেখার কারণে...! এটা ভাবতেই সবথেকে বেশী খারাপ লাগে যেই লেখা মানুষের নুন্যতম ক্ষতিও সাধন করে নাই তার জন্য তাদের জীবন দিতে হলো ।

বারবার প্রথাবিরোধীরাই জয়ী হয়েছে, কারো কাছে হারে নাই। তাদের জিততে সময় একটু বেশী লাগে, কিন্তু দিনশেষে তারাই জয়ী হয়। তাদের কথা পরবর্তীতে সবার বোধগম্য হয়। আলোকিত করে চারপাশ। সক্রেটিস, চে, স্পার্টাকাস যারাই ভিন্ন কিছু চেয়ে কিছু নির্দিষ্ট মানুষের বিরাগভাজন হয়েছিলো তাদেরকেও সেই মানুষদের হাতে খুন হতে হয়েছে। কিন্তু তাদের ভাবনা, চিন্তা, বিশ্বাস, মূল্যবোধ সবই মানুষের কাছে পৌঁছে গেছে যত সময়ই লাগুক। লেখালেখি চলবে , কোন পরাশক্তি, মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িক ট্যাগ কিছুই তাদের দমাতে পারবে না। প্রগতিকে কখনোই গলা কেটে, কোপ মেরে থামানো যায় না। মত প্রকাশ থাকবেই। আপনার ভালো লাগুক বা না লাগুক।
শেষমেশ, হুমায়ুন আজাদ স্যারের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে চাই, 'পৃথিবীতে যতোদিন অন্তত একজনও প্রথাবিরোধী মানুষ থাকবে, ততোদিন পৃথিবী মানুষের।' অভিজিৎ রায় না থাকলেও তাঁর কর্মযজ্ঞ আছে, যার সূত্র ধরে এক পথ খুঁজে ফেরা পথিক হয়তো একদিন চলে যাবে আলোর ঠিকানায়, আমি এই আশাই করি। সেই আলোর ঠিকানায় পৌছে আরো অনেক অভিজিৎ রায় আসবে এই মর্তে যারা ছড়িয়ে দিবে আলোচ্ছটা যা দিয়ে ধুয়ে যাবে অন্ধকার আর কুসংস্কার। আমি সেই আলোয় আলোকিত হতে চাই এবং সেই পথে পা বাড়াই যেই পথে আছে ভালোবাসা এবং পরিশুদ্ধ জ্ঞান। এই দানবের মাঝে অভিজিৎ রায় শুনিয়ে গেছেন মানবের গান। যেই গানে আছে মুক্তি এবং আলোর সন্ধান। মানবতার সৌন্দর্য যদি আমরা একবার উপভোগ করতে পারি, এর গুরুত্ব যদি আমরা উপলব্ধি করতে পারি তাহলেই হাসবে সকল মুখ আনন্দ আর ভালোবাসা নিয়ে। এই বিশ্বে দানবের মাঝে বেজে উঠুক মানবের গান তাহলেই আসবে সার্থকতা যে গান অভিজিৎ রায় শুনিয়ে গিয়েছেন তাঁর কর্মযজ্ঞের মধ্য দিয়ে।



সে আগুন ছড়িয়ে গেল সবখানে

তানভীর

মানুষের সাথে আগুনের একটা মিল আছে। আগুন যেমন শুধুমাত্র কোনো বস্তু না, বা শক্তি না, বরং একটা চলমান রাসায়নিক প্রক্রিয়া। মানুষও তাই। আজ থেকে কুড়ি বছর আগের আপনার শরীরের কোনো কোষ, কোনো নিউরনই এখন আর আপনার মধ্যে নেই। তবুও শৈশবের স্মৃতিগুলো আছে। এবং ফেলে আসা দিনগুলোর কথা ভাবলে সেগুলো অন্য কারো জীবন মনে হয় না। বরং মনে হয় নিজের জীবনই। মানুষও তাই একটা চলমান রাসায়নিক প্রক্রিয়া, যার মাঝে খাবার হিসাবে দাহ্য বস্তু ঢুকছে, অক্সিজেনের উপস্থিতিতে সেগুলো শক্তি দিচ্ছে। এবং এক সময় খরচ হয়ে যাওয়া জ্বালানি ফিরে যাচ্ছে পরিবেশে। একটা আগুন থেকে অন্য আরো অনেক আগুন ধরানো যায়। একজন মানুষের থেকেও অনেক মানুষের সৃষ্টি হতে পারে। আগুন আলো দেয় তাপ দেয়। মানব শরীরও তাপ উৎপন্ন করে। তবে মানুষের আলোটা ভিন্ন প্রকৃতির। মানুষের রাসায়নিক প্রক্রিয়াটা আরেকটু জটিল।

তবে আগুনের সাথে মূল পার্থক্যটা স্মৃতিতে। একটা মোমের আগুন যখন একটা বুনসেন বার্নার বা, গ্যাসের চুলায় ধরানো হয় সেটা তার অতীতের অবস্থা আর মনে রাখে না। আগুনের প্রকৃতিটা (যেমন রং, তাপমাত্রা, তড়িৎচৌম্বকীয় স্পেক্ট্রাম) শ্রেফ সেটা 'কাকে পোড়াচ্ছে' তার উপর নির্ভর করে। মানুষের বেলায় অবশ্য তা না। সে তার খাদ্যাভ্যাস আমূল বদলে ফেললেও, তার শৈশব স্মৃতি, তার ভাবনার জগৎ সেসব বদলে যায় না। অবশ্য কিছু সাইকাডেলিক ড্রাগ আছে যা ভাবনাচিন্তায় প্রভাব বিস্তার করতে পারে। কিন্তু সেগুলো আমাদেরকে ভিন্ন মানুষে পরিণত করে না। তাই মানব অস্তিত্বের জন্য মানুষের স্মৃতি গুরুত্বপূর্ণ। সে আমাদের মস্তিষ্কে ধারণ করা স্মৃতিই হোক কিংবা হোক ডিএনএ তে ধারণ করা বংশগতীয় নকশা। তবে শ্রেফ এই মস্তিষ্কের স্মৃতি আর ডিএনএর নকশাই মানুষকে মানুষ করে না। কারণ অমনতো যে কোনো প্রাণীরই আছে। মানুষ, বিশেষ করে আধুনিক মানুষ এখন আর শরীরের গণ্ডিতে আবদ্ধ নেই। তার অস্তিত্বকে সংজ্ঞায়িত করতে তাই আরো অনেক কিছুকেই বিবেচনা করতে হয়। যেমন কোনো মানুষের যদি একটা নোটখাতা থাকে, যেখানে সে তার ভাবনাগুলো, সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ প্রোজেক্টগুলো, ছোটোখাট পর্যবেক্ষণ, জীবন থেকে পাওয়া শিক্ষাগুলো টুকে রাখে। তাহলে এক সময় এই খাতাটাও তার অস্তিত্বের একটা অংশ হয়ে পড়বে। এর সব কিছু যেহেতু তার মাথায় থাকবে না। সেহেতু খাতাটা হঠাৎ হারিয়ে ফেললে, সে নিজের একটা অংশকেই হারিয়ে ফেলেছে বোধ করবে। কারণ ওই খাতাটা থাকলে সে যা কিছু করত, করতে পারত, তার অনেক কিছুই আর করা হবে না। শ্রেফ বিস্মৃত হবার কারণেই। এযুগে আমাদের স্মার্টফোন, দৈনন্দিন ব্যবহারের কম্পিউটার, কিংবা প্রিয় গিটারখানা, এসবও তাই আমাদের অস্তিত্বেরই একটা অংশ। যার যে কোনোটা থেকে বিচ্ছিন্ন করা হলেই আমরা আগে যা ছিলাম তার চেয়ে 'কম কিছু' হয়ে পড়ি। অর্থাৎ আমাদের কিছু বস্তুগত নির্ভরশীলতা, যেগুলো আমাদের আইডিয়া ও স্মৃতিকে ধারণ ও প্রকাশ করতে অপরিহার্য্য সেগুলোও আমাদের একটা অংশই। তাই 'আমি' বলতে শ্রেফ আমার শরীরের

অস্থি-মাংস-কোষ-কলা ভাবলেই হবে না। আমির গণ্ডিতে এগুলোও এসে যাবে। কিন্তু এখানেই কি শেষ?

আমাকে যদি আমার এইসব জাগতিক এক্সটেনশন সহকারেই এটা নির্জন দ্বীপে, সলিটারি কনফাইনমেন্টে রাখা হয় তাহলেও কি আমি আমি থাকবো? আর এই প্রশ্নের উত্তরেই আগুনের সাথে মানুষের আরেকটা পার্থক্য পাওয়া যায়। তা হলো, আগুন নামক রাসায়নিক প্রক্রিয়াটা আর দশটা আগুনের উপর নির্ভরশীল নয়। যেখানে মানুষ নামক রাসায়নিক প্রক্রিয়াটার অন্য মানুষ ছাড়া অসম্পূর্ণ। অন্যান্য মানুষ যাদের সাথে আমার বন্ধুত্ব, সখ্য, আত্মীয়তা, ভালোবাসা তাদেরকে ছাড়া আমি আর আমি থাকি কী করে? তিন বছর বয়স্ক আয়লান কুর্দি নামক যে শরনার্থী শিশুটি ভেসে উঠেছিলো তুরস্কের কোনো এক সৈকতে; তার বাবা তার সঙ্গে সঙ্গে ডুবে যাওয়া শিশুটির মা ও ভাইকে কবর দিতে ফিরে গেল যুদ্ধবিদ্ধস্ত সিরিয়ায়। তাকে যখন ইউরোপে থেকে যাওয়ার প্রস্তাব দেয়া হয় তখন সে বলেছিলো, Now I don't want anything, what was precious is gone. একজন মানুষের অস্তিত্বের জন্য তার সম্পর্কগুলো ঠিক এমনই অপরিহার্য্য। এমন প্রতিটি সম্পর্কের বিচ্ছেদেও আমরা আগের চেয়ে কম মানুষ হয়ে উঠি। এবং হয়তো এক সময় স্রেফ অর্থহীন রাসায়নিক প্রক্রিয়াতে পরিণত হই।

অভিজিৎ'দা কে নিয়ে লিখতে গিয়ে এসব কেন ভাবছি? কারণ সেই ফেব্রুয়ারীর কালো রাতটির পর থেকে আমার নিজের অস্তিত্বেরও একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ খোয়া গেছে বলে মনে হচ্ছে। অভিজিৎ'দা কে হারানোর পর শুধু একজন স্নেহময় বড় ভাইকেই হারাইনি, হারিয়েছি একজন শিক্ষক, মেণ্টর, একজন সহযাত্রীকে। মনে পড়ে পরিচয় হবার আগে, অন্য একটা ব্লগে লেখালিখি করতাম আমরা। একদিন নিউমার্কেটে গিয়ে দেখি অভিজিৎ রায়ের লেখা বই। বই যারা লেখে তারা তখন আমার কাছে অন্য জগতের মানুষ। আমি ভাবছিলাম, এই গত রাতে যে আমার একটা লেখায় প্রসংশা করলো, সেই অভিজিৎ রায় এত চমৎকার একটা বই লিখেছেন! বইটার নাম 'আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রি'। সে সময় পকেটে টাকা থাকতো না বলে হল থেকে গিয়ে নিউমার্কেটের সুন্দর সুন্দর বইগুলোর উপর হাতবুলিয়ে আসতাম। হাত বুলিয়ে এলাম অভিজিৎ দার বইটির উপরেও। একই প্লাটফর্মে আমরা লেখালিখি করি, ভাবতেই গর্বে বুকের ছাতি ছয় ইঞ্চি ফুলে গিয়েছিলো। তারপর মুক্তমনায় লেখালিখি শুরু। স্টিফেন হকিং এর গ্র্যান্ড ডিজাইন বইটা অনুবাদ করতে গিয়ে পরিভাষা নিয়ে দিনরাত অভিজিৎ'দা কে জ্বালানো। কখনো নিজেরাই বানিয়ে ফেলতাম নতুন পরিভাষা। এইসব যোগাযোগের মধ্য দিয়েই যেন আমরা হয়ে গেলাম চিরকালের পরিচিত দু'জন মানুষ। বইটা প্রকাশের জন্যও অভিজিৎ'দা দেশবিদেশে প্রকাশকদের কাছে অনেক দৌড়াদৌড়ি করেছিলেন। আমার বাংলাদেশী প্রকাশকের অপেশাদারিত্বে শেষ-মেস সেটা ভেস্তে যায়। সান্তনা ছিলো, বই টা তো আছে-ই মুক্তমনায়। আর অভিজিৎ'দার সঙ্গে এমন আরো কত শত প্রোজেক্ট করা যাবে! সেই অভিজিৎ'দা আর নেই।

এই যে সপ্তাখানেক আগে স্টিফেন হকিং ব্লাক হোল ইনফরমেশন প্যারাডক্স নিয়ে নতুন তত্ত্ব দিলেন, আর দু'দিন আগেই আবিষ্কার হলো মনুষ্য প্রজাতির আরেক দলের ফসিল। অভিজিৎ'দা থাকলে কী চমৎকার সব প্রবন্ধ লিখে আমাদের সামনে তুলে ধরতেন এইসব আবিষ্কারের খুটিনাটি। কই এমন সমৃদ্ধ প্রবন্ধ কেউ তো লিখলো না এবার। এই শূন্যস্থান বুকে বাজছে খুব।

নিজের সাথে কীভাবে যে লড়াই করেছি গত ক'টা মাস। যে মানুষটা স্রেফ আলো ছড়িয়েই গেলেন, তাকে কি নৃশংস ভাবে হত্যা করলো কিছু অন্ধকারের কীট। শতশত মানুষ, পুলিশ, প্রশাসন সবার চোখের সামনেই। কেউ এগিয়ে আসেনি। কেউ চিৎকার করে বলেনি, 'থামো' ! বন্যা'পার সেই রক্তাক্ত ছবিগুলো দূর হচ্ছিলো না মন থেকে কিছুতেই। তবে নৃশংসতার চেয়েও বেশি প্রভাবিত হয়েছিলাম মানুষের উপর আস্থা টলে যাওয়ায়। সে সময় সাধারণ মানুষের যে উল্লাসধ্বনি বয়ে এনেছিলো ফেসবুক আর নানান রকম ওয়েব পোর্টাল সেসব দেখে স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিলাম। এরা কি দেখতে পায় না, কী ঘটেছে পাকিস্তানে, আফগানিস্তানে, ইরাক, সিরিয়ায়? জঙ্গিবাদ সে সব স্থান থেকে মুছে দিচ্ছে মানবতার শেষ চিহ্নটুকু। এরাও কি সেইসব দিনকেই চাইছে বাংলাদেশে? কলম/কীবোর্ড হাতে অভিজিৎ রায়ের চেয়ে, কালাশানিকভ হাতে কোনো জঙ্গিই কি এদের কাছে বেশি কাম্য? কে এদেরকে বোঝাবে? ইরান-ইরাক-আফগানিস্তানেও হয়তো প্রগতিশীল কিছু মানুষ একসময় ছিলো। তাদেরকে ধ্বংস করেই তো আজ মধ্যযুগীয় বর্বরতার চাষবাস সেখানে। আমাদেরও কি এভাবে হেরে যেতে হবে? হারিয়ে যেতে হবে? এইসব হতাশাই ঘিরে ধরছিলো চারিদিক থেকে।

তারপর এক সময় হতাশাটা দূর হয়ে গেল। হাজার হাজার ছেলে-মেয়ে এখন ক্রিটিক্যালি ভাবতে শিখছে। ফেসবুক-ইউটিউব সহ নানাম প্লাটফর্মে গড়ে উঠছে বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনার গ্রুপ। নতুনরা বের করছে পত্রিকা, ইউটিউব চ্যানেল, আয়োজন করছে পাঠচক্র, লেখালিখির উৎসব, অনুবাদ প্রতিযোগিতাসহ হাজারো কর্মকাণ্ড। স্কুল কলেজে পড়ুয়া ছেলে মেয়েরা তাদের ভাবনার গভীরতা দিয়ে হর হামেশাই অবাক করে দিচ্ছে আমাদের। এটা সত্যি যে, ক্ষমতাধরদের পৃষ্টপোষকতায় ধর্মান্ধতার চাষবাসও বাড়ছে এদেশে। কিন্তু শেষমেষ সত্যেরই জয় হবে। আমরা অবাক হয়ে লক্ষ্য করেছি, অভিজিৎ রায়ের আগুন এখন জ্বলছে হাজারো কিশোরের-কিশোরীর মনে। মানুষ তার বইগুলো পড়ার জন্য খুঁজছে। শারীরিক অভিজিৎ রায় এর শেষ হলেও, যে অনুরণন তিনি তুলেছেন তা ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে হাজার মনে। হাজার মানুষের অস্তিত্বের একটা অংশ হয়ে পড়ছেন অভিজিৎ রায়। আমাদের অভিজিৎ'দা।



একজন স্পষ্টভাষী, সোচ্চার যুবকের কথা

অনুজিৎ রায়

মুক্তমনা প্রকাশনার বলিষ্ঠ ও সাহসী লেখক অভিজিৎ রায় একজন যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী নাগরিক। তিনি তাঁর স্ত্রী রাফিদা আহমেদ বন্যা এবং কন্যা তিশার সাথে দীর্ঘ ৭ বছর বা তার অধিক সময় ধরে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক। কিন্তু মনেপ্রাণে তিনি নিজেকে বাঙ্গালী বলে গর্ববোধ করতেন। তিনি পারিবারিক পরিচয়সূত্রে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। বিদেশে থাকলেও তাঁর মন পড়ে থাকতো এদেশের জন্য। তিনি যুক্তরাষ্ট্রে যতই সুপ্রতিষ্ঠিত হোক, যতই তাঁর লেখালেখির জন্য খ্যাতি থাকুক, বাংলাদেশের প্রতি তিনি সবসময়ই মনের টান অনুভব করতেন। তিনি শুধু পরিবারের সদস্যদেরকেই নন, বাংলাদেশের অভাব মনেপ্রাণে বোধ করতেন। প্রথমে তাঁর সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত মতামত তুলে ধরছি।

ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন খুবই চঞ্চল, আবেগী ও অস্থির প্রকৃতির। তবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত মিশুক ও হাসিখুশি প্রকৃতির। খুব হাসি-ঠাট্টা প্রিয় ও খোলামেলা স্বভাবের। তবে মাঝে মাঝে সামান্য বিষয়েও রেগে যেতেন, কিন্তু তা মিলিয়ে যেতে কয়েক মুহুর্তও লাগত না। আমি আবার তার বিপরীত। ছোটবেলা থেকেই আমি আত্মকেন্দ্রিক, একাকীত্বপ্রিয় এবং কিছুটা চাপা প্রকৃতির। ফলে মাঝে মাঝেই আমার এই বৈশিষ্ট্য তিনি সহজভাবে নিতেন না। এ নিয়ে প্রায়ই আমার সাথে ঝগড়াঝাটি লাগত। ফলে আমার মন প্রায়ই খারাপ থাকত। সত্যি কথা বলতে কি, ছোটবেলায় আমাদের মধ্যে খুব একটা দহরম মহরম ছিল না, কিছুটা মানসিক দূরত্বও ছিল। তবে তিনি যতই আমার সমালোচনা করুক, আমার ভাল দিকগুলো তুলে ধরতে কার্পণ্য করতেন না। আমার মধ্যে যদি সামান্য গুণও দেখতেন, তা যতই তুচ্ছ হোক, অবলীলায় তার প্রশংসা করতেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি অগোছালো প্রকৃতির, বহির্মুখী, বেপরোয়া, আড্ডাবাজ প্রকৃতির। আমি অবশ্য তাঁকে খাটো করার জন্য এসব বলছি না। কারণ, দোষে-গুণেই মানুষ। কিন্তু মানুষের সাথে মিশে যাওয়ার একটা অসাধারণ গুণ তাঁর মধ্যে সন্দেহাতীতভাবেই ছিল। সোজাসাপটা কথার জন্য তিনি যেমন নিন্দিত, তেমনি নন্দিত। দেশে থাকতে তাঁর ভালবাসা তেমনভাবে বুঝতাম না। বরং তখন তাঁকে অহংকারী, জেদী ও আধিপত্যপ্রিয় বলেই আমার মনে হতো। মনে হতো, তিনি আমাকে বুঝতেন না। এটা নিয়ে আমার তীব্র অভিমান ছিল। তবে তা ছিল আমার বোঝার ভুল।

অভিজিৎ রায় শুধু যে খোলা মনের মানুষ তা নয়, তিনি ছিলেন পড়াশোনায় অসম্ভব মেধাবী। শুধু পড়াশোনাই কেন, তার গল্পের বই পড়ারও ছিল অদম্য নেশা। বন্ধু-বান্ধব, লাইব্রেরী থেকে কত ধরণের গল্প বই তিনি সংগ্রহ করতেন, তার হিসাব নেই। সত্যি কথা বলতে কি, তাঁর কাছ থেকেই আমি গল্পের বই পড়ার অনুপ্রেরণা পেয়েছি। কিশোর থ্রিলার, কিশোর ক্লাসিক, ভৌতিক গল্প, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস, বিংশ শতাব্দীর লেখকদের মধ্য হতে ভারতীয় লেখকদের মধ্যে সত্যজিৎ রায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সমরেশ মজুমদার, প্রবীর ঘোষ কত যে নামকরা লেখকের বই তার সংগ্রহের তালিকায় ভরপুর ছিল, তার হিসাব নেই। গল্পের বই পড়ার গুণটি আমি তাঁর কাছ থেকেই অর্জন করেছি। বাংলাদেশের লেখকদের

মধ্যে তিনি হুমায়ুন আহমেদ, তসলিমা নাসরিন, ইমদাদুল হক মিলন এসবের বই পড়তে তিনি খুব পছন্দ করতেন। তাছাড়া বিখ্যাত শিকারী জিম করবেট, কেনেথ এন্ডারসনের বই পড়তেও তিনি আমাকে উৎসাহ যুগিয়েছেন। হয়তো অদম্য বই পড়ার নেশা থেকেই অবচেতনভাবেই তাঁর লেখক হওয়ার বাসনা গড়ে উঠেছিল, যা তাকে আজকের পর্যায়ে উন্নীত করেছে।

আমার পড়ার দিকে ছোটবেলা থেকেই তিনি অত্যন্ত সচেতন। আমার মনে আছে, নবম শ্রেণি হতে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত তিনি উৎসাহভরেই আমাকে পড়া দেখিয়ে দিতেন এবং মাঝে মাঝে নোটও দিতেন। আমি ভালো ফলাফল করলে খুশিতে গদগদ থাকতেন। আবার পরীক্ষা খারাপ হলে তিনি খুবই কষ্ট পেতেন। তিনি যেমন আড্ডাবাজ ছিলেন, তেমনি ছিলেন নিশাচর। তিনি যখন বুয়েটের মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর ছাত্র ছিলেন, তিনি রাত চারটা পর্যন্ত জেগে পড়াশোনা করতেন। পরের দিন অনেক সময় সকাল ৯টায় ঘুম থেকে উঠতেন। ক্রিকেট ছিল তাঁর প্রিয় খেলা। আজও তার কেনা শচীন তেন্ডুলকারের পোস্টার আমাদের দেওয়ালে টাঙ্গানো। শুধু শচীন তেন্ডুলকার কেন, ইমরান খান, ভিভিয়ান রিচার্ডস, আজহার উদ্দিন, সুনীল গাভাস্কার সহ কত খেলোয়ারের ছবি যে তিনি সংগ্রহ করতেন, তার হিসাব নেই, যদিও ছবিগুলোর অনেকগুলো হারিয়ে গিয়েছে। রাত জেগে বিশ্বকাপ ফুটবল দেখাও ছিল তাঁর আরেকটি নেশা। এ নিয়ে মা-বাবার সাথে কম ঝগড়া হয়নি। বিভিন্ন রকমের কাজে ছিল তার যথেষ্ট আগ্রহ। এছাড়া রবীন্দ্র সঙ্গীত, নজরুল সঙ্গীত, ভূপেন হাজারিকা, অনুপ জালোটা, ব্যা- সঙ্গীতের প্রচুর ক্যাসেট তিনি কিনতেন ও প্রতিদিনই গান শুনতেন।

তাঁর একটা বৈশিষ্ট্য ছিল, তিনি খুব ভোজনরসিক ছিলেন। প্রায়ই মার কাছে এটা-ওটা খাওয়ার বায়না ধরতেন। বিদেশে থাকলেও তিনি বাংলাদেশের খাবারগুলো খুব মিস করতেন এবং দেশে যখনই আসতেন, প্রিয় প্রিয় খাবারগুলো বাসায় রান্না হতো, তার মন খুশীতে ভরে যেত।

দেশে থাকতেই তিনি অন্যায়, অবিচারের প্রতি প্রতিবাদমুখর ছিলেন। হুমায়ূন আজাদ, প্রবীর ঘোষ, তসলিমা নাসরিন, আরজ আলী মাতুব্বরের বইয়ের তিনি খুব একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। তখন থেকেই তিনি নাস্তিক্যের ধ্যানধারণা গ্রহণ করতে লাগলেন এবং নাস্তিক্যবাদের যৌক্তিকতা অনুধাবন করলেন। তিনি ধর্মীয় উপাধিসূত্রে হিন্দু হলেও তিনি কখনো নিজেকে হিন্দু বলে পরিচয় দিতে চাইতেন না। তিনি পূজা করা, পা ছুয়ে প্রণাম করা, শ্রাদ্ধ করা এসব লোকদেখানো আচার অনুষ্ঠান অত্যন্ত অপছন্দ করতেন। খাওয়ার ব্যাপারে ধর্মীয় বিধিনিষেধ তিনি মানতেন না। অত্যন্ত অবাধ্য ও বিদ্রোহী মনোভাবের ছিলেন। তাই বলে তিনি অসামাজিক ছিলেন, তা নয়। তিনি দেশে থাকতেই বলতেন, তিনি বাবা বা মা মারা গেলে শ্রাদ্ধ করবেন না, তাতে যে পরিণতিই ঘটুক। ছাত্র জীবনেই তার সৃষ্টিকর্তার প্রতি অবিশ্বাস শুরু হয়। শুধু ধর্মীয় ব্যাপারেই নয়, নারী-পুরুষকে কৃত্রিমভাবে বিভাজন করার সামাজিক রীতির ব্যাপারেও তিনি সোচ্চার ছিলেন। আমার এখনো মনে আছে, বুয়েটে অনার্সে তিনি ফার্স্ট ক্লাস সেভেনথ হয়েছিলেন। শিক্ষকতা পেশার প্রতি তত আগ্রহী না হলেও তিনি বুয়েটের লেকচারার পদে নিয়োগ পরীক্ষা দিয়েছিলেন। ভাইভায় তার ফলাফল সবচেয়ে ভালো হয়েছে। তাঁর নিয়োগ প্রায় নিশ্চিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে লেকচারার পদে নিয়োগ দেওয়া হয়নি। বুয়েটের একজন শিক্ষকের সাথে পূর্বের কোন একদিনের মতবিরোধের জের ধরে তাকে সে নিয়োগ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। আমি পরে বিষয়টা জানতে পারি। একবার বুয়েটের ছাত্রছাত্রীদের জন্য

এক শিক্ষা সফরের আয়োজন করা হয়েছিল। কিন্তু ছেলেদের জন্য কোন শিক্ষকের যাওয়ার প্রয়োজন না পড়লেও মেয়েদের নিরাপত্তার জন্য একজন শিক্ষক পাঠানোর প্রসঙ্গ উঠেছিল। এই লিঙ্গভিত্তিক বিভাজনের দ্বিমুখী নীতি সবাই মেনে নিলেও তিনি তা মেনে নেননি এবং প্রতিবাদ করতেও কুণ্ঠিত হন নি। কিন্তু এটিই সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের প্রেস্টিজ-ইস্যু হয়ে দাঁড়ালো। সম্ভবত সে কারণে ভাইভা বোর্ডে ঐ শিক্ষক উপস্থিত থাকাতে তাঁকে নিয়োগ দেওয়া হয়নি। মা তাঁকে ঐ শিক্ষকের কাছে ক্ষমা চাওয়ার জন্য বারবার অনুরোধ করলেও তিনি তার কর্ণপাত করেন নি। তিনি বলতেন, অন্যায় মেনে নিয়ে তিনি এ চাকরি করতে পারবেন না। যাই হোক, তিনি শিল্পপতি সালমান এফ রহমান কর্তৃক পরিচালিত বেক্সিমকো কোম্পানীতে NIT এর উপর ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি করেছিলেন এবং যথারীতি প্রথম স্থান অধিকার করে আসছিলেন। অবশ্য ইতিপূর্বে অটোবী কোম্পানীতে তিনি আর্কিটেক্ট পদে কয়েকমাস চাকরিও করেছিলেন। বুয়েটে স্কলারশিপ পাওয়ার পর তিনি সিঙ্গাপুরে এম.এস.সি. করার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং ২৬ ডিসেম্বর, ১৯৯৮ সাল হতে তিনি সেখানে অবস্থান করলেন। যাওয়ার আগে মা খুব কান্নাকাটি করছিল। তিনি তখন বললেন, 'মা, তুমি এরকম কান্নাকাটি করলে কিন্তু আমি সিঙ্গাপুরে গিয়ে আবার ফিরে আসবো।' এবং এয়ারপোর্টে যখন আমরা তাকে বিদায় দিতে গিয়েছিলাম, তখন তিনি বাবাকে বলেছেন, 'অনুর দিকে খেয়াল রেখো।' (এখানে একটা কথা জানিয়ে রাখি, আমার ডাক নাম অনু)।

তারপর থেকে তিনি মা অথবা বাবাকে প্রতি সপ্তাহেই একটা করে চিঠি লিখতেন এবং মাসে অন্তত দুবার ফোন করতেন। বাবার সাথেই তাঁর বেশি কথা হতো। তবে তিনি আমার ব্যাপারেই বেশি খোঁজ-খবর নিতেন। আমার সাথে ফোনে কথা হলেই তিনি আমার শরীর-স্বাস্থ্যের পাশাপাশি আমার পড়াশোনা কেমন চলছে তা জিজ্ঞেস করতেন। বাসায় কি রান্না হয়েছে, কার কি খবর, কে কি করছে, সে সব খবর তো আছেই। সিঙ্গাপুরের জীবনের ব্যাপারেও ফোনের পাশাপাশি ই-মেইলে ভাববিনিময় হতো। তবে সিঙ্গাপুরে পড়াশোনার উদ্দেশ্য যাওয়ার পর তাঁর জীবনযাত্রা অনেকটাই পাল্টে গেল। তিনি ছোটবেলা থেকেই অনেক উচ্চাভিলাষী ছিলেন ও অর্থনৈতিক জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য ছিল। এবার তার পরিবর্তনটা বলি। দেশে তিনি পড়াশোনা, আড্ডাবাজি ও বন্ধুবান্ধব নিয়েই মেতে থাকতে ভালবাসতেন। প্রায় প্রতিদিনই আমাদের বাড়িতে তার কোন না কোন বন্ধুর আগমন ঘটত। তার বন্ধুবান্ধবের অভাব ছিল না। আমার বাবা ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর। তখন আমরা ফুলার রোডে বিশ্ববিদ্যালয় কোয়ার্টারে থাকতাম। সব ধরণের ছেলেদের সাথে তাঁর ছিল মেলামেশা। ঘর গোছানো, বাজার করা, রান্না করা সব কাজই মা করে যেতেন। এমনকি তিনি নিজের পড়ার টেবিল, নিজের জামাকাপড়ও ঠিকমতো গুছিয়ে রাখতেন না। সেই তিনিই সিঙ্গাপুরে যাওয়ার পর পড়াশোনার পাশাপাশি সবধরণের ঘরোয়া কাজে সুনিপুন হয়ে উঠলেন। অবশ্য তার প্রবাসী বন্ধুরা তাকে যথেষ্ট সাহায্যও করেছিল। যেখানে দেশে থাকতে এককাপ চাও নিজে বানাতে জানতেন না বা জানলেও করতে চাইতেন না, তিনি প্রায় সবরকম রান্নায় পারদর্শী হয়ে উঠলেন। অবশ্য এ নিয়ে তাঁকে কম বেগ পোহাতে হয় নি। সিঙ্গাপুরে যাওয়ার এক বছর পর তিনি দেশে ফিরে এসেছিলেন। তখন তিনি যেন অন্য মানুষ। ঘরের কাজে মাকে সাহায্য করার বিষয়ে তার মধ্যে ভীষণ আগ্রহ দেখা গেল। আমার মনে আছে, যতবারই দেশে এসেছিলেন, তার

মধ্যে এক বা একাধিক বার তিনি মুরগির মাংস রান্না করে খাইয়েছিলেন। এ ব্যাপারে সিঙ্গাপুরে থাকতে তাঁর প্রথম অভিজ্ঞতা জানিয়ে রাখি। দেশে থাকার সময় তার হাতে সাদা দাগ দেখা গিয়েছিল। তাঁকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করতে তিনি প্রথমে প্রশ্নটি এড়িয়ে যান। পরে মার কাছ জানতে পারি, তিনি অনভিজ্ঞতা থেকেই প্রথমবারের মতো মাংস রান্না করতে গিয়েছিলেন। কড়াইয়ে তেল গরম করতে দিয়ে তিনি পেঁয়াজ কাটতে বসেছিলেন। খুব মারাত্মক ভুল। পেঁয়াজ কাটার পর তেলে দিতে যেয়ে ফুটন্ত কড়াইয়ের গরম তেল তাঁর হাতে লেগেছিল। আরেকজন এসে তাড়াতাড়ি করে চুলা নিভিয়ে দিল। এটি হলো রান্নায় অজ্ঞতাজনিত প্রথম দুর্ঘটনা। তা থেকে শিক্ষা লাভ করে প্রবাসী বন্ধুদের সাথে থাকতে থাকতে সঠিকভাবে রান্না করতে শিখেছিলেন। কোন কাজকেই তারপর থেকে ছোট মনে করতেন না। তাঁর মানসিকতার বড় পরিবর্তন সিঙ্গাপুরে থাকতেই হয়েছিল।

২০০০ সালে বাবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর পদ হতে অবসর গ্রহণের পর ২০০১ সালের ফেব্রুয়ারীতে আমরা ফুলার রোড ত্যাগ করে নিজেদের সিদ্ধেশ^রীর বাসায় শিফট করি এবং তাঁকে ই-মেইলের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়। সিঙ্গাপুরে এম.এস.সি. করার পরপরই সেখানেই তাঁর চাকুরী হয়। তারপর থেকেই তিনি সেখানে সেটেল হবার সিদ্ধান্ত নেন। সম্ভবত এক বছরের উপর চাকুরী করার পর তিনি পি.এইচ.ডি. করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ঐ সময় তিনি চাকুরী ছেড়ে দেন। ২০০১ সালের সম্ভবত অক্টোবরে ইন্টারনেটের মাধ্যমে রাফিদা আহমেদ বন্যার সাথে তার পরিচয় হয় এবং তিনি রাফিদা আহম্মেদ বন্যার পারিবারিক ও পেশাগত পরিচয় জানতে পারেন এবং এও জানতে পারেন, রাফিদা আহমেদ বন্যা যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী নাগরিক। এরপর মাঝে মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে তাঁদের মধ্যে সাক্ষাত ঘটে এবং তাঁদের সম্পর্ক গভীর হতে গভীরতর হয়। পি.এইচ.ডি. কমপ্লিট করার পর তিনি সিঙ্গাপুরে কোন সফটওয়্যার কোম্পানীতে তাঁর চাকরী হয়। যাই হোক , সম্ভবত ২০০৭ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। ২০০৭ সালের নভেম্বরে অভিজিৎ রায় ও রাফিদা আহমেদ বন্যা সামাজিক বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। রাফিদা আহমেদ বন্যার পারিবারিক ও পেশাগত জীবন নিয়ে কিছু কথা বলি। তিনি পেশাগত জীবনে সিস্টেম এনালিস্ট। জন্মসূত্রে তিনিও বাংলাদেশের নাগরিক। ভিকারুন্নেছা নুন স্কুল এ- কলেজ থেকে এইচ পাশ করার পর তিনি . সে এস মা অ্যাডভোকেট। যুক্তরাষ্ট্রে তিনি , ারিবারে যুক্তরা ষ্ট্র সেটেলড হন। তাঁর পিতা একজন ব্যবসায়ী কম্পিউটার সায়েন্সে মাস্টার্স। তাঁর সম্পর্কে আরও কথা না লিখলেই নয়। বন্যাদিও অভিজিৎ রায়ের মত নাস্তিক্যবাদে বিশ্বাসী। মতাদর্শগত ঐক্য থেকেই তাদের সম্পর্ক প্রগাঢ় হয়ে উঠে। সম্ভবত (নিশ্চিত নই), ২০০৩ সালে অভিজিৎ রায় মুক্তমনায় সক্রিয় হয়ে উঠেন। তখন থেকেই তাঁর বিভিন্ন বিষয়ে লেখালেখির নেশা। তাঁর বিভিন্ন লেখায় বিজ্ঞানমনস্ক চিন্তাধারা ব্যাপকভাবে ফুটে উঠে। বন্যাদিও প্রায় যুগপৎ সময়ে মুক্তমনার সদস্য হন এবং তিনিও অভিজিতের পাশাপাশি সক্রিয়ভাবে বিজ্ঞানভিত্তিক বিভিন্ন গ্রন্থ লিখতে শুরু করেন। অভিজিৎ রায়ের প্রথম বহুল আলোচিত গ্রন্থটি হলো, 'আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী।' এ গ্রন্থটি বাংলাদেশে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। তারপর থেকে তিনি মুক্তমনায় লেখিলেখিতে আরও সক্রিয় হতে সক্রিয়তর হয়ে উঠেন। লেখা শুধু তাঁর নেশাই নয়, পেশাও বটে। ২০০৫ সালে তিনি আমার বিয়ের সময় দেশে আসেন। তিনিও আমাকে মুক্তমনায় বিভিন্ন বিষয়ে লিখতে অনুপ্রেরণা দেন। আমারও অবশ্য লেখালেখির সামান্য

অভ্যাস আছে। তবে কোন বই আমি লিখিনি। আমি সাধারণতঃ পত্রিকার চিঠিপত্রের কলামে বিভিন্ন বিষয়ে লেখালেখি করি- এই পর্যন্তই। শিক্ষাজীবন শেষে আমি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপার্জনমূলক কাজ করি। আমি ২/১টা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরীও করেছি। কিন্তু তা ছিল অস্থায়ী। আমার আবার প্রাইভেট টিউশনি করার অভ্যাসও আছে, এ অভ্যাস আমি এখনো চালু রেখেছি। আবার বিয়ের পরও আমার ২/৩ বছর বেকারত্বে কেটেছে। জীবনের প্রতি হতাশাও আমাকে গ্রাস করেছিল। কিন্তু তিনি আমাকে যুক্তরাষ্ট্র থেকেই ফোন করে আমার খোঁজখবর নেন এবং আমাকে হাল না ছেড়ে ধৈর্যশীল হবার পরামর্শ দিতেন। একসময় আমার একটি সরকারি প্রকল্পে চাকুরী হয়। আমি শিল্প মন্ত্রণালয়ে কম্পিউটার অপারেটর পদে যোগদান করি। কিন্তু সরকারি চাকুরী হলেও তা ছিল অস্থায়ী। পরবর্তীতে আমি রাজস্বভূক্ত খাতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক পদে যোগ দিই। আমি শিক্ষকতা পদে যোগদান করেছি শুনে তিনি খুবই খুশী হয়েছিলেন এবং প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে জানতে তিনি খুবই উৎসুক ছিলেন। তিনি আমাকে যথারীতি সকল বিষয়েই উৎসাহ যোগাতেন। আমার চাকুরী না পাওয়া পর্যন্ত তিনি আমার ব্যাপারে কত যে উদগ্রীব থাকতেন , তা বলে বোঝানো যাবে না। তবে তিনি বাবা-মাকে আমার উপর মানসিক চাপ যেন না দেওয়া হয়, তা তাঁদেরকে বোঝাতেন। আমি যেন স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারি, তিনি তা মনেপ্রাণে চাইতেন। তাঁর অনুপ্রেরণাই আমাকে আজকের অবস্থায় নিয়ে এসেছে।

'আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী' ছাড়াও তিনি আরও বই লিখেছেন। তাঁর আরও প্রকাশিত বই, 'শূন্য হতে মহাবিশ্ব','অবিশ্বাসের দর্শন', 'বিশ্বাসের ভাইরাস'। তার লেখা 'ভালবাসা কাকে কয়' বইটি যে কত আগ্রহ নিয়ে কতবার পড়েছি, তা বলাই বাহুল্য। একজন মানুষ শুধু চিন্তাধারায় নয়, লেখনীতে কতটা বিশ্লেষণধর্মী ও সূক্ষ বিচারক হতে পারে, তা আমি সত্যি বলতে কি, এই বইটি পড়েই জানতে পেরেছি। একসময় আমার বই পড়ার দারুন নেশা ছিল। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, আমার এই সুন্দর অভ্যাসটি হারিয়ে গিয়েছে। তারপরও 'ভালবাসা কারে কয়' বইটি আমি খুব উৎসাহ নিয়ে পড়েছি ও সামাজিক দিকগুলো ও এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আমি জানতে পেরেছি। ২০১২ সালে তিনি বাংলা একাডেমীর বইমেলায় এসেছিলেন। তাঁর পরিকল্পনাই ছিল, প্রতি বছর ফেব্রুয়ারীর বইমেলা উপলক্ষে তিনি ঢাকা আসবেন। যদিও ২০১৩ ও ২০১৪ সালে তাঁর যান্ত্রিক জীবনের ব্যস্ততার জন্য ঢাকা আসা হয়ে উঠেনি। তাই এবছর ২০১৫ সালে তিনি বইমেলার কারণে ঢাকা আসতে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠলেন। একুশের বইমেলা যেন তাঁর প্রাণ। বইমেলায় না গিয়ে একদিনও তিনি থাকতে পারতেন না।

১৯৭১ সালের নয় মাস রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের বিনিময়ে আমরা এই স্বাধীন বাংলাদেশ অর্জন করেছি। অথচ, যেখানে বাংলাদেশ একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হবার কথা, বিগত ৪০ বছরের অধিক সময় শাসকশ্রেণীর সুবিধাবাদিতা, অশিক্ষা, ধর্মান্ধতা যেন বাংলাদেশকে গ্রাস করে আছে। যতই সরকার ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলুক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বাস্তবতা যে ঠিক বিপরীত, তা আমরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। ২০১৩ সালে পত্রপত্রিকায় ব্লগার হত্যার বিষয়টি আমার নজরে পড়ে। আশেপাশের মানুষজন কত ধর্মান্ধতায় নিমজ্জিত, তা আমি টের পেতে থাকি। তখন থেকেই বাবা অভিজিৎ রায়কে দেশে আসার ব্যাপারে সাবধান করে দেয়। তাঁর সাথে মুক্তমনার বিষয়ে আমার ফোনে তেমন

কথা হয়না। ফোনে তিনি শুধু আমার শারীরিক, মানসিক স্বাস্থ্য, চাকুরী কেমন চলছে, কার কি খবর তাই জানতে চাইতেন। বাবার কাছ থেকেই জানতে পারি, তাঁকে যুক্তরাষ্ট্রে ইমেইলে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। তা জানার পর আমরা ভীত হয়ে পড়ি। বাবা তাঁর নিরাপত্তার জন্য ঢাকা আসতে বারণ করে। তিনি নাছোড়বান্দা, তিনি ঠিকই করেছে, দেশে আসবেনই। বাবা তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, দেশে আসলেও অভিজিৎ যেন কাউকে না জানায়। কিন্তু বইমেলার আকর্ষণ কি তিনি ছাড়বেন? তখন বাবা তাঁকে বলেছিলেন, বইমেলা গেলেও সন্ধ্যার আগেই যেন ফিরে আসে ও প্রতিদিন যেন না যায়। দেশের বাস্তবতার কথা ভেবেই বাবা এরূপ পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি একরোখা ও অপরিণামদর্শী। তাঁর এই দুঃসাহসিকতা যেমন তাঁর একটি গুণ, তেমনি এটিই একদিক থেকে তাঁর দোষ। মাঝে মাঝে যে অন্যের কথাও বিবেচনা করতে হয়, তাঁর অতি অবুঝ মন সেটা মানতে চায় না। এই অপরিণামদর্শীতাই যেন তাঁর জন্য কাল হয়ে দাঁড়াল।

২০১৫ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারী ভোরে তিনি স্ব-স্ত্রীক ঢাকায় আসেন। ঢাকায় তিনি ফার্মগেইটে তাঁর মামা'শ্বশুরের বাসায় উঠেছিলেন। সন্ধ্যায় বন্যাদিকে নিয়ে আমাদের বাসায় আমাদের সাথে দেখা করতে আসেন। রাতে তাঁরা আমাদের বাসায়ই ছিলেন। পরদিন সকালে তাঁরা ফার্মগেইটে ফিরে যান। ঐ সপ্তাহের শুক্রবার আমরা বাসায় নৈশভোজের আয়োজন করি। এসময় আমরা বাসায় ঢাকার কিছু আত্মীয়স্বজনকে নিমন্ত্রণ করি। যাই হোক, রাতের খাওয়াদাওয়ার পর সবাই যার যার বাসায় ফিরে যায়। আমার স্পষ্ট মনে আছে, ২৪ ফেব্রুয়ারী তিনি ও বন্যাদি আমাদের সাথে দেখা করতে আসেন। তাঁদের নাকি কোলকাতায় বেড়ানোরও পরিকল্পনা ছিল। আমাদের সবার ইচ্ছা ছিল, কোলকাতা থেকে ঢাকা ফেরার পর একদিন শুধু তাদের নিয়ে দুপুরে বা রাতে খাওয়াদাওয়ার আয়োজন করা হবে। কিন্তু, বইমেলার অদম্য দুর্নিবার আকর্ষণে অভিজিৎ রায়ের চাপে বন্যাদিকে কোলকাতা যাওয়ার পরিকল্পনা বাতিল করতে হয়েছিল। যাই হোক, পরদিন বিকেলে বাবা ও আমি তাঁদের ফার্মগেটের বাসায় বেড়াতে গিয়েছিলাম। বন্যাদি ঢাকায় আসার পর বায়ুদূষণের কারণে শারীরিকভাবে অসুস্থ ও দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। সেসময় অভিজিৎ রায় বই মেলায় ছিলেন। আমি তাঁর মোবাইলে ফোন করে জানতে পারি, তিনি বইমেলায় আছেন ও সন্ধ্যা ৭টার মধ্যেই ফিরবেন। আমার স্ত্রীও আমাদের সাথে আসতে চেয়েছিলো। কিন্তু ধুলাবালিজনিত সর্দি ও জ¦রে সে আসতে পারেনি। যাই হোক, রাত ৮ টার মধ্যে আমরা বাসায় ফিরে আসি। দিনটি ছিল ২৫ ফেব্রুয়ারী। তখন তাঁর ও বন্যাদির সাথে ঠিক হয়, ২৭ ফেব্রুয়ারী সবাই মিলে বই মেলা ঘুরব। ২৬ ফেব্রুয়ারী আসল সেই ভয়াবহ দিন। ঐ দিন তিনি স্ব-স্ত্রীক যথারীতি বইমেলায় ছিলেন। ঐ দিন শুদ্ধস্বর প্রকাশনার তরফ থেকে মোড়ক উম্মোচন করা হবে। রাত পৌনে দশটায় বাসার টেলিফোনে রিং বেজেছিল। বাবা ফোন ধরে। আমি ঘর থেকে শুনতে পাই, বাবার আওয়াজ, ’কি হয়েছে? অভিজিৎ ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালে! কখন ঘটেছে?’ আমি প্রথমে ভেবেছিলাম, সম্ভবত তাঁদের গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করেছে। কালবিলম্ব না করে, রাত দশটার মধ্যে বাবা ও আমি সিএনজিতে ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। বাবার মুখে শুনলাম, অভিজিৎ ও বন্যাদিকে কারা যেন রাত সাড়ে আটটায় টিএসসিতে চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে মারাত্মকভাবে জখম করেছে। মেডিকেলে পৌছে দেখলাম, ভয়াবহ রক্তাক্ত দৃশ্য। পুলিশ, র‌্যাব, সাংবাদিকসহ অগণিত লোকের ভীড়। একটি ওয়ার্ডে দেখলাম, বন্যাদির

সারা মাথা, হাত ব্যান্ডেজে বাঁধা। তাঁর পুরো শরীর রক্তে রক্তাক্ত। কর্তব্যরত চিকিৎসক বাবাকে একটি বেডে বসিয়ে আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে যান। বলে, 'অভিজিৎকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তার না বাঁচার সম্ভাবনা ৯৯%।' আমি করজোরে বললাম, 'ডাক্তার সাহেব, আপনি যে করেই হোক, সামান্য সম্ভাবনা থাকলেও অভিজিৎকে বাঁচান।' আমার স্ত্রী আমাকে ফোন করে বলে, 'দাদা কোথায়?' আমি তাঁকে ১০০ নম্বর ওয়ার্ডে আসতে বলি। সে তাঁর ১০-১৫ মিনিট পরেই সেখানে চলে আসে। ডাক্তার আমাকে বন্যাদির সিটি স্ক্যান সংক্রান্ত একটি কাগজ ধরিয়ে দেয়। আমার তখন উদভ্রান্ত অবস্থা। সেখানে একজন ভদ্রলোক (পরে তাঁর সাথে পরিচয় হয়, তিনি শুদ্ধস্বর প্রকাশনার সম্পাদক) আমাকে কাঁদতে কাঁদতে বলেন, 'Avijit expired' আমি হতভম্ব। আমি কিছুতেই তা বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। আমার মনে হলো, 'না না, এ হতে পারে না। হয়তো তিনি ভুল বলছেন বা ভাবছেন।' তখন আমার শ্যালক কাছেই ছিলো। পরিস্থিতি সামাল দিতে সে বলে উঠল, 'না, না, দাদা। অভিজিৎদা বেঁচে আছেন। তুমি টেনশন করো না। আমি খবর নিচ্ছি। ' তখন আমার পরিচিত অনেক কলিগই ফোন দিচ্ছিল। কিন্তু ফোনে কথার বলার মানসিক অবস্থা ছিল না। আমার আরো আত্মীয়স্বজন হাসপাতালে এলো। সবাই কাঁদছিল। কয়েকজন সাংবাদিক এ অবস্থায় সাক্ষাৎকার নিতে চাইছিলেন। কিন্তু আমরা তাদের এখন সাক্ষাৎকার না নেওয়ার অনুরোধ করলাম। সবাই কান্নাকাটি করছিল। বাবাকে গণজাগরণ মঞ্চ, সমাজতান্ত্রিক ফ্রণ্ট সহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতাকর্মীরা একটি ঘরে নিয়ে গেল। বন্যাদিকে যখন সিটি স্ক্যানের জন্য একটি রুমে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, বন্যাদি আমাকে বারবার জিজ্ঞেস করছিলেন, 'অভি কোথায়? সে বেঁচে আছে তো?' আমি বললাম, 'তাঁর অবস্থা নাকি সিরিয়াস। সে এখনো অপারেশন থিয়েটারে।' আমার শ্যালক কৌশিকও বন্যাদিকে সান্ত¡না দিচ্ছিল। আমার স্ত্রী আমাকে বারবার অভিজিতের অবস্থা জিজ্ঞেস করছিল। কিন্তু আমি কিছুই বলতে পারলাম না। আমি যা নিজেই বিশ্বাস করতে পারছি না, কিভাবে তাকে বলব? হাসপাতালে থাকতে থাকতে কখন যে মধ্যরাত পার হয়ে গেল, তা টেরই পেলাম না। যে রুমে বাবাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, আমিও সে রুমে গেলাম। বাবার মনকে শক্ত রাখার জন্য নানা বিষয়ে কথা হচ্ছিল। এরপর মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল আমাকে রুম থেকে ডেকে নিয়ে গেলেন। আশেপাশে স্ত্রীসহ অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন ছিল। তিনি আমাকে বললেন, 'Avijit is not alive.' আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারলাম না। আমি বললাম, 'এ কি বলছেন আপনি?' আমার শ্যালক যাতে আমার কিছু না হয়, সাথে সাথে আমাকে শক্তভাবে জড়িয়ে ধরল। আমি যেন বাকরুদ্ধ। বাবাকে কি বলব? মাকে কি বলব? এরপর গণজাগরণ মঞ্চের আহ্বায়ক ইমরান সরকার সাহেব বাবাকে খুব ঠাণ্ডাভাবে অভিজিতের মৃত্যু সংবাদ জানালেন। আমি ভাবলাম, বাবার যে কি হবে? কিন্তু বাবা শক্ত রইলেন ও মনের জোরে নিজেকে সামলে নিলেন। এই হলো সেই বিভীষিকাময় রাতের দুঃস্বপ্ন।

তারপর আমি, আমার স্ত্রী ও অন্যান্য আত্মীয়রা ডাক্তারের পরামর্শে বাবাকে বাসায় নিয়ে গেলাম। আমার শ্যালক ও দুই মামাতো ভাই হাসপাতালে থেকে যায়। রাত প্রায় একটা নাগাদ বাসায় ফিরি। বাবা মাকে অনেক কষ্টে অভিজিতের মৃত্যু সংবাদ জানালো। সারা বাড়িতে কান্নার রোল পড়ে গেল। মা ভীষণভাবে কাঁদতে লাগলেন। সারা বাড়ি যেন স্তব্ধ। টিভিতে এই খবরটি প্রচার হচ্ছিল। টিভিতে আমাদের সবার শোকাবহ অবস্থার ছবি দেখানো হচ্ছিল। এর মধ্যে টুকরো খবরে দেখলাম, ঢাকা

মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের কাছাকাছি ককটেল ফাটিয়ে উল্লাস প্রকাশের ঘটনা। খুনীরা যে কত বেপরোয়া তা বুঝতে বাকি রইলো না। ঐ রাতেই বাবার মোবাইলে কে যেন হুমকি দেয় , আল্লাহর পথে না চললে অভিজিতের মতো পরিণতি বরণ করতে হবে। বাবা বলে, 'আপনাদের এত সাহস? আমার ছেলেকে খুন করেও আপনাদের সাধ মিটল না!' বাবা ফোন কেটে দেয়। বাবার মোবাইলে আবার কল আসে। আমার মামা ফোনটি ধরলে হুমকিদাতা আরও জঘন্য আশীলন ভাষায় হুমকি দেয়। পরদিন সকালে শাহবাগ থানায় মামলা করা হয় ও কোন নম্বর থেকে হুমকি আসে তাও জানানো হয়। শনিবার ২৮ তারিখ আমাদের স্কুলে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হয়েছিল। কিন্তু আমি মানসিক অবস্থার কারণে স্কুলে শুধু স্বাক্ষর করে বাসায় চলে আসি। আমাদের বাসায় দিনের পর দিন ধরে অসংখ্য সাংবাদিক, পুলিশ, মন্ত্রী ও আমাদের শুভ্যানুধারীদের আনাগোনা। বাবা প্রথমে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, আমার ভাইয়ের লাশ শ্মশানে দেওয়া হবে। কিন্তু আমি তাতে বাদ সাধলাম। কারণ আমি ছোটবেলা থেকেই তাঁকে দেখছি, তিনি স্বঘোষিত নাস্তিক। সমস্ত ধর্মীয় আচারঅনুষ্ঠানের তিনি বিপক্ষে। আমি বাবাকে বোঝালাম, 'বাবা, যেহেতু ও সমস্ত ধর্মীয় লোকাচারের বিরুদ্ধে, তাঁর আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর মরদেহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালেই দেওয়া উচিত।' বাবা একমত হলো। পারিবারিক সম্মতিক্রমেই তাঁর দেহ ঢাকা মেডিকেলে দানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। ১ মার্চ তাঁর দেহ হিমাগার থেকে বের করে সুরক্ষিত অবস্থায় প্রথমে তাঁর অধীত প্রতিষ্ঠান বুয়েটে প্রায় ১ ঘন্টা ও পরে কলাভবনের অপরাজেয় বাংলায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে দীর্ঘ সময় থাকার পর ও শ্রদ্ধাঞ্জলির পর এ্যাম্বুলেন্স বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। বাসার সকলে কান্নায় ভেঙে পড়ে। নিচে ১ মিনিটের জন্য কফিন খুলে উপস্থিত জনতাকে দেহ দেখানো হয়। তারপর কফিন নিয়ে আমরা সবাই মেডিকেলে যাই এবং তাঁর দেহ সেখানে দান করা হয়। ইতিমধ্যে বন্যাদিকে স্কয়ার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ও তাঁকে সব জানানো হয়। ২ মার্চ বাবা, আমি ও আমার স্ত্রী বন্যাদির সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম। বন্যাদিকে সান্তনা ভাষা আমাদের নেই। বন্যাদি বলেছিলেন, 'আমি এরজন্য প্রস্তুত ছিলাম। আমি এও বলেছিলাম, যদি অভি বেঁচে থাকে, সে সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত আমি ঢাকা মেডিকেলা হাসপাতালেই থাকবো। কিন্তু সে মারা গেলে আমাকে যেন অন্যত্র নেওয়া হয়। যখন আমাকে এখানে আনা হলো, তখনই আমি বুঝলাম, সে নেই।' তিনি আরও জানালেন যে, অভিজিৎ উইল করে রেখেছিল, 'তার মরদেহ যেন মেডিকেলে দান করা হয়।' ঐ দিন রাতেই তাকে বিশেষভাবে নিরাপত্তা দিয়ে প্লেনে যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর ৬ মাসের অধিক সময় পার হয়ে গিয়েছে। তাঁর হত্যাকারীদের বিচার তো দূরের কথা, অভিজিৎ হত্যার পর পরবর্তী ৩ মাসে আশিকুর রহমান ও অনন্ত বিজয় দাশকেও একইভাবে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। তারপর শেষ শিকার হয় নিলয় নামের মুক্তচিন্তার লেখক। সত্যিই কি বিচিত্র দেশে আমরা থাকি ! ধর্মের সমালোচনা করে লিখলে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত আসে, তা রাষ্ট্রের চোখে অপরাধ। অথচ প্রগতিশীল মুক্তচিন্তার লেখকদের হত্যা করলে সে হত্যার দায় রাষ্ট্র নেয় না, অপরাধ কি? অপরাধ হলো নাস্তিকতা! খুনীরা বহাল তবিয়তে থাকে! ধার্মিকরা নাস্তিকদের সমালোচনা, গালাগালি, এমনকি খুনোখুনি করতে পারবে, কিন্তু নাস্তিক ধর্মের ব্যাপারে ব্যক্তিগত মতামত দিতে পারবে না। এই হলো ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ!

সবাই বলছে, অভিজিতের বিচার না কি হবে না! এই দেশে কিছুই হবে না। আমার প্রবাসীরা বন্ধুরাও একই কথা বলে। কিন্তু কেন? কারণ, সরকার ও জনগণ ধর্মান্ধ। আমারও দেশের বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে তাই মনে হয়। আবার মনে হয়, 'না, ৬ মাস হোক, ১ বছর হোক, নিশ্চয়ই আমার ভাইয়ের খুনীরা ধরা পড়বে ও তাদের ফাঁসি হবে। আর অভিজিতের মতো কোন বলিষ্ঠ , সাহসী, স্পষ্টভাষী লেখক খুন হবে না। প্রকৃতির নিয়মে সত্য একদিন প্রকাশিত হবেই।' অভিজিত কি নেই? না, তিনি আছেন। তাঁর চিন্তা, কর্ম ও লেখার মধ্য দিয়েই তিনি বেঁচে থাকবেন। আসছে ১২ই সেপ্টেম্বর তাঁর শুভ জন্মদিন। তিনি ছিলেন, আছেন, থাকবেন। কিন্তু তাঁর খুব সকালের সুমিষ্ট কণ্ঠ কি আর শুনতে পাবো? তাঁকে কি শুভ জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে পারবো? ১২ই সেপ্টেম্বর সকালে কি বাসার ফোন বেজে উঠবে? শোনা কি যাবে, 'অনু, কেমন আছিস? কি খবর তোর? সবকিছু কেমন চলছে?' তাঁর জন্মদিন আসছে, অথচ তিনি নেই, তা কি হয়?

অনেক কথার মাঝে আমি একটি কথা এখনো বলিনি। অভিজিৎ রায় আমার চেয়ে ৫ বছরের বড়। কিন্তু তাঁকে কখনো আপনি বা তুমি বলিনি, এমনকি দাদাও সম্বোধন করিনি। আমার কাছে এসব ফর্মালিটি। তাঁর ডাক নাম গুল্লু। আমরা পরস্পরকে তুই বলেই সম্বোধন করতাম। সে যেমন আমাকে অনু বলে ডাকে, আমিও তেমনি গুল্লু বলেই ডাকি। সবার কাছে অভিজিৎ হলেও আমার কাছে সে এখনো গুল্লু।

যাই হোক, প্রকৃতির নিয়মে একসময় সবকিছুই স্বাভাবিক হয়ে যায়। আমরাও শোক কাটিয়ে দৈনন্দিন জীবনে ফিরে এসেছি। কিন্তু আমরা কি একটি দিনের জন্য এই সোচ্চার, সাহসী, বলিষ্ঠ যুবককে ভুলতে পারবো? পারবো না, কারণ তিনি তো ভুলে যাওয়ার মতো মানুষ নন। তাঁর কর্মই তাঁকে চিরজাগ্রত করে রাখবে ও মানুষকে সোচ্চার, নির্ভীক, বলিষ্ঠ, স্পষ্টভাষী, মুক্তচিন্তাসম্পন্ন ও সত্যের পথে চলার অনুপ্রেরণা জোগাবে। আমরা যদি তাঁর কীর্তিকে মনেপ্রাণে তাঁর মতো সাহসিকতার সাথে দৃঢ়চিত্তে ধরে রাখতে পারি, তাহলেই তিনি বেঁচে থাকবেন।



ভাল থাকিস গুল্লু

আদিল মাহমুদ

অভিজিত রায়। ছেলেটাকে মনে হয় জীবনে কোনদিন এই পোষাকী নামে ডাকিনি। এমনকি কোন বন্ধু বান্ধবকেও ডাকতে শুনেছি বলে মনে পড়ে না। দুই যুগেরও আগ থেকে পরিচিত ছেলেটা আমার কাছে গুল্লু হয়েই থেকে যাবে সারা জীবন, ছোটবেলার অন্য বন্ধুবান্ধবদের কাছেও মনে হয় গুল্লু নামেই থেকে যাবে। ব্যাক্তি অভিজিতকে নিয়ে স্মৃতিচারনা অবশ্য এই লেখার প্রাসংগিকতা নয়। ব্লগার হওয়া আসলে কোন ব্যাপার না। ইন্টারনেট ব্যাবহারকারী যে কেউই ব্লগার হতে পারে। আমি কিভাবে ব্লগার হলাম সেটা বর্ননা করা তাই উৎসাহ ব্যাঞ্জক কিছু হবার কথা নয়, বিশেষ করে আমার মত নন-সেলিব্রিটি ব্লগারের উত্থান। আমার উত্থান পর্বে আছে সেই বাল্যবন্ধু গুল্লুর উৎসাহ দেবার প্রবল ভূমিকা।

২০০৮ সালের মাঝামাঝি দিক থেকে ব্লগ জগতে ঢুঁ মারা শুরু করি। সদালাপে সে বছর দুয়েকটা লেখা দেই, অবশ্য স্বতন্ত্র কোন লেখা নয়, বলা ভাল লেখার প্রত্যুত্তর। এর কিছুদিন পর থেকেই মুক্তমনার সন্ধান পাই এবং খুলে যায় এক ভিন্ন জগৎ। আলোকিত হওয়া বলতে আমি অন্তত ঘোষনা দিয়ে 'আমি নাস্তিক হয়ে গেলাম' বা 'অমূক ধর্ম গ্রহন করলাম' এমন কিছু বুঝি না। আলোকিত হওয়া বলতে আমি বুঝি নিরপেক্ষভাবে তথ্য যুক্তিনির্ভর ভাবে গ্রহন বর্জনের স্বভাব অর্জন করা। এর সাথে আস্তিকতা নাস্তিকতার সম্পর্ক আমি দেখি না। মুক্তমনার নেশায় বুঁদ হয়ে বহু সময় ব্যায় হয়েছে, বিনিময়ে পেয়েছি যুক্তি তথ্যনির্ভর আলোচনা গড়ে তোলার মানসিকতা। অবাক হয়ে দেখতাম অভিজিত রায় (তখনো সেইই যে আমার বাল্যবন্ধু সেটা জানি না) কি নিদারুন ধৈর্য্যের সাথে সব পুরোপুরি ভিন্ন মেরুর লোকজনের সাথেও আলোচনা চালিয়ে যেতে পারেন। আরো বিস্ময়ের সাথে দেখতাম ভদ্রলোক জানেন না এমন কোন বিষয় সম্ভবত আসলেই নেই। সাথে আছে চমৎকার রসবোধ।

এভাবে মাস ছয়েক কেটে যাবার পর একদিন সাহসে ভর করে জিজ্ঞাসা করেই ফেললাম আমি যাকে মনে করছি উনিই তিনি কিনা। জবাবটা ৬ বছর আগেকার পুরনো ই-মেইল ঘেঁটে বার করলাম।

Hya ami-i shei! amake "Tui" korei bol.

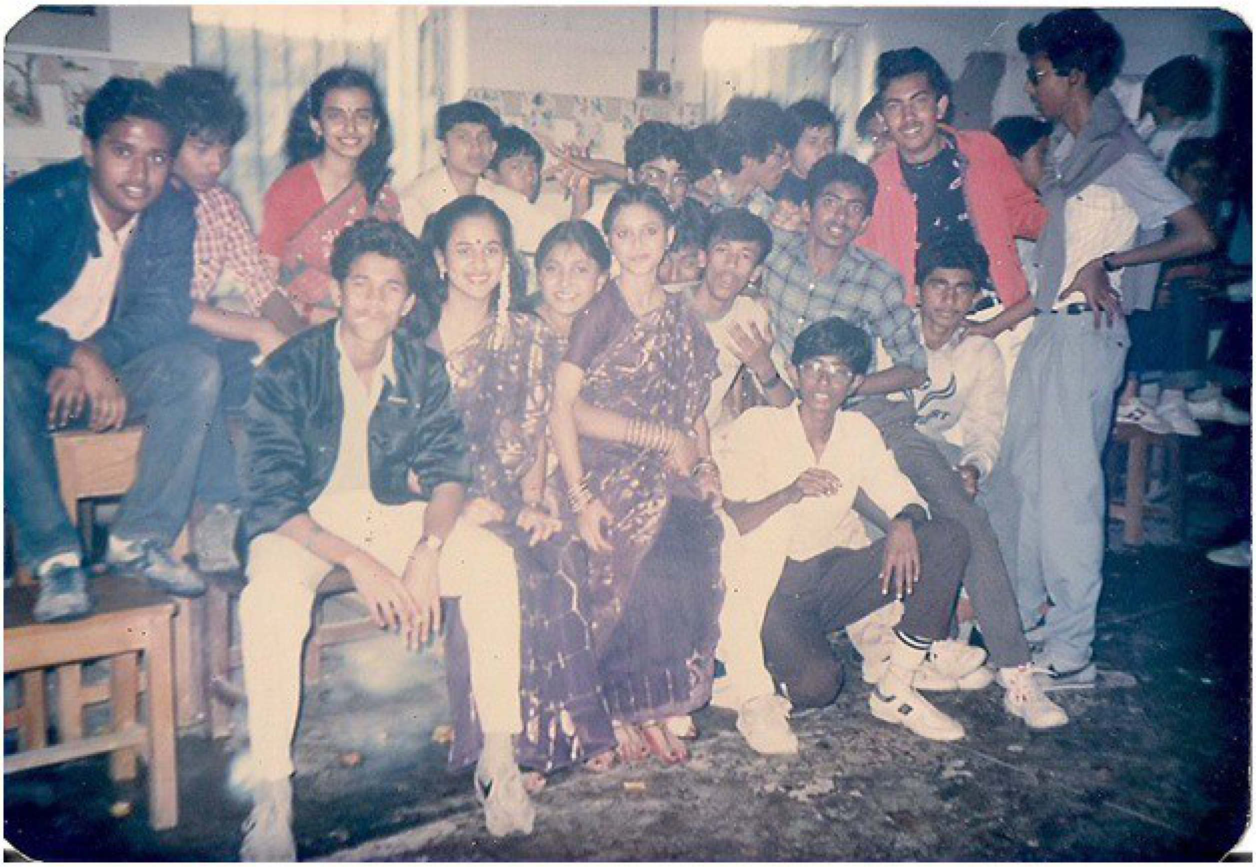
Blog e lekha kono edit charai dite parbi. Ami ekhon out of town...tai details response dite parlaam na. but ami eshe tor shathe jogajog korbo. What e surprise...ebhabe je purono bondhu khuje pawa jay taai jantam na.

You are a very good writer. I am not exagerrating it! Please keep on writing.

Bhalo thakish.

Avijit

কোথায় যেন তখন বেড়াতে গিয়েছিল, বাংলিশে জবাব দিয়েছিল। এরপর বাড়ি ফিরে ফোনে যোগাযোগ করে। তার মত লোকে লেখালেখিতে উৎসাহ দেওয়াতে মনোবল বেড়ে যায় বহুগুন। নইলে আমার দ্বারা ফেসবুকিং এর বেশী কিছু হত বলে মনে হয় না। ব্যাক্তিগতভাবে আমি নিতান্তই ছাপোষা মানুষ, কোনদিন স্কুল ম্যাগাজিন বা দেওয়াল পত্রিকাতেও কিছু লিখিনি। এমনিভাবে আরো অনেককেই উৎসাহ দিয়ে লেখক বানিয়ে ছেড়েছে অভিজিত। যার সাথে দীর্ঘ ২ যুগের চিন পরিচয়, তুই তোকারি সম্পর্ক তাকেই ব্লগে আপনি আপনি করতে হত, সে ছিল এক বাড়তি যন্ত্রনা।



দশম শ্রেনীর অভিজিত ওরফে গুল্লু (লাল জ্যাকেট পরিহিত)- ৮৭

লেখক বা ব্লগার হিসেবে বাংলা ব্লগে অভিজিত রায়ের ভূমিকা কতটা? বাল্যবন্ধু হলেও নিরপেক্ষভাবেই মূল্যায়নের চেষ্টা করবো।

অভিজিত রায় বাংলা ব্লগে তৈরী করে গেছে এক নুতন মাত্রার। হরেক রকম বিষয়ের ওপর উচ্চমান সম্পন্ন লেখা, এবং তদোপরি চমৎকার আলোচনা মুক্তমনাকে নিয়ে গেছিল এক ভিন্ন মাত্রায়। সম্ভবত বাংলা ব্লগ জগতে প্রথাগত ধর্মগুলির নানান দিন সমালোচনা করার ধারাও তৈরী করে গেছে অভিজিতই। এটা অবশ্যম্ভাবী হলেও শুধু এই কারনেই অভিজিত বহুজনের তীব্র মর্মবেদনার কারন হয়েছে। কাউকে কাউকে মনে হয়েছে অভিজিতের পেছু ধাওয়া করতে করতে রীতিমত মানসিক রোগীতে পরিনত হয়ে গেছে।

বাংলাদেশের মৌলিক সমস্যা কি? অশিক্ষা,দূর্নীতি.....অযোগ্য/দূর্নীতিবাজ নেতারা......অধিক জনসংখ্যা...তার তূলনায় সম্পদের অভাব.....ইত্যাদী ইত্যাদী। আমার ধারনা সব সমস্যা থেকে এক ষ্টেপ করে এগুলে থাকলে মূল সমস্যা হিসেবে বেরিয়ে আসবে আমাদের আবেগ-নির্ভর যুক্তিহীন মানসিকতা। দেশে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ যুক্তি নির্ভর সমাজ গড়ে তোলা। যুক্তি নির্ভর সমাজ গড়ে তোলা গেলে সেই সমাজে উপরোক্ত সমস্যাগুলি দীর্ঘমেয়াদে কমে আসবে শূন্যের কোঠায়। সেটা করা সম্ভব না হলে শুধু কাগুজে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি জাতীয় কিছু পরিসংখ্যান নিয়েই পরিতৃপ্ত থাকতে হবে। কাজেই যুক্তিবাদী সমাজের স্বপ্ন দেখা উচিত সকলের নিজ স্বার্থেই।

যুক্তিবাদী দাবী করা যতটা সোজা কাজে ততটা সহজ নয়। বিশেষ করে ভিন্ন ধরনের সংস্কৃতির মাঝে আজন্ম বসবাস করে আসলে। সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ এখানেই। অভিজিত মুক্তমনা শুরু করেছিল মূলত এই চ্যালেঞ্জকে মাথায় রেখে। সে স্বপ্ন দেখতো একটি বিজ্ঞান ভিত্তিক যুক্তিবাদী সমাজের। যুক্তিবাদী সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য চিন্তার স্বাধীনতা, যার প্রকাশ ঘটে বাক স্বাধীনতায়। এটা চিন্তাই করা যাবে না, ওটা বলা যাবে না, দীর্ঘকালের কোন কালচার সে যতই অযৌক্তিক উদ্ভট মানবিক হোক তার সমালোচনা করা যাবে না কারন তাতে কিছু মানুষের অনিভূতি আহত হবে এই ধরনের মানসিকতা প্রশ্রয় দিলে যুক্তিবাদী সমাজ গঠন করা যাবে না।

অভিজিত রায়ের মূল্যায়ন কিভাবে করা যায়? জরীপ চালানো হলে এই প্রশ্নের দেখা যাবে দুটো সুপষ্ট মেরুকরন। একদিকে জবাব আসবে অভিজিত রায় মহা ধর্মবিদ্বেষী লোক ছিল, কারন বাংলা ব্লগে ধর্মবিদ্বেষী লেখালেখির ধারা সেইই চালু করে গেছে, এই গ্রুপের কাছে তার আর অন্য কোন পরিচয় নেই, ভাবখানা এমন যে অভিজিত রায় কোনদিন ধর্ম, তাও আবার ধর্মবিদ্বেষ ছাড়া আর কিছুই লেখেনি। এটা যে কত বড় ডাহা মিথ্যা বা সম্পূর্ন বিদ্বেষ প্রসূত কথা তা ব্যাখ্যা করারও দরকার পড়ে না। বস্তুত ব্লগার, লেখক অনেকেই হতে পারে, কিন্তু অভিজিতের মত এমন বহু বিষয় নিয়ে উচ্চমানের লেখালেখি করার মত আর দ্বিতীয় কেউ আছে বলে আমার এ পর্যন্ত চোখে পড়েনি। বাক স্বাধীনতা শব্দটা আজকাল ভাল রকমের প্যাঁচানো হয়। সাম্প্রতিক সময়ে ব্লগারদের হত্যাকান্ডের পর আগে যারা বাক স্বাধীনতার স্বপক্ষে ছিলেন তাদেরও অনেকে ভোল পালটে ফেলেছেন। রিয়েল লাইফ সেলিব্রিটি হতে সাধারন ফেসবুকার সকলেই মোটামুটি একমত হচ্ছেন যে বাক স্বাধীনতার সীমা থাকা দরকার, বাক স্বাধীনতা মানেই যা ইচ্ছে তা বলার অধিকার নয়। কথাটা অবশ্যই মিথ্যা নয়। বাক স্বাধীনতার কোন সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা না থাকলেও এর যে অপপ্রয়োগ হতে পারে এবং হয় তা অবশ্যই মানা যায়। বাক স্বাধীনতা মানে নিশ্চয়ই কাউকে যাচ্ছেতাই গালিগালাজ করার অধিকার পাওয়া নয় কিংবা যাকে হেট স্পীচ বলা হয় তা প্রচারনার অধিকার দাবী করা নয়। বাক স্বাধীনতার পশ্চীমেও বাক স্বাধীনতার সীমারেখা শতভাগ সংজ্ঞায়িত করা সম্ভব নয়, কিছুটা গ্রে এরিয়া থেকেই যায়। ভাষাগত, পরিবেশগত অনেক ব্যাপার বিতর্কে চলে আসে।

আমাদের সমাজে যারা বাক স্বাধীনতার অপপ্রয়োগ সম্পর্কে ইদানীং সচেতন হয়েছেন তারা অবশ্য ঠিক এই দৃষ্টিকোন থেকে সচেতন হননি। তারা মূলত ধর্মানুভূতিতে (যদিও সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্মানুভূতি, ভদ্রতা করে সংখ্যাগরিষ্ঠ শব্দটা উল্লেখ করেন ন, কেউ কেউ অবশ্য সরাসরিই সংখ্যাগরিষ্ঠ উল্লেখ করেন) আঘাত জনিত সমস্যার কারনে বাক স্বাধীনতার বিরোধীতা করেন। অকাট্য যুক্তি হিসেবে এই দলের প্রায় সকলেই এক সময়ে কিছু পশ্চীমা দেশের হলোকাষ্ট ডিনাইয়াল ল'র রেফারেন্স টানেন।

এদের বোঝানো কোনদিনই যায় না যে (আসলে বুঝেও না বোঝার ভান করলে কারো পক্ষেই বোঝানো সম্ভব নয়) পশ্চীমে ধর্ম নিয়ে কোন রকম মাথা না ঘামিয়েও দিব্যি দিন কাটানো যায়, তাতে কারো কিছু তেমন যায় আসে না। কিন্তু আমাদের দেশে তার উপায় নেই, ধর্মকে এমনভাবে দৈনন্দিন জীবন যাত্রার সাথে জড়িয়ে রাখা হয়েছে যাতে ধর্ম সম্পর্কে উদাসীন থাকার কোন উপায় নেই। ধর্ম জগতে যারা বুঁদ হয়ে বসে থাকেন বা বসে থাকার ভান করেন তারা ধর্মকে এমন মাত্রায় নিয়ে যান যে এখানে পদে পদে ধর্ম এবং ধর্মীয় মহাপুরুষগন সমালোচনার মধ্যে পড়বেন।

একটি উদাহরন দেই। মাসখানেক আগে মাত্র সরকারী দলের অংগ সংগঠন দাবীদার ওলামা লীগ দাবী তুলেছে মেয়েদের বিবাহের কোন বয়সসীমা রাখা যাবে না, বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধের কুফরি আইন বাতিল করতে হবে। কারন? ওনাদের দাবী অনুযায়ী ইসলামী শরিয়তে বিবাহের কোন বয়স নেই। নবী মোহাম্মদ বিবি আয়েশাকে ৬ বছর বয়সে বিবাহ করেছিলেন। এখন ওনাদের দাবীর বিরোধীতা ওনাদের ধর্মানুভূতি কোনভাবে আহত না করে কিভাবে করা যেতে পারে কেউ ব্যাখ্যা করতে পারেন? ওনাদের ধর্মানুভূতি অক্ষুন্ন রাখার একমাত্র উপায় হল ওনাদের দাবী মেনে নেওয়া। নয় কি? আর ভিন্ন কোন পথ আছে কি? এই ধরনের প্রশ্ন করলে হলোকাষ্ট ডিনাইয়াল রেফারেন্স দেনেওয়ালারা সাধারনত উগ্র নাস্তিক, হাল আমলে খাঁসী গাল দিয়ে কেটে পড়েন। ওনাদের ধর্মীয় আইনে যা নেই, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং চির আদর্শ বলে ওনারা যাকে মানেন (শুধু ওনারাই নন, দলমত নির্বিশেষে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর সকলেই অন্তত মৌখিকভাবে মানে) তিনি যা করে দেখিয়ে গেছেন সে প্রথায় আপত্তিকর কিছু থাকতে পারে তা শ্রবন করলে ওনাদের ধর্মানুভূতি আহত হবে না? অবশ্যই হবে। এখন সেই অনুভূতির প্রতি সম্মান জানিয়ে সরকারের উচিত হবে দাবী মেনে নেওয়া?

একটি উদাহরন শুধু দিলাম। এ কারনেই বলেছিলাম যে আমাদের দেশে ধর্ম এড়িয়ে মুক্তচিন্তা, বাক স্বাধীনতার চর্চা কোনদিন সম্ভব নয়। আপনি চান আর না চান ধর্মকে জীবন যাত্রার মুখোমুখি দাঁড় করানো হবেই নানান ভাবে, ধর্মবিদ্বেষী না হয়ে কারোই সে পরিস্থিতি এড়ানোর উপায় থাকে না। মৌলবাদীরা যে দয়া করে এই জাতীয় আরো নানান ধর্মীয় দাবী তোলে না্ সে কারনে তাদের কাছে মডারেট ধার্মিকগনের উচিত কৃতজ্ঞ থাকা। জীবনযাত্রার সাথে ধর্মকে না জড়ানোর প্রবনতা যতদিন না বন্ধ হবে ততদিনই ধর্মানুভূতি আহত হবে, নবী রসূলের অপমানও হতে থাকব; এবং সবচেয়ে দূঃখজনক সত্য এই ধর্মানুভূতিতে আঘাত দেবার কাজ মুসলমানদের নিজেদেরই করতে হবে। আমার এ জাতীয় কথাবার্তা লোকে সাধারনত ঋষিসূলভ উদাসীনতার সাথে শ্রবন করে।

এটাও মানতে হয় যে উলটো দিকে ধর্মবিরোধী লেখার অধিকারের যৌক্তিকতাও খুব কম লোকেই সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন। বিরুদ্ধ মতের লোকরা এমন আর্গুমেন্ট দাঁড়া করান যাতে চুড়ান্তভাবে মনে হয় যে ধর্মবিরোধী লেখা তাদের বাক স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত; তাই তারা লিখে যাবেনই। এই এপ্রোচ আসলে ভুল, এভাবে লোকের কাছে ভুল ম্যাসেজ যেতে পারে। বাক স্বাধীনতার দোহাই পেড়ে গোয়ার্তুমি বা জোর জবরদস্তির চাইতে কেন তথাকথিত ধর্মবিদ্বেষী লেখালেখির অধিকার দরকার সেটা ব্যাখ্যা করা অনেক বেশী জরুরী এবং কার্যকরী।

ধর্মের মত একটি বিষয় নিয়ে পড়ে থাকা খুব সুখকর কিছু নয় আমি নিজেই এখন টের পাই। অভিজিত নিজেও ধর্ম সম্পর্কে লেখালেখি পরের দিকে একেবারেই কমিয়ে দিয়েছিল। ব্লগে অনেক সময়ই পরামর্শ দিত ধর্ম ছাড়া অন্য বিষয় নিয়ে লেখালেখি করতে। সে যে সময়ে ধর্ম সম্পর্কে উতসাহ হারিয়ে ফেলেছিল তখনো আমার উতসাহ ছিল তীব্র, তাই অবাক হতাম এমন যুক্তিবাদী একজন লোকে কিভাবে উতসাহ হারায়। আজ কয়েক বছর পর আমিও স্পষ্ট টের পাই কিভাবে উৎসাহ হারানোর ব্যাপারটা ঘটে।

আমার ধারনা ফেসবুক আবির্ভাবের পর বাংলা ব্লগ জগতে সরব বিপ্লব ঘটে গেছে, এবং সেই বিপ্লব ক্ষতিকর দিকে। অভিজিতের মানের লেখকও ফেসবুকে পরের দিকে প্রচুর সময় দিত, তার চাইতেও দূঃখজনক হল ফেসবুকের নেশায় পড়ে এমন সব লোকজনের সাথে তর্কে জড়াতো যাদের বেহুদা তর্ক করা ছাড়া অন্য কোন গুন নেই। কয়েকবার ভেবেছিলাম মানা করি ফেসবুকে বেশী সময় না দিতে, কখনো আর বলা হয়নি। এখান থেকে সম্ভবত আমাদের সবারই শিক্ষনীয় আছে।

বিদ্যা, জ্ঞানের একটি আলাদা শক্তি আছে। দেরীতে হলেও এর বিচ্ছুরন এক সময় না এক সময় ঘটেই। এক সময় অভিজিতও আর বিতর্কিত কোন লেখক হিসেবে পরিচিত হবে না এটা নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারি, হয়ত আমরা তখন থাকবো না। তাতে জগত সংসারের কিছু যাবে আসবে না। লেখার টপিকের সাথে লেখার তেমন কোন মিল নেই। ব্যাক্তিগত স্মৃতিচারনের চাইতে অভিজিতের দর্শন আলোচনাই ভাল মনে করলাম, শুধু বার বার অভিজিত এবং গুল্লুকে গুলিয়ে ফেলছিলাম। অভিজিত অনেক বড় লেখক, লেখক অভিজিতের মূল্যায়ন আসলে আমার আয়ত্বের বাইরে। গুল্লু আমার বন্ধু, যেখানেই থাকিস, ভাল থাকিস।

আদিল মাহমুদ
উত্তর আমেরিকা প্রবাসী।



তুমিতো নও কেবলই ছবি

ইরতিশাদ আহমদ

"মুক্তি আসুক যুক্তির আলোয়"
- ড. অভিজিৎ রায়।

অভিজিৎ তাঁদেরই একজন যারা এই পৃথিবীকে বদলাতে চেয়ে জীবন দিয়েছেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন মানুষের সংখ্যা খুব বেশি নয়। কিন্তু পৃথিবী এগিয়ে গেছে এঁদের কারণেই, এঁদের জন্যই পৃথিবীটা আগের চাইতে আরো বেশি বাসযোগ্য, আরো বেশি মানবিক।

এঁরাই পৃথিবীটাকে একটু একটু করে বদলে দিয়েছেন। এঁরাই জনে জনে ভিন্ন চিন্তার কথা ছড়িয়েছেন। এঁদের কারণেই মানুষ একজন একজন করে বদলে গেছেন। এঁরা মুক্তচিন্তা করেছেন, মুক্তচিন্তার কথা বলেছেন। সুন্দর পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেছেন, দেখিয়েছেন।

এঁরা জানতেন, মিথ আর মিথ্যা দিয়ে সৌন্দর্য সৃষ্টি করা যায় না, মানবিকতা প্রতিষ্ঠা করা যায় না, ন্যায়ভিত্তিক সমাজ নির্মাণ করা যায় না। কল্প-গল্প-কাহিনী-নির্ভর ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা, আচার-আচরণ আর দর্শনের ভিত্তিমূলে তাই চরম আঘাত হানতে এঁরা কুণ্ঠাবোধ করেন নি। কারণ, জানতেন ধর্মীয় কুসংস্কারের অর্গল ভাঙ্গতে না পারলে সুন্দর মানবিক ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

তাই অভিজিতের কাছে মুক্তমনা মানে শুধু নাস্তিক হওয়া ছিল না। মুক্তমনা মানে সামাজিক বৈষম্য , অমানবিক আচার-আচরণ, আর সব ধরনের নিপীড়ণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নেয়া। অভিজিৎ মুক্তমনা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেই অঙ্গীকারে। একটা সুন্দর, নৈতিক, মানবিক, সচেতন সমাজ গড়ার অভিপ্রায়ে।

কোন কিছুরই পূজারী ছিলেন না অভিজিৎ। কোন দর্শন-মতবাদ বা তত্ত্বকথা কিছুই মেনে নিতেন না যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই-বাছাই না করে। তথ্যনির্ভর যুক্তি আর যুক্তিনির্ভর সত্য ছাড়া আর কোন মতবাদেরই মূল্য ছিল না তাঁর কাছে।

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে লিখেছেন। গুরুদেব নামে পরিচিত এই বিশ্বকবিকে পাঠকের কাছে অভিজিৎ পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন একজন মানুষ হিসেবে - দেবতা হিসেবে নয়। বিবেকানন্দকে নিয়ে লিখেছেন, চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েছেন তাঁর স্ববিরোধিতা। মূর্তি আর ভাবমূর্তি ভেঙ্গে খানখান করেছেন মুক্তমনার পাতায় আর তাঁর পাঠকের চেতনায়। পৃথিবীকে বদলাতে হলে তো কিছু সংস্কার ,

কিছু ঘুণে ধরা রীতি-নীতি, কিছু পুরোনো ধ্যান-ধারণায় আঘাত করতেই হবে, ভাঙ্গতেতো হবেই কিছু আজন্ম-লালিত নিয়ম-কানুনের শৃংখল। অভিজিৎ তা করেছেন দ্বিধাহীন চিত্তে, নিঃশঙ্ক হৃদয়ে। কি হতো এই পৃথিবী না বদলালে? কি হতো যেমন আছে তেমন থাকলে? কি হয় যতকিছু অসত্য, যা কিছু মিথ্যা, যত অনাচার-অবিচার-অত্যাচার মেনে নিলে? অনেকেরই, বেশির ভাগ মানুষেরই কিছু হয় না। অভিজিতের মতো মানুষদের হয়। জ্ঞানের আলো জ্বালাতে না পারলে এই জীবনটা তাঁদের কাছে অর্থহীন। তাঁরা যে আলো হাতে আঁধারের যাত্রী!

অভিজিতের প্রথম বইটার নাম ছিল 'আলো হাতে আঁধারের যাত্রী'। গ্যালিলিও, কোপার্নিকাস , ব্রুনোদের নিয়ে লিখেছিলেন। সীমাহীন শ্রদ্ধা ছিল অভিজিতের এই মনিষীদের জন্য। , নিউটন অজ্ঞানতার অন্ধকারে আলো হাতে এসেছিলেন যাঁরা তাঁদের জীবন অভিজিৎকে আকর্ষণ করতো গভীরভাবে। হয়তো নিজের অজান্তেই তাঁদের জীবনের মতোই হয়ে গিয়েছিল অভিজিতের জীবন। জানার অদম্য ইচ্ছায়, জানানোর দূর্নিবার আকাঙ্খায় অভিজিতের নিজের জীবনটাও পালটে গিয়েছিল। এই নতুন জীবনে মৃত্যুকে নিয়ে দূর্ভাবনার কোন সময় ছিল না।
ফিরে যাই, পৃথিবী বদলানোর প্রসঙ্গে আবার। অভিজিতরা যে জীবন দিলেন পৃথিবীটাকে বদলানোর জন্য। তাঁরা কি পেরেছেন পৃথিবীটাকে বদলাতে? না কি শুধু শুধুই জীবনটা দিলেন! এই প্রশ্নের উত্তর খুব সোজা নয়। আবার খুবই সোজা। গ্যালিলিও কি বদলে দেন নি পৃথিবীটাকে ? কোপার্নিকাস? ব্রুনো? হাইপেশিয়া?

পৃথিবী বদলেছে কি না বোঝা মুশকিল, চর্মচক্ষে দেখাও যাবে না। কিন্তু অনেকের পৃথিবী কি অভিজিতরা বদলে দেন নি মুক্তমনার মাধ্যমে, তাঁদের লেখার মাধ্যমে? বদলে যে দিয়েছেন তার প্রমাণ পাবেন মুক্তমনার পাতায় পাতায়।

আজ অভিজিতের জন্মদিনে (আর ছয় মাস পরে তাঁর মৃত্যুদিনও আমাদের স্মরণ করতে হবে) খুব মনে পড়ছে মুক্তমনার পাঠক ও লেখক রানা ফারুকের কথা।

'পাঠকের চিঠি' দিয়ে লেখা শুরু করেছিল রানা মুক্তমনায়। প্রথম চিঠিটায় লিখেছিলেন,
'প্রথমে আমার পরিচয় দেই। আমার নাম ফারুক। বাসা পাবনা। আমি একজন ছাত্র। আমার বয়স -২২। আমার পরিবারের সবাই ইসলাম ধর্মের অনুসারী। সবাই নামাজ পরে। মুক্তমনার সাথে পরিচয় হওয়ার আগে ও আমি নামাজ পরত,ম এবং প্রচলিত ধর্ম বলতে সাহস করতাম না। হঠাৎ একদিন মেইল চেক করতে আমার মেইল এ আমার এক দাদা মুক্তমনার ওয়েব সাইটের ঠিকানা পাঠান তারপর কয়েকদিন ধরে যুক্তি, আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী, ধর্ম-বিজ্ঞান নাকি সংঘাত, ১-২৩ পাতায় যেসব লেখা পেয়েছি তা পড়েছি। আমার এতদিনের চিন্তা চেতনায় কি তাহলে সব মিথ্যা। আপনারা ধর্ম বিষয়ে যেসব তথ্য দিয়েছেন তা নিয়ে সত্যতা যাচাই করে দেখলাম আপনাদের কথাই সত্য। এই সব কথা আমার মনকে বিক্ষিপ্ত করেছে। আমি আরো জানতে চাই। ধর্মের প্রতি আর আস্থা রাখতে পারছিনা। আপনার সাহায্য কামনা করি। আমার মেইলে যদি পিডিএফ ফাইলে

কিছু এই বিষয়ে বই পাঠান এবং এই ধরনের ওয়েব ঠিকানা দেন তাহলে আমি খুবই উপকৃত হব। যাতে কেন নাস্তিক হলাম তা সবাইকে বুঝাতে পারি'।

উত্তরে অভিজিৎ বলেছিলেন,
'আপনি সাহস করে এতদিনকার বিশ্বাসের অচলায়তন ভেঙ্গে বেরুতে শুরু করেছেন, সেজন্য আপনাকে সাধুবাদ জানাতেই হয়। কিন্তু আপনার চিঠি পড়ে মনে হল আপনার শঙ্কা এখনো কাটেনি। দেখে মনে হচ্ছে - সত্য উদঘাটন করে আপনার মন বিক্ষিপ্ত হয়েছে। একটি কথাই কেবল বলব - ভয় পাবেন না। মনে সাহস রাখুন। একদিন হাটি হাটি পা পা করে আমরাও বিশ্বাসের দেওয়াল ভেঙ্গেছিলাম। প্রশ্নবিদ্ধ করেছিল,ম সমাজের জমে থাকা জীর্ণ সংস্কারগুলোকে। তবেই না আজকের জায়গায় পৌঁছাতে পেরেছি। কবি নজরুলের কবিতার লাইনটি নিশ্চয়ই মনে আছে - আমরা যদি না জাগি ম,, কেমনে সকাল হবে?"

পরের চিঠিতেই রানা ফারুক লিখেছিলেন,
"...এখন আমি মুক্তমনায় যে লেখা পাই তা প্রিন্ট করে আমার বন্ধুদের সাথে আলোচনা করি তারাও মুক্তমনার লেখা পড়ে আস্তে আস্তে বুঝতে পারছে। আমার বন্ধুরা সবাই এখন সাইবার ক্যাফে গিয়ে প্রথমে মুক্তমনায় কি আছে তা পড়ে এবং তা ডাউনলোড করে আনে। আমরা প্রায় ৪ জন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান বর্জন করেছি। আগে মনে হতো এগুলো ছাড়া চলতে পারব না। আমাদের মধ্যে অনেক পরিবর্তন হয়েছে যা মুক্তমনার জন্য সম্ভব হয়েছে'।

মুক্তমনা আর অভিজিৎ শত শত রানা ফারুকদের পৃথিবী বদলে দিয়েছে, পালটে দিয়েছে আরো অনেকের জীবন। ভিন্ন এক মননের অধিকারী হয়েছে তারা। মুক্তমনার সংস্পর্শে এসে তারা নিজেদের মনকে মুক্ত করে নিতে পেরেছে। অভিজিৎ আর মুক্তমনার পাঠকপ্রিয়তায়, জনপ্রিয়তায়, আর সীমাহীন প্রভাবে ভীত হয়েছে ধর্মীয় প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী। তাদের ক্ষমতা ছিল না মুক্তমনার প্রভাব ঠেকানোর। ভীরু কাপুরুষেরা হাতে তুলে নিয়েছে চাপাতি।

সেই চাপাতি কেড়ে নিয়েছে অভিজিৎ কে, ওয়াশিকুর বাবুকে, অনন্ত বিজয়কে, নীলাদ্রি নিলয়কে - মুক্তমনাদের কাছ থেকে। মুক্তমনারা তাদের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের হারিয়েছে। কিন্তু মুক্তমনারা হারে নি। অভিজিত, বাবু, অনন্ত, নিলয় হারে নি। তাঁদের জীবন দেয়ার মধ্যেই তাঁদের বিজয়ের বার্তা নিহিত। জিতেছে বলেই তাঁদেরকে জীবন দিতে হয়েছে।

অভিজিতের জন্মদিনে মুক্তমনাদের শুভেচ্ছা জানাই।
তুমিতো নও কেবলই ছবি - তুমি যে আলো হাতে আঁধারের যাত্রী! তোমার সহযাত্রীদের হাতে আজ সেই আলো - আরো দেদীপ্যমান, আরো উজ্জ্বল। অন্ধকার দূর হবেই। মুক্তি আসবেই যুক্তির আলোয়।



তোমার আলোয় মশাল জ্বেলে আমরা সবাই অভিজিৎ

রায়হান আবীর

১

মায়ের গর্ভ থেকে সংগ্রাম শুরু হয়েছিলো অভিজিৎ রায়ের। ১৯৭১ এর উত্তাল মার্চে তার বাবা অজয় রায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের শিক্ষক, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক। মুক্তিযুদ্ধ শুরুর মাত্র চার বছর আগে লীডস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিজ্ঞানে পিএইচডি এবং পোস্টডক্টরেট গবেষণা শেষ করে অজয় রায় ফিরে আসেন বাংলাদেশে, প্রিয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। দেশে এসে শিক্ষকতা, গবেষণার পাশাপাশি সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন প্রিয় দেশকে পাকিস্তানি শোষকদের হাত থেকে রক্ষার আন্দোলনে। ১৯৭১ সালের পঁচিশে মার্চের কালো রাতে পৃথিবীর ইতিহাসের বর্বরতম হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনা মাথায় নিয়ে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে নিরস্ত্র বাংলাদেশের উপর। রাত এগারোটায় ঢাকায় কারফিউ জারি করা হয়। টেলিফোনটেলিগ্রাফ সহ বাংলাদেশের সকল পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ করে দেওয়া হয়। ঢাকাকে আলাদা করে ফেলা হয় পুরো বাংলাদেশ থেকে। মানুষ হত্যার জন্য একের পর এক সামরিক অভিযান চলতে থাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে, রাজারবাগ পুলিশ লাইনে, ইপিআর এর সদর দফতর থেকে শুরু করে গুরুত্বপূর্ণ সব স্থানে। ট্যাঙ্ক, গ্রেনেড, আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে নির্বিচারে চলে সাধারণ মানুষ, ছাত্র, নারী, পুলিশ, আধা-সামরিক সদস্যদের উপর আক্রমণ।

সেই ভয়ংকর সময়টাতে অজয় রায়, তার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী শেফালী রায় ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুলার রোডের শিক্ষকদের আবাসিক এলাকায়। ক্র্যাক ডাউনের সেই সময়ে তালিকা হাতে অজয় রায়কে হত্যার উদ্দেশ্যে হাজির হয় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি দল। সদর দরজায় নকল তালা লাগিয়ে সেরাতে পাকিস্তানী সেনাসদস্যের বোকা বানিয়ে নিজেকে, পরিবারকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন অজয় রায়। ইংল্যান্ডের চাকরি-গবেষণা-নিশ্চিত জীবনকে ঠেলে সরিয়ে যেই মানুষটি বাংলাদেশে ফিরেছিলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছিলেন, পরদেশের হায়েনাদের আক্রমণে সপরিবারে বাধ্য হন গৃহত্যাগে। তার স্ত্রীর শেফালী রায়ের গর্ভে তখন বড় হচ্ছে বড় ছেলে অভিজিৎ রায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসায় ছেড়ে তখন ঢাকায় আত্মীয়, বন্ধুবান্ধবের বাসায় আশ্রয় নেন অজয় রায়। কারফিউ উঠে যাবার পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে সপরিবারে ঢাকা ত্যাগ করেন কুমিল্লার সোনামুড়া

সীমান্ত দিয়ে। ভারতের আপার আসামে তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশনে কর্মরত প্রকৌশলী বড় ভাইয়ের বাসায় অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে রেখে মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণের জন্য চলে যান অজয় রায়। পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণাকে আপাতত দূরে ঠেলে কাঁধে তুলে নেন অস্ত্র, কুমিল্লা সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে গেরিলা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে। অজয় রায়ের সেই মুক্তিযোদ্ধা দলটির বীরত্বপূর্ণ অভিযানের কথা বর্ণনা হতে থাকে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে দেওয়া বেতার তরঙ্গে। যুদ্ধের এক পর্যায়ে চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগের নেতা এম. আর. সিদ্দীকীর পরামর্শে আগরতলা হয়ে মুজিবনগরে চলে আসেন অজয় রায়। সেখানে গিয়ে জড়িত হয়ে পড়েন তাজউদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে গঠিত প্রবাসী স্বাধীন বাংলা সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে। অবৈতনিক সদস্য হিসেবে যোগ দেন বাংলাদেশ সরকারের প্ল্যানিং সেলে যোগ দেন এবং পরবর্তীকালে সেক্রেটারির দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

যুদ্ধের সেই উত্তাল সময় সেপ্টেম্বরের বারো তারিখ রোববার সকাল ১২:৪২ মিনিটে শিবসাগর জেলার নাজিরাতে একটি মাতৃসেবা হাসপাতালে জন্মগ্রহণ করেন অভিজিৎ রায়। রণাঙ্গনে থাকা বাবা অজয় রায় এক স্বেচ্ছাসেবকের কাছে জানতে পারেন তার প্রথম পুত্র সন্তানের পৃথিবীতে আগমনের খবর। চাইলেই তখন ছেলের কাছে চলে যাওয়ার উপায় ছিলো না তার, ছেলেকে কোলে তুলে নেবার সৌভাগ্য হয় অভিজিৎ রায়ের চৌদ্দ দিন বয়সে। ফিরে যান আবার রণাঙ্গনে। ১৬ই ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হলে, ১১ জানুয়ারি, ১৯৭২ সালে সদ্য ভূমিষ্ঠ অভিজিৎ রায়কে নিয়ে ত্রিশ লক্ষ মানুষের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে আসেন অজয় রায়। যোগ দেন কর্মস্থলে। ফিরে আসেন ফুলার রোডের বাসায়। শিক্ষকদের আবাসিক এলাকার স্যাঁতস্যাঁতে দেওয়ালের ছোট এক বাড়িতে বেড়ে উঠতে থাকেন অভিজিৎ রায়। ছোট বেলার সেই সময়ের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে অভিজিৎ রায় লিখেছিলেন-

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের এক ছোট্ট বাড়ির নোনাধরা দেয়াল আর স্যাঁতস্যাঁতে ছাদের নীচে থেকে আমরা সেটাকেই আমরা দু-ভাই তাজমহল ভেবেছি। ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসেই ছিলো উদয়ন স্কুল। সেখানে পড়তে গেছি পায়ে হেটে। দূরে কোথাও যেতে হলে রিক্সাই ছিলো অবলম্বন। বাড়ীর পাশেই বিরাট মাঠে ফুটবল ক্রিকেট খেলে কাটিয়েছি। বাবার কাছে বায়না ছিলো ভাল একটা ক্রিকেট ব্যাট। আমার মনে আছে, প্রথম যখন একটা ভাল ক্রিকেট ব্যাট বাবা নিউমার্কেট থেকে কিনে দিয়েছিলেন, আনন্দে প্রায় কেঁদে ফেলেছিলাম। পরে শুনেছিলাম বাবাও নাকি ছাত্রজীবনে ক্রিকেট খেলতেন। বাবা আমাকে 'রাজপুত্রে'র মত বড় করতে পারেননি বটে, কিন্তু বাবাই আমাকে যত রাজ্যের বইয়ের জগতের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। আমাদের শেলফে হাজারো বইয়ের পাশাপাশি ছিলো মুক্তধারার কিশোর -বিজ্ঞানের মজার মজার সমস্ত বই। জাফর ইকবালের 'মহাকাশে মহাত্রাস' কিংবা স্বপন কুমার গায়েনের 'স্বাতীর কীর্তি' কিংবা'বার্ণাডের তারা' এগুলো তার কল্যাণেই পড়া। বাবাই আমাকে হাতে ধরিয়ে দিয়েছিলেন সুকুমার রায়ের রচনা সমগ্র। হযবরল-এর বিড়াল, পাগলা দাশু আর হেশোরাম হুঁশিয়ারের ডায়রির কথা জেনেছি তার কাছ থেকেই। বাবাই আমার মনে বপন

করেছিলেন মুক্তবুদ্ধি আর সংশয়ের প্রথম বীজ। বাবাই আমাকে আবৃত্তি করতে শিখিয়েছিলেন রবিঠাকুরের প্রশ্ন কবিতা।

২

মুক্তিযুদ্ধ করে বিদেশী হায়েনাদের কাছ প্রিয় বাংলাদেশ মুক্ত হয়েছিলো ঠিকই, যদিও আমাদের অনেকের মনে প্রাণে লালিত পাকিস্তানি ভাইরাস ঠিকই রয়ে গেলো। সকল মুসলমান ভাই ভাই, এই বালখিল্য ফালতু কথার অসারতা আমরা মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে টের পেয়েছিলাম। আমরা ধর্মীয় সকল কিছুর ঊর্ধ্বে উঠে একটি বৃহৎ মুসলমান রাষ্ট্র দ্বিখণ্ডিত করে বের হয়ে এসেছিলাম। আমরা যুদ্ধ করেছিলাম মোল্লাদের বিপক্ষে, আল্লাহর আইন দিয়ে জাস্টিফায়েড করা গনিমতের মাল মেয়েদের ধর্ষণকারীদের বিরুদ্ধে।

কিন্তু সেই গৌরব কি আমরা ধরে রাখতে পেরেছি? পারি নি। ফেব্রুয়ারি, যে মাসটাকে আমি ভাবতাম ঢাকা শহরের সবচেয়ে প্রাণময় মাস, ২০১৫ সালের সেই মাসটির ছাব্বিশ তারিখ রাতে ইসলামিক সেক্যুলার বাংলাদেশে চাপাতি দিয়ে হামলা করে মেরে ফেলা হয় মুক্তমনা প্ল্যাটফর্মের প্রতিষ্ঠাতা অভিজিত রায়কে। অভিজিৎ রায় ছিলেন ধর্মনিরপেক্ষ, মানবতাবাদী লিখতেন। তিনি ভালোবেসেছিলেন বিজ্ঞান, ভালোবেসেছিলেন যুক্তি। তিনি লিখেছেন বিজ্ঞান, মুক্তচিন্তা, মানবতাবাদ, সাহিত্যসহ অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে। শুধু লেখালিখি করেই থেমে থাকেননি তিনি, একইসাথে বাংলাদেশের মুক্তচিন্তার আন্দোলনকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন আন্তর্জাতিক পর্যায়ে। ভাইরাসের চাপাতির আঘাতে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত অভিজিৎ রায় বাংলায় লিখেছেন এবং সম্পাদনা করেছেন দশটি বই।

সে'রাতে অভিজিৎ রায়ের সাথে থাকা তার স্ত্রী বন্যা আহমেদকেও কুপিয়ে আহত করা হয়, বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয় তার হাতের আঙ্গুল, চাপাতি দিয়ে আঘাত করা হয় তার মাথায় এবং চোখের সামনে ধ্বংস করে দেওয়া হয় তার অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ। অসহায়ের মতো বন্যা আহমেদ হারিয়ে যেতে দেখলেন তার প্রিয়তমকে আর আমরা দেখলাম আমাদের প্রিয় দাদার মাটিয়ে লুটিয়ে পড়ে থাকা, শুনলাম আমার বোনের আর্ত-চিৎকার, আরও দেখলাম ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গের কেচিগেট। কেচিগেটের ওপারে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকা আমার ভাই কিছুক্ষণ আগেই হাঁটছিলেন আমার বোনের হাত ধরে, হাজারো মানুষকে আপন ভেবে তারা এগিয়ে যাচ্ছিলেন সামনের দিকে, তখনও হয়তো তার মস্তিষ্কের নিউরনে লেখা হচ্ছিলো নতুন কোনো প্রবন্ধ, সমাধান হচ্ছিলো মুক্তমনার কারিগরি কোনো সমস্যা। আমার দাদা কিংবা বোন, আমার দেখা শ্রেষ্ঠতম মানুষ, তারা নিজেদের বদলে ভালোবেসেছিলেন তাদের দেশকে, ভালোবেসেছিলেন দেশের মানুষকে, আলোকিত করতে চেয়েছিলেন অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজটিকে। কিন্তু আলো অন্ধকারের সবচেয়ে বড় শত্রু, কারণ আলো জ্বালালেই দূর হয় অন্ধকার। আলোকে চাপাতি দিয়ে অন্ধকারকে কোপাতে হয় না, গুলি করতে হয় না, ঘিলু ফেলে দিতে হয় না। অন্ধকারে আলো হাতে পথ চলাই ছিলো তাদের অপরাধ, আমাদের

ক্ষয়ে যাওয়া সমাজে এই অপরাধ সর্বোচ্চ অপরাধ, এমন অপরাধীদের আমরা পেছন থেকে এসে হত্যা করি। কারণ আমরা অন্ধকার চাই। নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কা থাকা সত্ত্বেও সে রাতে আলো হাতে গিয়েছিলেন আমাদের আঁধারের যাত্রী, কারণ তাকে বলা হয়েছিলো বিজ্ঞান লেখকদের সাথে আড্ডার কথা। যদিও সেখানে বিজ্ঞান লেখকদের সংখ্যার তুলনায় অনেক অনেক বেশি ছিল গুপ্ত ঘাতকেরা। যারা তাকে ডেকে নিয়ে অন্ধকারের সঁপে দিয়েছিলো, তারা সেদিন তার মৃত্যুতে একটুও আলোড়িত হয় নি, ক্ষুধা পেলে আমাদের যেমন খেতে হয়, তাদেরও সেরাতে খুদা মেটাতে বিরিয়ানি খেতে হয়েছে, কারও বা খেতে হয়েছে মার হাতের রাতের খাবার কিংবা অংশ নিতে হয়েছে র‍্যাডিসনের পার্টিতে। সব শেষে তারা শান্তির নিদ্রা দিতে পেরেছে, কারও কারও সেই নিদ্রা ভাঙ্গতে লেগেছে বিশ দিন।

৩

স্বাধীন বাংলাদেশের এক অসম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম নিয়ে, টুপি পরে আইডিয়াল স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ালেখা করলাম, সপ্তম শ্রেণীতে চলে গেলাম খাকি চত্বরের খোঁয়াড় ক্যাডেট কলেজে। কলেজ শেষ করে মুসলমান কোটায় কোনো ভর্তি পরীক্ষা না দিয়ে ঢুকে গেলাম ইসলাম প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (আইইউটি) তে। আইইউটি, OIC পরিচালিত বাংলাদেশের অন্যতম ‘আন্তর্জাতিক’ প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গল্প শুনেছি তারা প্রত্যেক ছাত্রর পেছনে পনেরো হাজার ডলার ব্যয় করে শিক্ষাজীবনের চার বছরের বাজেট হিসেবে। ওআইসির সেই ফান্ডিং আমার কপালে জুটে নি, কারণ মুসলমান হলেও ভালো মুসলিম ছাত্র ছিলাম না, বাবা-মার পকেট থেকে মোটা অংকের টিউশন ফি দিয়েই তাই পড়াশোনা করতে হয়েছে।

আইইউটিতে ভর্তি হবার আগেই জানতাম এখানে কেবলমাত্র ‘মানুষ’ (শর্ত প্রযোজ্য) দের ভর্তি হবার সুযোগ দেওয়া হয়। ‘মুসলিম পুরুষ’ হওয়াটাই সেখানে মানুষ হবার একমাত্র শর্ত। আইইউটির দুয়ার নারী এবং অমুসলিমদের জন্য বন্ধ। এই চরম সাম্প্রদায়িক আচরণ আমাকে অবাক করলেও- অন্য সবার কাছে শুনেছি- জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে মুসলমানদের অবস্থা সারাবিশ্বেই খুব খারাপ, এখন মুসলমানরা যদি তাদের আত্মিক উন্নতি সাধনের জন্য নিজেরা নিজেরা বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করে নিজেরা নিজেরা পড়াশোনা করে নিজেদের উন্নতি সাধন করে সেটা নাকি ভালো। নারীদের ঢুকতে না দেওয়ার উছিলাটা ছিলো, তাতে করে বিশ্ববিদ্যালয় জুড়ে শুধু পাপাচার হবে। প্রথম বর্ষেই আমাদের তৎকালীন তড়িৎ প্রকৌশল বিভাগের প্রধান পাকিস্তানি অধ্যাপক বলেছিলেন ঠিক এই কথাটাই। রুমে ইন্টারনেট সংযোগ দেওয়ার অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতেও তার যুক্তি- ইসলাম ধর্মে প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে যাবার পর ভাই আর বোনেরও এক রুমে থাকা নিষিদ্ধ। ইন্টারনেটও ঠিক তেমন একটি প্রাপ্ত বয়স্ক আপন বোন, রুমে তাকে আমাদের সাথে রাখা একা রাখা যাবে না।

২০০৭ সাল। দ্বিতীয় বর্ষের সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষা শেষে দীর্ঘ তিনমাসের ছুটি চলছে। আমার বাসায় থাকতে ভালো লাগতো না, তাই ছুটির সময়েও হলে থাকতাম। সপ্তাহান্তে ছোট ভাই জান্নাকে দেখতে খুব ইচ্ছা হতো। ও তখন ক্লাস টু এর পুচকা এবং প্রতি সপ্তাহের শুক্রবারে আমাকে দেখতে পেলে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যেতো কারণ আমাকে বললেই আমি চকলেট, আইসক্রিম আর কোক খাওয়াতাম। গাজীপুর থেকে জ্যাম ঠেলে ঢাকা আসতে তিন ঘণ্টা সময় লাগে। সেই সময় আমার প্রথম পরিচয় হয় 'অভিজিৎ রায়' এর লেখার সাথে। প্রিয় বন্ধু 'শিক্ষানবিস' আজিজ মার্কেট থেকে দুইটা বই কিনে এনেছিলও। 'আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী' এবং 'মহাবিশ্বে প্রাণ ও বুদ্ধিমত্তার খোঁজে'। শিক্ষানবিস ময়মনসিংহের এক লাইব্রেরিতে আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রীর সামান্য অংশ পড়ে অভিজিৎ রায়ের লেখনীর উপর বেশ মুগ্ধ হয়েছিলো, তাই আজিজ থেকে "আস্ত" দু'টি বই কিনে আনা। পরের সপ্তাহান্তে জান্নাকে দেখার জন্য 'আলো হাতে আঁধারের যাত্রী'কে সঙ্গী করে জ্যাম হাতে বাস যাত্রী হলাম। সেই থেকে শুরু। অভিজিৎ রায়ের আলোয় কাল্পনিক সত্ত্বার দাসত্ব থেকে মুক্ত জীবন।

আমাদের সমাজ সদ্যজন্মজাত শিশুর ইহলৌকিক খেলার মাঠের মৌলিক চাহিদা পূরণে খুব একটা আগ্রহী না হলেও তার পরকাল নিশ্চিত করতে সিদ্ধহস্ত। জন্মগ্রহণ করতে না করতেই সে একটি নির্দিষ্ট ধর্মযুক্ত হয়ে যায়, তারপর ধীরে ধীরে তাকে শেখানো হয় সে যে দলভুক্ত তারাই সেরা, একমাত্র সত্যপথের অনুসারী। অন্যান্যদের জন্য রয়েছে...... (কী রয়েছে সেটা দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করুন)। আমার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। ছোটবেলা থেকেই আশেপাশের সবার কাছে আমার ধর্মের মুজেজা শুনেছি, আর ভেবেছি "ওয়াও!!"। আমার বন্ধু-বান্ধব কেউ অন্য কোনো ধর্মের অনুসারী ছিলো কিনা এখন মনে নেইথাকলেও তার সাথে ধর্ম সংক্রান্ত ব্যাপারে , আমার কথা হয়নি নিশ্চিত। হলে তখনই জানতে পারতাম, নিজ ধর্মকে অন্যদের চেয়ে সেরা প্রতিয়মান করার জন্য প্রত্যেক ধর্মই নানা ধরণের আকর্ষণীয় মুজেজা সংক্রান্ত গল্পের আশ্রয় নেয়। এই সহজ সত্যটা বোধহয় পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষই না জেনে ইন্তেকাল করেন।

আমিও হয়তো সে পথেই যাচ্ছিলাম। ক্যাডেট কলেজে কোনো এক শুক্রবার আমাদের মসজিদের ঈমাম আবেগঘন ওয়াজ করতে করতে এক গল্প শোনালেন। সে গল্পে ঈশ্বরের অসীম কুদরতে বিখ্যাত কোনো ব্যক্তির পাতে থাকা ভাজা মাছ হঠাৎ করে জ্যান্ত হয়ে পানিতে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতরে ছুটে চলে গভীর জলে, ঠিক যেন অলিম্পিক সাঁতারু মাইকেল ফেল্পস'এর মত। পারিবারিক কারণে আমি সেই সময় সাচ্চা ধার্মিক ছিলাম। ক্যাডেট কলেজে ভর্তি হতে পারলে "মান'ত" করেছিলাম সেখানে ছয় বছর এক ওয়াক্ত নামাজ বাদ দেবো না। সেটা সবসময় সম্ভবপর না হলেও সম্ভব করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা ছিলো। কোনো ভ্যাজালে পড়লে আর রহমান সুরা এগারো বার পড়ে ঈশ্বরের নিকট ঝামেলা মুক্তির আবেদন করতাম এ আশায় যে এগারো বার সুরা আর রহমান পড়লে যেকোনো ধরণের ঝামেলা থেকে প্যারোলে মুক্তি পাওয়ার বিষয়টা একেবারেই অব্যর্থ। এছাড়া পাশের বাড়ির কোনো মেয়েকে ভালো লাগলেও আর রহমান এবং সুরা ইয়াসিনের আশ্রয় নিতাম কারণ সুরাগুলো

যথাক্রমে এগারোবার ও তিন বার পড়লে মনোবাসনা পূরণ হতে বাধ্য। সুতরাং নিষ্ঠাবান ধার্মিক ছিলাম বলাই বাহুল্য। সেই আমিও হুজুরের বয়ানের পর বেঁকে বসলাম। মনে মনে ভাবলাম যদি সত্যিকার অর্থেই এখন ঘটনা কোরান হাদিসে থেকে থাকে আমি তবুও ভাজা মাছের অভাজা হয়ে যাওয়া বিশ্বাস করতে পারবোনা। ধন্যবাদ।

কিন্তু তাতে করে কোনো কিছুই বদলায় না। কোরান মহাসত্য গ্রন্থ এবং আল্লাহ এক এবং তিনি শুধু আমাদের দলে। এমন করে কেটে যেতে থাকা সময়ে একদিন কাঁটাবন মসজিদের লাইব্রেরীতে দুর্দান্ত এক বইয়ের সন্ধান পেলাম। ইসলাম ও বিজ্ঞান বিষয়ে আহমদ দিদাত এর লেখা। সে বইয়ে "মিরাকল নাইন্টিন" নিয়ে একটি অধ্যায় ছিলো- যা পড়ে আল্লাহ এবং বিশেষ করে কোরান যে অলৌকিক গ্রন্থ সে ব্যাপারে একেবারে নিঃসংশয় হয়ে গেলাম। "রাস্তা ঠিকাছে, এখন শুধু ঠিক ঠাক ড্রাইভ করে বেহেশতে পৌঁছাতে হবে, তারপরইইইই ..."। তখন বাংলা উইকিপিডিয়াতে সময় পেলেই নতুন নতুন নিবন্ধ তৈরি করি। বইটা পড়ার পর কোরানের সাংখ্যিক মাহাত্ম্য নিয়ে একটা নিবন্ধ খুলে ফেললাম। এই নিবন্ধই পরবর্তীতে জীবন বদলে দিয়েছিলো, কীভাবেসেটাতেই আসছি। ,

সচলায়তনে অভিজিৎ দা বিজ্ঞানময় কিতাব নামে এক পোস্ট দিলেন। ধর্মসংক্রান্ত অনেক বিষয়েই আমার সংশয় ছিলো, ছিলো সেই সংশয় মনের এক কোণে ফেলে রেখে স্বাভাবিক জীবন যাপনের চেষ্টাও। ধর্ম পালন না করলেও সমাজের অন্ধকার শিক্ষায় তখনও মানতাম ইসলাম একমাত্র ধর্ম, মানতাম আল্লাহ বলে আসলেই একজন আছে, মানতাম তিনি বই লিখে সেটা গোপনে একজনের কানে কানে বলে বিশ্বমানবতাকে পথ দেখান। কিন্তু অভিদার "বিজ্ঞানময় কিতাব" লেখাটা পড়ে সেদিন সবকিছু তাসের ঘরের মতো ভেঙ্গে পড়লো। অনুভব করলাম এতোদিন যা জানতাম সব মিথ্যা, যে গ্রন্থকে বিজ্ঞানময় ভাবতাম সেটা মোটেও বিজ্ঞানময় নন, বিজ্ঞানময়তার উদাহরণগুলো ভক্তদের বানানো মিথ্যা কথা। এভাবে শুধু মিথ্যা বলে একটা গ্রন্থকে এভাবে অলৌকিক করে ফেলা সম্ভব বুঝতে পারলাম। অবশ্য বিজ্ঞানময় কিতাব সে লেখাতে অভিদা মিরাকল নাইন্টিনের উল্লেখ করেননি। বুঝে গেলাম এটাও মিথ্যা দাবীই হবে। ইন্টারনেটে খুঁজলাম, অভিদার কাছে জানতে চাইলাম এবং দেখলাম আসলেই তাই। সেই থেকে শুরু আমার ধর্ম সংক্রান্ত স্কেপটিক ইনকোয়ারি। যত গভীরে যেতে থাকলাম, যতো পড়তে থাকলাম, ততো দেখলাম শৈশব থেকে লালন করা সংস্কারগুলো তাসের ঘরের মতো ভেঙে যাচ্ছে। হাজার বছর ধরে চলা ধর্মীয় ভণ্ডামি আর মিথ্যাচারের মুখোশ ধীরে ধীরে উন্মোচিত হতে থাকলো আমার কাছে।

'শিক্ষানবিস' তখন বিজ্ঞান এবং মাঝে মাঝে ধর্ম- বিজ্ঞান, সংশয়বাদ নিয়ে লিখতো। আমি সেগুলো পড়তাম, আর পড়তাম মুক্তমনার বিশাল আর্কাইভ। নিজেও তখন একটু একটু ব্লগিং শুরু করেছি যদিও সেটা নিন্তান্ত, ভাত খেয়ে যাচ্ছি, খেয়ে এসে ঘুমাবো টাইপের কথা বার্তা। কিন্তু হঠাৎ একদিন মনে হলো, একটা পাপ মোচন করা দরকার। উইকিতে মিরাকল নাইন্টিন নিবন্ধের পাপ মোচন। চিন্তা পর্যন্তই।

এরপর হঠাৎ একদিন ক্যাডেট কলেজ ব্লগে মিরাকল নাইন্টিন নিয়ে পোস্ট আসলো। সেখানে বর্ণনা করা হয়েছে কোরানের সব কিছুতে আছে মহান উনিশ। আল্লাহর অস্তিত্বের বাস্তব প্রমাণ একেবারে। আমি গা ঝাড়া দিয়ে বসলাম। মিরাকল নাইন্টিনের ভণ্ডামি তুলে ধরে একটা ব্লগ লিখলাম। এই লেখা যেহেতু আমার পাপমোচন লেখা ছিলো তাই এসব বিষয় নিয়ে পুনরায় আর কোনো লেখার আগ্রহ ছিলোনা। কয়েকমাস পরে, অভিদা আমাকে একটা মেইল দিলেন, মেইলের বিষয়বস্তু উনি নেট খুঁজে আমার মিরাকল নাইন্টিন লেখাটা পড়েছেন, আমি যেন মুক্তমনায় নিবন্ধন করে লেখাটা সেখানেও রাখি।

আরেকবার মুগ্ধ হবার পালা। কারণ তখন অভিদা, বন্যাপাকে মুক্তমনায় যাওয়া আসার সুবাদে চিনেছি ঠিকই কিন্তু এরা প্রত্যেকেই ছিলেন আমার কাছে বিশাল উচ্চতার একজন মানুষ। সেই অভিদা আমাকে মেইল করেছেন। তারপরই থেকেই মুক্তমনায় নিবন্ধন করে ধীরে ধীরে অতি আঁতেল সম্প্রদায়ের লেখা বিভিন্ন ব্লগে ভয়ে মন্তব্য করা শুরু করি।

২০০৯ এর ডিসেম্বরের দিকে অভিদা আর বন্যাপা ঢাকায় এসেছিলেন। অভিদা আগে থেকেই বলেছিলেন আগমনের খবর। উনারা ঢাকা আসা মাত্রই ছুটে গেলাম বন্ধু শিক্ষানবিস সহ। সুটকেস ভর্তি বই এবং চকলেট নিয়ে এসেছিলেন বন্যাপা আর অভিদা। আমরা নিজেদের বই ভাগাভাগি করে, সে বইয়ের গন্ধ শুকতে শুকতে আর চকলেট খেতে খেতে বিজ্ঞানমনস্ক সমাজ গঠনে তরুণদের ভূমিকা এবং করণীয় নামক বিষয় নিয়ে বিশাল জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করছিলাম। একেবারে শেষ মূহুর্তে অভিদা ভিক্টর স্টেংগরের “নিউ এইথিজম” বইটা কোন চিপা থেকে বের করে শিক্ষানবিস'এর হাতে দিয়ে বললেন, বইটা পড়তে। অনেক কিছু জানা যাবে।

শিক্ষানবিস'এর আগে সে বই আমি কব্জা করে পড়া শুরু করলাম। “অনেক কিছু জানার জন্য” না বরঞ্চ বইয়ের শুরুতে INGERSOLL'S VOW নামে ইঙ্গারসল সাহেবের একটি বক্তৃতার কিয়দংশ পড়ে মুগ্ধ হবার কারণে। তারপর পুরো বইটা অল্প দিনের কাছে মুখস্থ করে ফেলি। নাস্তিকতা নিয়ে বাজারে অনেক বই পাওয়া যায় কিন্তু নিউ এইথিজমের বিশেষত্ব ছিলো মূলতঃ এর রেফারেন্স কালেকশন। বইয়ের বিভিন্ন অধ্যায়ে বিবর্তন, জ্যোতির্বিদ্যা, ধর্ম, ঈশ্বর হাইপোথিসিস সহ বিভিন্ন বিষয়ে বর্তমান সময়ে নাস্তিকতার পুরো দর্শনটাই ফুটে উঠেছিলো। সবকিছু ছুঁয়ে যাওয়া বইটা পড়ে এসব বিষয়ে আগ্রহ বোধ করলাম, এবং রেফারেন্স উল্লেখ থাকা বইগুলো নামিয়ে পড়া শুরু করলাম। বাংলাদেশ থেকে ফিরে গিয়ে প্রায় একবছর পর অভিদা চিঠি দিয়ে বললেন- অবিশ্বাসের দর্শন নিয়ে একটা বই আমরা দুইজন মিলে লিখতে পারি কিনা। অভিদার সাথে লেখালেখির সূচনা হলো আমার। ২০১১ সালে শুদ্ধস্বর থেকে প্রকাশিত হয় ‘অবিশ্বাসের দর্শন’। বইটি সম্পাদনা কাকে দিয়ে করানো হয় সেটা ঠিক করতে আমার কিংবা অভিদার এক মুহূর্তও চিন্তা করতে হয় নি। ছিলেন অকালে হারিয়ে ফেলা

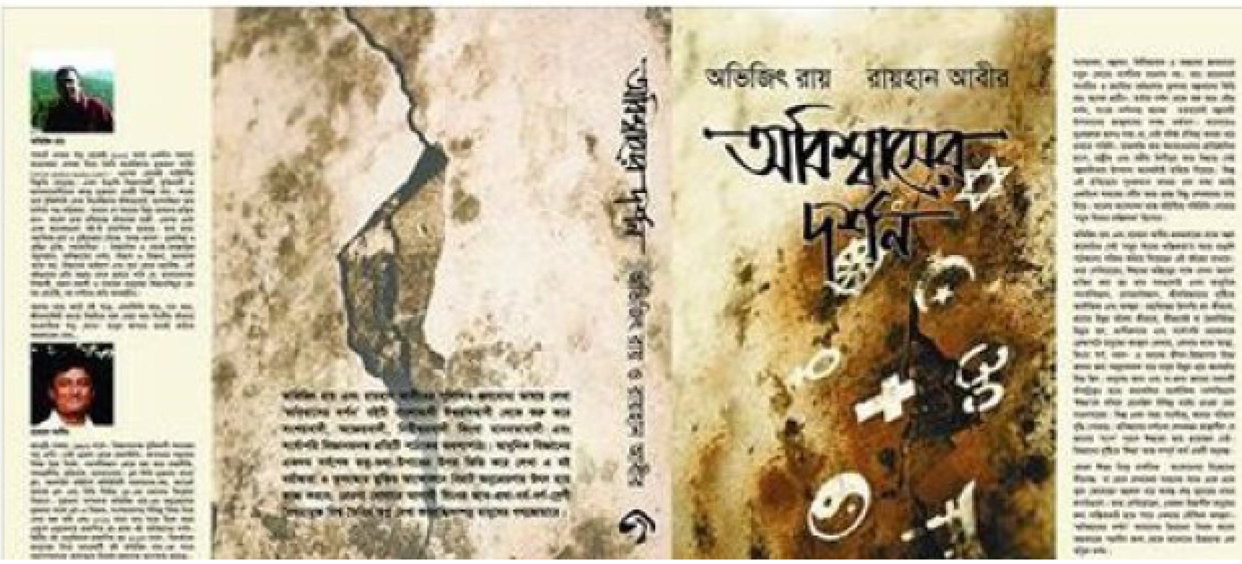
অনন্ত বিজয় দাশ। 'অবিশ্বাসের দর্শন' বইটি সম্পর্কে অনন্ত দা ফ্ল্যাপে লিখেছিলেন, 'আধুনিক বিজ্ঞানের সর্বশেষ তত্ত্ব-তথ্য-উপাত্তের উপর ভিত্তি করে লেখা অবিশ্বাসের দর্শন বইটি বাংলাভাষী ঈশ্বরবিশ্বাসী থেকে শুরু করে সংশয়বাদী, অজ্ঞেয়বাদী, নিরীশ্বরবাদী কিংবা মানবতাবাদী এবং সর্বোপরি বিজ্ঞানমনস্ক সবার মনের খোরাক জাগাবে। ধর্মান্ধতা এবং কুসংস্কার মুক্তির আন্দোলনের মাধ্যমে আগামী দিনের জাত-প্রথা-ধর্ম-বর্ণ-শ্রেনিবৈষম্যমুক্ত সমাজের স্বপ্ন দেখা মানুষের গণজোয়ারকে এই বই প্রেরণা জোগাবে'। এলাম আমরা কোথা থেকে, কোথায়ই বা যাচ্ছি আমরা , এই মহাবিশ্ব তৈরি বা চালানোর , এর শেষই বা কোথায় , এই অনন্ত মহাবিশ্বের চনা হল কীভাবে তিনি কি আমাদের প্রার্থনা শোনেন এ প্রশ্নগুলো শতাব্দী ,? পছনে কী আছেন কোনো অপার্থিব সত্ত্বা-প্রাচীন চিরচেনা প্রশ্ন। প্রশ্নগুলো নতুন নয়। নানা ধরণের উত্তর সমৃদ্ধ বইও বাংলা ভাষায় কম লেখা হয় নি। তবে এ ধরণের অধিকাংশ প্রচলিত বইয়ে যুক্তির চেয়ে স্থান পেয়েছে অন্ধবিশ্বাস, বিজ্ঞানের বদলে স্থান পেয়েছে কূপমুন্ডুকতা। অবিশ্বাসের দর্শন বইটিতে চিরায়ত গড্ডালিকা প্রবাহে গা না ভাসিয়ে আমরা বরং প্রশ্ন করেছি, পাঠকদেরও অনুরোধ করেছি 'ক্ষতবিক্ষত হতে প্রশ্নের পাথরে'। সেই সাথে নির্মোহভাবে উপস্থাপন করেছিলাম এই অন্তিম প্রশ্নগুলোর রহস্য উন্মোচনে বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক অর্জনগুলো। এই চিরচেনা প্রশ্নগুলোর উত্তর সন্ধানে বিজ্ঞানের অর্জন স্থান পাওয়ায় তা চুয়াডাঙ্গা থেকে সুদূর আইসল্যান্ড প্রবাসী বাংলাভাষী বহু বিজ্ঞানমনস্ক পাঠকের মনে আলোড়ন জাগিয়েছে। বইটি প্রকাশের পর থেকে অসংখ্য মানুষ ফোন, ইমেইল, ব্লগ, ফেসবুক, টুইটারে তাদের মতামত জানিয়েছেন। বিজ্ঞান, মুক্তচিন্তা, সংশয়বাদ এবং যুক্তিবাদ নিয়ে বাংলায় প্রকাশিত যে সমস্ত বই বাজারে আছে, তার মধ্যেও অগ্রগণ্য বই হিসেবে পাঠকেরা অবিশ্বাসের দর্শনকে স্থান দিয়েছেন। ২০১২ সালে বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তারপর দীর্ঘ বিরতি। ২০১৩ সালেই সব কপি শেষ হয়ে গেলো দ্বিতীয় সংস্করণের। ২০১৪ সালে অভিদার সাথে মিলে বইটি আবার ঠিকঠাক করে দেওয়া হলো জাগৃতিকে তৃতীয় প্রকাশের জন্য, ২০১৫ এর ফেব্রুয়ারি বইমেলায়। জানুয়ারিতে ছাপা হয়ে যাবার খবর পেয়ে অভিজিৎ দা লিখলেন-

নববর্ষের প্রথম দিনেই প্রকাশকের কাছ থেকে একটি আনন্দের সংবাদ পেলাম। অবিশ্বাসের দর্শন বইটির তৃতীয় সংস্করণ আসছে। ছাপা শেষ, প্রচ্ছদও হয়ে গেছে।

বিভিন্ন কারণেই ২০১৪ সালটি ছিল এক বিভীষিকাময় বছর। ২০১৫ সালের শুরুটা অন্ততঃ একটা আনন্দের বার্তা দিয়ে শুরু হল, এটাই বা কম কি!

"মুক্তি আসুক যুক্তির পথ ধরে! জীবন হোক বিশ্বাসের ভাইরাস মুক্ত"।

সবাইকে নববর্ষের শুভেচ্ছা।



৪

২০০৫ সালে ‘আলো হাতে আঁধারের যাত্রী’ আর ২০০৭ সালে ফরিদ আহমেদ'এর সাথে মিলে লেখা ‘মহাবিশ্বের প্রাণ ও বুদ্ধিমত্তার খোঁজে’ এই দুটো বই পড়ে প্রথম জানতে পেরেছিলামবিজ্ঞানের বদলে স্থান পেয়েছে অভিজিৎ রায় সম্পর্কে। ২০০৯ সালে অভিজিৎ দা ঢাকায় এসে ‘সমকামিতা’ বইটির জন্য বেশ কিছু সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন। পরের বছর শুদ্ধস্বর বইটি প্রকাশ করে। সচলায়তনের কল্যাণে টুটুল ভাইয়ের সাথে আমার আগেই পরিচয় ছিলো। অভিদাকেও পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম তার বইগুলো প্রকাশে টুটুল ভাইয়ের আগ্রহ দেখে। সমকামিতার পরে অবিশ্বা সের দর্শন, বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানের আলোকে লেখা অভিদার ‘ভালোবাসা কারে কয়’ ২০১২ সালে। সেবার অভিদা ঢাকায় এসেছিলেন লেখক হিসেবে প্রথম বারের মতো বইমেলা পালন করতে, একা। আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করি। অভি'দা যতদিন ছিলেন, প্রতিদিন দেখা হতো, কথা হতো, বইমেলায় ঘোরাঘুরি, আড্ডা, খাওয়াদাওয়া, রাতের বেলা কার্জন হলের পুকুর পাড়ে বিশ্রাম নেওয়া, বাইকে করে অভিদাকে বাসায় পৌঁছে দেওয়া। বইমেলার অভিজ্ঞতা নিয়ে অভিদা লিখেছিলেন-

’বইমেলার সাথে এই আত্মার সম্পর্কটায় ছেদ পড়ল আমি যখন সিঙ্গাপুর চলে গেলাম ১৯৯৮ সালের শেষ দিকে। এর পর সিঙ্গাপুরের পাঠ চুকিয়ে আমেরিকায়। বিদেশ বিভূঁইয়ে থাকাকালীন সময়ে বহুবারই আমার দেশে যাওয়া পড়েছে, কিন্তু কখনোই বইমেলার মাসটিতে নয়। ফেব্রুয়ারির সময়টাতেই কোত্থেকে যেন ঘাড়ের উপর এসে ভর করে যত রাজ্যের ঝুট ঝামেলা। অফিসে কাজ করলেও মন পড়ে থাকে বই মেলায়, সেই কাঙ্ক্ষিত বাংলা একাডেমীর বই মেলায়। দেখি সারা মাস জুড়ে পোলাপান কত মজা মারে, রায়হান আবীরের মত জনপ্রিয় লেখকেরা দাঁত কেলিয়ে অটোগ্রাফ বিলায়, লিটল ম্যাগ চত্বরে আড্ডা মারে, পোজ দিয়ে ছবি তুলে, সেগুলো আবার আপলোড করে ফেসবুক কিংবা ব্লগে। আর আমি উদাস নয়নে সেই ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকি।

এই বছর হঠাৎ করেই ঠিক করে ফেললাম মরি আর বাঁচি - মেলায় যাচ্ছি। গেলাম। প্রায় ২২ ঘণ্টার উড়াল যাত্রার ক্লান্তি নিয়ে দেশে নামলাম ফেব্রুয়ারির ১২ তারিখ। মহাখালী ফার্মগেটের জ্যাম ট্যাম টপকে বাসায় পৌঁছুতে পৌঁছুতে একেবারে দুপুর। আর বিকেলের মধ্যেই সব ক্লান্তি ফান্তি ভুলে বইমেলায়। তারপর থেকে প্রতিদিনই বহু মানুষের সাথেই দেখা হচ্ছে। অনেক মুক্তমনা বন্ধু যাদের কেবল ইন্টারনেটের মাধ্যমেই চিনতাম, তাদের সামনাসামনি দেখার সৌভাগ্য হল। এই সৌভাগ্যের ব্যাপারটা গত কয়েকদিন ধরেই হচ্ছে। রায়হানের এর এর সাথে তো আগে থেকেই চেনা-জানা-পরিচয়-দেখা হয়েছিলো, তাই তারে বেশি পুছি নাই । কিন্তু আমি না পুঁছলেও এই ছেলেটা আমারে তার বাইকে করে প্রতিদিন বাসায় পৌঁছিয়ে দেবার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছে। বিকেল পাঁচটা বাজলেই রায়হানের ফোন:

-’অভিদা, আপনে কই’?

-’আমি মেলায়’।

-’উক্কে আমি আসতেসি’। আবার যাওয়ার সময় হইলেও সেই একই ব্যাপার।

-’আপনে কই’?

-’আমি লিটল ম্যাগ চত্বরের সামনে’।

-’উক্কে আমি আসতেসি বাইক নিয়া। আপনে থাইকেন’।



২০১৫ এ বন্যাপাকে সাথে নিয়ে আসবেন বলে গিয়েছিলেন অভিদা। আসলেন তিনি। এবার বইমেলায় তার নতুন দুইটা বই, 'শূন্য থেকে মহাবিশ্ব' আর 'ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো' প্রকাশিত হলো। এরসাথে যুক্ত হলো, 'অবিশ্বাসের দর্শন' এর জাগৃতি সংস্করণ এবং 'বিশ্বাসের ভাইরাস'এর দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রয়াত গণিতবিদ মিজান রহমানের সাথে লেখা 'শূন্য থেকে মহাবিশ্ব' প্রকাশিত হয় শুদ্ধস্বর থেকে, ওকাম্পো প্রকাশ করে অবসর। শূন্য থেকে মহাবিশ্ব বইটার সম্পাদনায় জড়িত ছিলাম। বইয়ের সম্পর্কে মন্তব্য জানাতে বলেছিলেন অভি'দা। পাঠিয়েছিলাম তাকে। আরও কয়েকজনের মতামতের সাথে আমার মন্তব্যটাও বইয়ে যুক্ত করেছিলেন অভিদা- *মীজান রহমান এবং অভিজিৎ রায় লিখিত শূন্য থেকে মহাবিশ্ব' বইটি গণিতের শূন্যের মূর্ছনার ঘোড়ায় চড়িয়ে পাঠককে নিয়ে যাবে শূন্য থেকে মহাবিশ্ব সৃষ্টির সম্ভাবনা নিয়ে বর্তমানের কালের সেরা বিজ্ঞানীদের সাম্প্রতিকতম ধারনার এক বৈজ্ঞানিক সঙ্গীতানুষ্ঠানে। সৃষ্টির সূচনা' ধর্ম এবং বিজ্ঞান দুটি প্রতিষ্ঠানেরই আগ্রহের বিষয় যদিও দুটি প্রতিষ্ঠান থেকে পাওয়া উত্তর সম্পূর্ণ আলাদা। আধুনিক বিজ্ঞান থেকে পাওয়া ফলাফল থেকে আমরা আজ বুঝতে পারছি মহা পরাক্রমশালী কোন সত্তার হাতে মহাবিশ্ব সৃষ্টি' হয়নি। মহাবিশ্বের উদ্ভব' ঘটেছে শূন্য থেকে, সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক ভাবে। সভ্যতার এ পর্যায়ে এসে*

বিজ্ঞান তার সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে মহাবিশ্ব সৃষ্টির রহস্য উন্মোচনে। বাংলাভাষী বিজ্ঞান ও দর্শনে কৌতূহলী পাঠকের অবশ্যপাঠ্য তাই এই বইটি।

২০১৪ সালে জাগৃতি প্রকাশনী থেকে 'বিশ্বাসের ভাইরাস' বইটি প্রকাশিত হবার পর থেকেই মৌলবাদী অপশক্তিরা অভিজিৎ রায়কে রুটিন করে হত্যা করার হুমকি দিতে থাকে। প্রতিদিন একজন করে মানুষকে 'নাস্তিক' প্রমাণ শেষে তাকে হত্যা করার আহবান জানিয়ে ফারাবী নামক এক বিকৃত মস্তিষ্কের মানুষের মত দেখতে দু'পেয়ে ততদিনে বাংলাদেশের সামাজিক নেটওয়ার্কে পরিচিত মুখ। নিজেকে কখনও নিষিদ্ধ ঘোষিত 'হিজবুত তাহরির', কখনও 'শিবিরের' অনুসারী বলে প্রচার করা ফারাবীর ব্লগে আগমন ঘটেছিল মূলতঃ সহব্লগার মেয়েদের বিরক্ত করার উদ্দেশ্য নিয়ে। তার প্রথম পোস্টও ছিল অজানা অচেনা মেয়েদের 'বিয়ে করার অনুরোধ জানিয়ে'। বিভিন্ন ভুয়া আইডি খুলে ফেসবুক এবং ব্লগে মেয়েদের অশ্লীল, কুরুচিপূর্ণ প্রস্তাব দেওয়াই ছিল তার প্রধান কাজ। ফেসবুকে আপনারা যারা নিয়মিত, তারা খেয়াল করে দেখবেন, বাংলা ভাষায় ফেসবুকে যে সকল নারী বিদ্বেষী, অশ্লীল, যৌন সুড়সুড়ির পাতা রয়েছে তাদের মধ্যে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। এরা ইন্টারনেট থেকে নারীদের বিভিন্ন ছবি সংগ্রহ করে সেটা তাদের অনুসারীদের সামনে উপস্থাপন করে এবং একই সঙ্গে আরও একটা বিষয়ে তারা সমান কম্পাঙ্কে পোস্ট করে।

কী সেই বিষয়টা? ধর্ম। যেহেতু বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্ম ইসলাম, তাই এই অশ্লীল পাতাগুলোর কাছেও ধর্ম বলতে কেবল ইসলাম। ফারাবী যেন এই মানুষগুলোরই প্রতিনিধি। যার একমাত্র কাজ ছিল নারীদের উত্যক্ত করা এবং ইসলাম ধর্ম নিয়ে পোস্ট দেওয়া। মৌলবাদীদের চাপাতির আঘাতে নিজ বাসার সামনে খুন হওয়া আহমেদ রাজীব হায়দারের জানাজার ইমামকে হত্যা করার হুমকি দিয়ে গ্রেফতার হয় ফারাবী। জামিনে বের হয়ে আসার পর থেকে নিজেকে শোধরানো তো দূরের কথা, উল্টো ব্যাপক উদ্যমে সে ইসলাম ধর্মকে নিজের মতো ব্যাখ্যা করে সন্ত্রাস কায়েমের আহবান জানানো শুরু করে। সিলেট থেকে প্রকাশিত 'যুক্তি' পত্রিকার সম্পাদক, মান্নান রাহী নামক ফারামীর এক ঘনিষ্ঠ সহচরের হাতে সিলেটে বাসার সামনে নিহত অনন্ত বিজয় দাশ মুক্তমনায় তার 'ফারাবীর ফাতরামি' লেখায় এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন-

এরপর ফারাবী আবির্ভূত হয় ইসলামের খেদমতগার হিসেবে। হেফাজতকারী হিসেবে। আমাদের এখানে একটা কথা প্রচলিত আছে, এরশাদ যদি আমাদের গণতান্ত্রিক রাজনীতির রক্ষক হয় তবে এই রাজনীতিকে ধর্ষণ করার জন্য বাহির থেকে কোনো শত্রু আসার প্রয়োজন নেই, তেমন ফারাবীর মতো লুইচ্চা যদি হয়ে যায় ইসলামের খেদমতগার, তবে ইসলামের মুখে চুনকালি মাখাতে কোনো ইসলামবিরোধী, ইসলামবিদ্বেষীর প্রয়োজন নাই।

ইমামকে হত্যার হুমকির অভিযোগে ফারাবীকে আটক করা হলেও সে অস্থায়ী জামিনে জেলহাজত থেকে বের হয়ে আরও বেশি উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ফেসবুকের অসংখ্য ভুয়া আইডি নিয়ে। আল্লাহ ও রসুলকে- তার ভাষায়- যারা অপমান করে, তাদের হত্যা করা জায়েজ। এই ফতোয়া দিয়ে

সে একের পর এক শুভবুদ্ধির লেখক, ব্লগার, অনলাইন অ্যাকটিভিস্টদের হত্যার হুমকি প্রদান শুরু করে।

ফারাবীর ভাষ্যমতে-

ইসলাম অর্থ শান্তি নয়, ইসলাম অর্থ হল আত্মসমর্পণ। ইসলামের ভিতরে জিহাদ, ক্বিতাল সবই আছে। আল্লাহ-রসুলকে যারা ঠাণ্ডা মাথায় গালিগালাজ করবে আমরা তাদেরকে হত্যা করব এতে লুকোচুরির কিছু নাই।

২০১৪ সালে 'বিশ্বাসের ভাইরাস' বইটি প্রকাশিত হবার পর থেকেই মৌলবাদী অপশক্তিরা অভিজিৎ রায়কে রুটিন করে হত্যা করার হুমকি দিতে থাকে। উনি দেশের বাইরে থাকেন বিধায়, ফারাবী নামক বিকৃত মস্তিষ্কের অমানুষ তার বই বিক্রির দায়ে বাংলাদেশের অনলাইন বই কেনার সাইট 'রকমারি ডটকম'-এর অফিসের ঠিকানা প্রদান করে পোস্ট দেয়। বাংলাদেশে নাস্তিকতা ছড়ানোর অপরাধে সে তার অনুসারীদের রকমারির অফিস আক্রমণের আহ্বান জানায়। একই সঙ্গে স্বত্বাধিকারীর প্রোফাইল উল্লেখ করে তাকে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়।

এরপর বাংলাদেশের শুভবুদ্ধির সব মানুষকে অবাক করে দিয়ে রকমারির স্বত্বাধিকারী মাহমুদুল হাসান সোহাগ তার স্ট্যাটাসে অভিজিৎ রায়সহ অন্যান্য লেখকদের বিজ্ঞান ও মুক্তচিন্তার বই বিক্রি করার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করেন। কিন্তু তারপরও ফারাবী সন্তুষ্ট না হওয়ায় রকমারি ডটকম তার দেওয়া লিস্ট ধরে নিমেষেই সকল বই তাদের ওয়েবসাইট থেকে প্রত্যাহার করে বিক্রি বন্ধের ঘোষণা দেয়।

ব্যক্তিগত সম্পর্ক ধরে এই ঘটনার সময় থেকেই আমি রকমারি ডটকমের সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ করি , ফারাবীর ভয়ে ভীত হওয়ার বদলে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। আমাদের সবার অনুরোধ উপেক্ষা করে ওরা মৌলবাদী তোষণকেই তাদের নীতি হিসেবে গ্রহণ করে এবং বিজ্ঞান, যুক্তিবাদী এবং প্রগতিশীল'দের লেখা বইগুলোকে 'নাস্তিক'দের বই আখ্যায়িত করে সেগুলো বিক্রি চিরতরে বন্ধ করে দেয়।

অবশ্য বন্ধ করার আগে নিজেদের মেরুদণ্ডহীনতা ঢাকতে তারা জানিয়ে দেয়, ফারাবীর হুকমির আগে থেকেই তারা এ ধরনের বই সরিয়ে ফেলার উদ্যোগ নিয়েছিল এবং সে উদ্যোগের কারণেই এখন বইগুলো চিরতরে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। অপকর্মের হোতা ফারাবীর বিরুদ্ধে কোনো ধরনের আইনি ব্যবস্থা তারা গ্রহণ করেনি।

মৌলবাদীদের হত্যার পরোয়ানা সত্ত্বেও প্রিয় বাংলাদেশে এসেছিলেন অভিজিৎ রায়। এসেছিলেন অসুস্থ মা'কে দেখতে, অসুস্থ বাবাকে দেখতে, বইমেলা প্রকাশিত নতুন নতুন বইয়ের গন্ধ শুকতে, বাংলাদেশের বাতাসে নিঃশ্বাস নিতে। তিনি এসেছিলেন আমাদের অতিথি হয়ে। তিনি জানতেন না তার প্রিয় বাংলাদেশ কতখানি বদলে গেছে। ২৩ তারিখ রাতে অভি'দাকে মনে করিয়ে দিলাম, হুমকিগুলোকে হালকা ভাবে না দেখতে। উনি হেসে উড়িয়ে দিলেন। 'আমি লেখক মানুষ, আমাকে কেন মারবে'?

ফেব্রুয়ারির ছাব্বিশ তারিখ রাত আটটা তেইশ মিনিটে অভিদার কাছ থেকে শেষ এসএমএস'টা আসে আমার ফোনে। 'রায়হান, তুমি কই?'। আমি আর সামিয়া তখন বাসার বাইরে, বইমেলা থেকে অনেক দূরেপরের দিন অভি , াজার করছি ,'দা আর বন্যা'পা আমাদের বাসায় আসবেন! দেশে আসার পর থেকেই বন্যা'পা বলছিলেন, মুক্তমনা ব্লগের যারা দেশে আছে তাদেরকে কোথাও একত্র করতে, তিনি সবাইকে খাওয়াতে চান। আমরা তখন একটা নতুন বাসায় উঠেছি, পাঁচতলার দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলেই আধখানা ছাদ, আর আধখানা বাসা। ইচ্ছে ছিলো আমরা আট-দশজন মিলে সারাদিন আড্ডাবাজিতে কাটাবো, বন্যা'পার সাথে মিলে অভি'দাকে পঁচাবো, তারপর অভিদার সাথে মিলে বন্যা'পাকে, ক্ষুধা পেলে পেট সাটিয়ে অভি'দার প্রিয় বিরিয়ানি। ফেব্রুয়ারির চব্বিশ তারিখে আমি আর সামিয়া প্রথম জানতে পারি আমাদের মাতা-পিতা হবার সম্ভাবনার কথা। খবরটা শুনে আমি সামিয়াকে বুকে চেপে ধরে রেখেছিলাম অনেকক্ষণ এবং আমরা দুইজনেই একই সাথে ঠিক করি, বাবা-মা-ভাই-বোনদের পর পরবর্তী পরিবারের সদস্য হিসেবে জানাবো বন্যা'পা আর অভি'দাকে, ফেব্রুয়ারির সাতাশ তারিখে। পাঁচ মাস পেরিয়ে গেলেও ছাব্বিশ তারিখের পরের সেই দিনটা আমার জীবনে আর আসে নি। না ঘটা সেই দিনটা নিয়ে আমি আজও ভাবি, চোখের সামনে নানা ভাবে চিত্রায়িত হয় দিনটির প্রতিটি ক্ষণ।

দেশ ছাড়ার আগে আমার 'মানুষিকতা' বইটার রিভিউ করেছিলেন অভিজিৎ দা। বইটাতে আমি অভি'দার কাছ থেকে পড়া ইঙ্গারসলের সেই অমর প্রতিজ্ঞাটার অনুবাদ করেছিলাম। অভি 'দা খুব খুব পছন্দ করেছিলেন অনুবাদটা। আজকের এই লেখার শেষটাও সেই প্রতিজ্ঞা দিয়েই হোক।

যেদিন নিশ্চিতভাবে বুঝে গেলাম আমার চারপাশের সবকিছুই প্রাকৃতিক, সকল দেবতা, অপদেবতা কিংবা ঈশ্বর মানুষের সৃষ্ট পৌরাণিক চরিত্র ব্যতীত কিছুই নন, সেদিন সত্যিকারের স্বাধীনতার তীব্র আনন্দে মাতোয়ারা হয়েছিল আমার মন, শরীরের প্রতিটি কণা, রক্তবিন্দু, ইন্দ্রিয়। আমাকে সীমাবদ্ধ করে রাখা চার দেয়াল টুকরো টুকরো হয়ে মিশে গেল ধুলোয়, আলোর স্রোতে আলোকিত হয়ে গেল আমার অন্ধকূপের প্রতিটি কোণ। সেদিন থেকে আমি কারও চাকর, সেবক বা বান্দা নই। এই পৃথিবীতে আমার কোনো মনিব নেই, আমার কোনো মনিব নেই এই সীমাহীন মহাবিশ্বেও।

আমি স্বাধীন, মুক্ত - চিন্তা করতে, চিন্তারাজি প্রকাশে, আদর্শ নির্ধারণে, ভালোবাসার মানুষদের সঙ্গী করে নিজের মতো বাঁচতে।

আমি স্বাধীন আমার মানসিক এবং শারীরিক ক্ষমতা ব্যবহারে, প্রতিটি ইন্দ্রিয় দিয়ে কল্পনার ডানা মেলে উড়ে যেতে, নিজের মতো স্বপ্ন দেখতে, আশা করতে।

আমি স্বাধীন - নিজের মতো ভাবতে।

আমি স্বাধীন - নির্দয়, উগ্র ধর্মকে অস্বীকার করতে।

আমি স্বাধীন - অসভ্য, মূর্খের 'অলৌকিক' গ্রন্থসমূহ এবং এগুলোকে পুঁজি করে ঘটা অসংখ্য নিষ্ঠুরতাকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে।

আমি স্বাধীন অসংখ্য মহাজাগতিক মিথ্যা থেকে, স্বাধীন সীমাহীন শাস্তির ভীতি থেকে, আমি স্বাধীন ডানাওয়ালা ফেরেশতা থেকে, শয়তান থেকে, জ্বিন-ভূত এবং ঈশ্বর থেকে।

জীবনে প্রথমবারের মতো আমি স্বাধীন।

আমার চিন্তার রাজ্যে সেদিন থেকে নেই আর কোনো নিষিদ্ধ জায়গা, নেই কোনো অশরীরী শৃঙ্খল যা বেঁধে রাখে আমার অবয়বকে, আমাকে রক্তাক্ত করার জন্য নেই কোনো অলৌকিক চাবুক, আমার মাংসের জন্য নেই কোনো আগুন। আমার মাঝে নেই ভয়, আমার মাঝে নেই অন্যের দেখানো পথে হাঁটার দায়বদ্ধতা, আমার প্রয়োজন নেই কারও সামনে অবনত হওয়া, কাউকে পূজা করা, আমার প্রয়োজন নেই মিথ্যে কথা বলারও।

আমি মুক্ত।

ভয়-ভীতি, মেরুদণ্ডহীনটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সেদিন আমি প্রথমবারের মতো উঠে দাঁড়িয়েছিলাম , জগতকে নতুন করে দেখার, ভাবার চেতনা নিয়ে।

আমার অন্তর সেদিন কৃতজ্ঞতায় ভরে গিয়েছিল। আমি কৃতজ্ঞতা বোধ করেছিলাম ইতিহাসের সেই সব নায়কদের প্রতি, মানুষের প্রতি যারা নিজের জীবন বিপন্ন, বিসর্জন করেছিল মানুষের হাত এবং মস্তিষ্কের স্বাধীনতা যুদ্ধে। আমি ধন্যবাদ জানিয়েছিলাম পৃথিবীর আলোকিত সকল সন্তানদের , যাদের কেউ আত্মাহুতি দিয়েছিল মূর্খের সাথে যুদ্ধে, মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছিল অন্ধ প্রকোষ্ঠে আ-বদ্ধাবস্থায়, যাদের মাংস পুড়েছিল ধর্মান্ধদের আগুনে।

আলোকিত সেইসব সাহসী মানুষেরা, যারা এসেছিল পৃথিবীর আনাচে-কানাচে, যাদের চিন্তায়-কর্মে স্বাধীনতা পেয়েছে মানুষের সন্তানেরা। অতঃপর আমি নিচু হলাম, যে আলোর মশাল তারা

জ্বালিয়েছিলেন সে আলোর মশাল তুলে নিলাম নিজের হাতে, উঁচু করে তুলে ধরলাম সেটা, এ আলো নিশ্চয়ই একদিন জয় করবে সকল অন্ধকার।

না বাংলাদেশ ঈঙ্গারসল জন্ম নেন নি। ফারাবীতে পরিপূর্ণ এইদেশে আমরা পেয়েছিলাম অভিজিৎ রায়কে। তার আলোয় হয়েছিলাম আলোকিত, মুক্ত হয়েছিলাম চিন্তার দাসত্ব থেকে। অভিজিতের আলোকে গ্রাস করতে অন্ধকার হামলা করেছিলো পেছন থেকে। অভিজিতের সেই আলোর মশাল লক্ষ অভিজিতের তুলে ধরতে দেরি হয় নি। এক অভিজিতের থেকে বাংলাদেশে জন্ম নিচ্ছে লক্ষ অভিজিৎ।

জন্ম শুভ হয়ে থাক; অভিজিৎ রায়!



অভিজিৎ রায়কে ধারণ করার মত বাঙলাদেশ এখনও গড়ে তুলতে পারিনি

অনন্য আজাদ

বাংলাদেশে চাঁদকে যতটা ভালোবাসা হয় ততোটা সূর্যকে আপন করে নেয়া হয় না। বাঙলার মায়েরা বাচ্চাদের চাঁদের গল্প শোনায়, কিন্তু আলোকিত সূর্যের তাৎপর্য বর্ণনা করেন না। অভিজিৎ রায় ছিলেন বাঙলার সূর্য; বাঙলার আলোকিত মানুষ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পুত্র যদি আততায়ীদের দ্বারা নিহত হতেন তবে কী তিনি নিশ্চুপ থাকতেন? অথবা প্রধান বিরোধীদলীয় নেত্রীর পুত্রকে যদি হত্যা করা হত, তবেও কী তিনি নিশ্চুপ থাকতেন? প্রশ্ন জাগে মনে, স্বার্থপরতা কাকে বলে?

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী লেখক অভিজিৎ রায়ের মৃত্যুতে শোক প্রস্তাব করেন নি। এমনকি তিনি সামান্যটুকু সাড়াশব্দ করেন নি। সরকারের এক গৃহপালিত বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডটি ভিন্নখাতে নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। বামপন্থি ভদ্রলোকেরাও হিন্দু শব্দটি উচ্চারণ করে ভিন্নখাতে নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের একজন তুখোড় নাস্তিক অধ্যাপক লেখক অভিজিৎ রায় সম্বন্ধে বক্তব্য দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। সাংবাদিক তথা এক বিখ্যাত ব্লগার একটি আবেগপ্রবণ নোট লিখে তার দায়িত্ব শেষ করেন, এবং টেলিভিশনে বক্তব্য দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। যারা মৃত লেখকের সাথে শেষ ৩০ মিনিট উপস্থিত ছিলেন তারাও মুখ ফুটে কিছু বলতে চান নি। প্রধান বিরোধীদলীয় নেত্রী প্রধানমন্ত্রীর মত একফোঁটা সাড়াশব্দ করেন নি। ক্ষমতাশীল দলের কেউ দোষী অপরাধী খুনিদের গ্রেপ্তার করতে হবে বলে কোন বক্তব্যও শোনা যায় নি। সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের লৌহ মানবও নিষ্প্রাণ ছিলেন।

বাঙলাদেশের প্রধানমন্ত্রী অভিজিৎ রায়কে লেখক হিশেবে নেন নি, তিনি অবিশ্বাসী হিশেবে দেখেছেন। অভিজিৎ রায় শুধু বিশিষ্ট ব্যক্তির সন্তান বলেই হত্যাকাণ্ডের পর অভিজিৎ রায়ের পিতাকে ফোন করেছিলেন। সাধারণ কোন ব্লগার-লেখক বা অপরিচিত কোন অবিশ্বাসী মানুষকে হত্যা করা হলেও প্রধানমন্ত্রী ফোন করে খোঁজ নিতেন না। ২০১৩ সালে ইসলামী মৌলবাদী দ্বারা এক নাস্তিক ব্লগারের হত্যা পর দৌড়ে গিয়ে নিহত ব্লগারের বাসায় যাওয়া এবং শহিদ আখ্যা দেওয়ার দুঃস্মৃতি প্রধানমন্ত্রী এখনও ভুলতে পারেন নি। প্রধানমন্ত্রী বড্ড ভীত; অতীতে তিক্ত অভিজ্ঞতার খেসারত দিতে হয়েছিল রাজনীতিতে চরম মূল্যে। এরপর থেকেই তিনি মৌলবাদীদের সাথে আপোষ করতে শুরু করেন। নষ্ট রাজনীতির বেড়াজালে আঁটকে পড়ে বিসর্জন দিয়েছিলেন নীতি-নৈতিকতা। ভালোবাসা স্বরূপ মৌলবাদীদের দিতে থাকেন কোটি কোটি টাকা এবং শত শত বিঘা জমি। বর্তমানে আওয়ামী সরকার যতটা ধর্মনিপরেক্ষ, তার দ্বিগুণ মৌলবাদী। অভিজিৎ রায়ের মূল্যায়ন এই নষ্ট ভ্রষ্টরা করতে পারবে না। সূর্যকে ছুঁয়ে দেখা এত সহজ নয়।

অভিজিৎ রায় কে ছিলেন?
তিনি কি সন্ত্রাসী ছিলেন? বাঙলাদেশের কতটি থানায় তার নামে মামলা ছিল? তিনি কি কখনও ধর্ষণের আসামী ছিলেন? নাকি তার নামে বিস্ফোরণ মামলা ছিল? এসিড নিক্ষেপের দায়ে তাঁকে কি কখনও গ্রেপ্তার করা হয়েছিল? নাকি তিনি দরবেশ বাবার মত দুর্নীতি পরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন?
অভিজিৎ রায় তাহলে কী ছিলেন?

তিনি লেখক ছিলেন। বিজ্ঞানের লেখক ছিলেন। স্বাধীনচেতা ছিলেন। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি-দর্শনে তাঁর অবাধ বিচরণ ছিল। তিনি কী কখনও হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছিলেন? না, তিনি কলম দিয়ে লিখতেন। অস্ত্র-চাপাতি-বোমার বিপক্ষে লিখতেন। তিনি মানবতার কথা বলতেন। সমগ্র পৃথিবীর কথা বাদই দিলাম।শুধু বাঙলাদেশেই হাজার হাজার ধরণের চিন্তাধারার মানুষ আছে। সেক্ষেত্রে তিনিও একটু ব্যতিক্রম ছিলেন। প্রথাগত জীবনকে আগলে না ধরে তিনি বিজ্ঞানকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। মুক্ত করতে পেরেছিলেন নানা ধরণের সীমাবদ্ধতা। এটা কি একবিংশ শতাব্দীতে খুব বড় অপরাধ!

একজন সন্ত্রাসী-গডফাদারের মৃত্যুতেও বাঙলার প্রধান প্রধান মানুষেরা কিছু না কিছু বলে থাকেন কিন্তু একজন সৎ সাহসী লেখক অভিজিৎ রায়ের ক্ষেত্রে তারা নিশ্চুপ ছিলেন। তবে কি এ দেশে একজন লেখকের চেয়ে একজন সন্ত্রাসীর মূল্য অনেক? আজ যদি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পুত্র নিহত হতেন তাহলে কি কেউ গ্রেপ্তার হত না? কেউ কি বক্তব্য দিত না? অভিজিৎ রায় তাহলে এতটাই শক্তিশালী ছিলেন যে তাঁকে নিয়ে বক্তব্য দেয়ার মত মানুষ সমাজে নেই!

এ লজ্জা কোথায় রাখি! অভিজিৎ রায়ের উপর বর্বরোচিত হামলায় সারা বিশ্ব যেখানে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল, সেখানে যে দেশের মানুষের জন্য তিনি লড়াই করেছিলেন সেখানে তেমন কোন সাড়াশব্দ হয় নি। এখনও তাহলে বাঙলার মানুষেরা অন্ধত্বকে বরণ করে আছে! বাঙলাদেশে সবই আছে, শুধু লেখক নেই। বর্তমানে যারা লেখক আছেন তারা অধিকাংশই গৃহপালিত। আপোষের লেখনীতে তারা বাঙলাতে খুব জনপ্রিয়। কাজী নজরুল ইসলাম- হিন্দু না ওরা মুসলিম এই জিজ্ঞাসে কোন জন হে, কাণ্ডারি বল ডুবিছে মানুষ সন্তান মোর মা'র।

একবিংশ শতাব্দীতে বাস করেও যে দেশে আস্তিক নাস্তিকের উপর ভিত্তি করে মানুষকে ভালো খারাপ হিশেবে মূল্যায়ন করা হয়; সে দেশে আর যাই থাকুক না কেনো, সত্য নেই, বিজ্ঞান নেই, ভালো নেই, ভালোবাসা নেই, ভবিষ্যৎ নেই। সত্য বলতে হবে, যে কোন মূল্যে সত্য বলতে হবে। যে কারো বিপক্ষেই যাক না কেনো- সত্য বলতে হবে। যে আলোকিত অভিজিৎ রায় সত্য জানতে শিখিয়েছিলেন, সূর্য দেখতে শিখিয়েছিলেন, আমরা কীভাবে তাঁর আদর্শের সাথে বেঈমানি করতে পারি!
অনন্য আজাদ, ব্লগার ও লেখক
জার্মানি, চৌঠা সেপ্টেম্বর ২০১৫



আমার জীবনে অভিজিৎ রায় ও মুক্তমনা

নীলাঞ্জনা

অনেক দুর্বিসহ পরিবেশে জন্মেছিলাম মেয়ে হয়ে। নিষ্ঠুরতার মহাসাগরে হাবুডুবু খেতে খেতে বেঁচে ছিলাম শৈশব কৈশোর আর যৌবনে পদার্পণের সময় পর্যন্ত। মেয়ে ব'লে বাইরে যাওয়া যাবে না, খেলাধুলা করা যাবে না। শব্দ ক'রে হাঁটা যাবে না, হাসা যাবে না। সমস্ত কাজ করে যেতে হবে নীরবে। উচ্ছিষ্ট খেতে হবে যদি থাকে। খাঁচায় বন্দি থাকতে হবে। এসবের সাথে সাথে ধর্ম পালনের জন্যও নিয়মিত মারধোর করা হতো ভাল ভাবে। নামাজ পড়া, উপোস থাকা, অবোধ্য ভাষায় ধর্মগ্রন্থ পড়া - এসবে আমার ছোটবেলা থেকেই অনীহা ছিল। অন্ধবিশ্বাস আমার মগজে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল পৈত্রিক পাওনা হিসেবে। তবুও ধর্ম পালনে আমার আপাদমস্তক অনিচ্ছা ছিল আশ্চর্যজনকভাবে। নিয়মিত পাশবিক মার খেয়েও ধর্ম পালনের প্রতি প্রবল অনিচ্ছা আমার অটুট ছিল। আমি মার খেয়ে নামাজ পড়তে গিয়ে নামাজ পড়ার ভান করতাম। মাথার চুলগুলি ঢেকে রাখতে বললে আমার মাথায় আগুন লেগে যেতো, আমার আত্মসম্মানে ঘা লাগতো। কোরান পড়তে বসিয়ে দিলে আমি রাগে অপমানে কাঁদতাম। এত মার খেয়েও জীবনে আমি আরবি পড়তে শিখিনি কিন্তু। আর আমার সহোদর ভাইদের জীবন ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ এরকম নাকি ধর্মে আছে।

কালসাগরে ডুবতে ডুবতে আমি মুক্তির স্বপ্ন দেখতাম। সেই রকম পরিবেশ-পরিস্থিতিতে মুক্তির মাত্র একটা উপায় ছিল। সেটা হচ্ছে ওই পরিবেশের শোষকশ্রেণীর বিপরীত মানসিকতার কারুর সাথে বিয়ে। বহু কাঙ্ক্ষিত বিয়ে একদিন হয়েই গেল। দেখলাম, আমার স্থানান্তর হলো। কিন্তু অবস্থার কোনো উন্নতি হলো না। এবার নিষ্ঠুরতম মহা কালসাগরের তলায় আমাকে পদদলিত করে রাখা হলো। এবারের খাঁচাটা আরো অনেক শক্ত।

এক কালসাগর থেকে বদলি হয়ে যে আরেক কালসাগরে গেলাম সেখানকার অবস্থা এবং আমার পরিণতি আরো কালময়। এখন আমাকে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্তের জায়গায় ছয়-সাত ওয়াক্ত নামাজের ভান করতে হয়, বছরে একমাস উপোস থাকার পরেও বছরব্যাপী নফল উপোসের ভান করতে হয়। এখন শুধু মাথার চুল ঢাকা নয়, নিজের আপাদমস্তক বস্তায় ভরে বস্তার মুখ শক্ত করে বেঁধে বস্তাবন্দী বস্তু হয়ে দিবানিশি রোবটের মত গৃহকর্ম করতে বাধ্য করা হয়। কাজ শেষ হয়ে গেলে ধান-চাল মিশিয়ে বাছতে লাগিয়ে দেয়। ধান-চাল বাছা শেষ হলে বাছতে লাগিয়ে দেয়। সেটা বাছা শেষ হলে অন্য কিছু বাছতে লাগিয়ে দেয়, এটা সেটা মিশিয়ে দেয়। আমার মুক্তজীবনের আশার গুড়ে বালি। সেই বালি বেছে ফেলে দেবার আমার আর কোনো সাধ্য রইলো না। এবার স্বপ্ন দেখতেও সাহসে কুলোয় না। জোর করে দেখতে গেলে চোখে বালি কচকচ করে ওঠে।

দিনের পর দিন উপোসের ভান ও নামাজের ভান করতে করতে দক্ষ হয়ে গেছি। সমস্যা হয়ে যায় কোরান তিলাওয়াতের ভান করতে গিয়ে। চেহারায় খুব গুরুগম্ভীর ভাব এনে, গলায় কাঁদো-কাঁদো নাকি সুর এনে অবোধ্য কিছু আওয়াজ সৃষ্টি করতাম কোরান সামনে নিয়ে। নিজের এই নিপুণ ভান - পটুতায় নিজেই নিজের মনে ফিক ফিক করে হেসে উঠতাম। আবার ভয়ে বুকও কাঁপতো ধুক ধুক। ধরা পড়ে যাবার সমূহ সম্ভাবনা। ধরা পড়লে দ্বীনী স্টাইলে খবর আছে। তাই বুদ্ধি করে বাংলা উচ্চারণসহ একটা কোরান শরীফ কিনে ফেললাম। শুরু করে দিলাম নির্ভীক উচ্চকণ্ঠে তিলাওয়াত। কাউকে পাশ দিয়ে যেতে দেখলে গলার ভলিউম দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিয়ে তিলাওয়াত করতে থাকি - আল মুহছানা তু মিনান্নিছা য়ি ইল্লা মা মালাকাত আইমা নুকুম কিতা বাল্লা হি।

বাংলা উচ্চারণের নিচে বাংলা অনুবাদও আছে দেখতে পাই। অনুবাদ পড়ার কোনো ইচ্ছা ছিল না আমার। অবোধ্য ভাষায় কী লেখা আছে কোরানে তা কোনোদিন জানার ইচ্ছা জাগেনি। শুধু প্রাণ বাঁচানোর তাগিদেই পড়তাম। তবুও উচ্চারণ পড়ার সময় তার নিচের লাইনে চোখ চলে যেতো বারম্বার। দেখতাম, বাংলায় লেখা রয়েছে - বৌ পেটাও, চোরের হাতগুলি কেটে ফেলে দাও, মেয়েদেরকে ছেলেদের অর্ধেক সম্পদ দাও, দাসী সম্ভোগ করো, মানুষকে আগুনে পোড়ানো হবে, ফুটন্ত পানিতে সেদ্ধ করা হবে, লোহার মুগুর দিয়ে পেটানো হবে। এই রকম আরো কত কি! এসব পড়ে আমি ভয়ে শিউড়ে উঠতাম। আমার গা কাঁপতো, গায়ে কাঁটা দিতো। আমার মনে প্রশ্ন জাগতো - জন্মের পর থেকে ইসলাম শান্তির ধর্ম ব'লে জেনেছি, একমাত্র খাঁটি ধর্ম ব'লে জেনেছি। সেই ইসলামের মূল গ্রন্থে এত জঘন্য বর্বরতা কেন? একটা বই কীভাবে এত আজেবাজে কথায় ভরপুর হতে পারে? এসব প্রশ্ন মনে আসতো ব'লেও ভয়ে কাঁপতাম। মনে হতো, এরকম প্রশ্ন মনে আসলে কঠিন গুনাহ হবে। মনকে শাসাতাম প্রবলভাবে। বলতাম, প্রশ্ন করো না, মন। চোখকে শাসাতাম। বলতাম, অনুবাদের দিকে তাকিওনা, শুধু অবোধ্য উচ্চারণ পড়ে যাও, চোখ। মন, চোখ কেউই আমাকে পাত্তা দিত না। বেয়াড়া মন বেপরোয়াভাবে প্রশ্ন করতো - পৃথিবী সমতল নাকি? চাঁদের আলো আছে নাকি? সূর্য পঙ্কিল জলাশয়ে অস্ত যায় নাকি? নারীদের কেন এত অসম্মান এখানে? পুরুষদেরকে কেন বহুবিবাহ করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে? দাসীদের কেন সম্ভোক করতে বলা হয়েছে? অমুসলিমদের সাথে কেন বন্ধুত্ব করা যাবে না? চুরি করলে জেল জরিমানা হবে। হাত কেটে ফেলতে হবে কেন? চোখ আমার অবাধ্য হয়ে পড়েই যেতো, মানুষকে প্রেমের অপরাধে দোররা মারো, অমুসলিমদের হাত পা কেটে দাও, তাদের আঙুলের কড়ায় কড়ায় আঘাত করো, জোড়ায় জোড়ায় হত্যা করো ইত্যাদি।

আমি বুঝে গেলাম, এসব বানোয়াট, সব ভণ্ডামি। শুধু ইসলাম নয় পৃথিবীর সকল ধর্মই ভুয়া। মানুষকে বোকা বানিয়ে, ভয় দেখিয়ে সুবিধা ভোগ করার জন্য কপট চতুর লোকদের তৈরি এসকল। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কোনো ঈশ্বরের সৃষ্টি নয়। বরং ঈশ্বরেরাই মানুষের সৃষ্ট। জগৎ সৃষ্টির বৈজ্ঞানিক ব্যা খ্যা আছে। কোরানের অনুবাদ খতম দিয়ে আমি পাগলের মত হয়ে গেলাম। আমি অনুধাবন করলাম, কোরান অধিকাংশ মানুষই নিজের ভাষায় পড়ে না। তাই জানে না এখানে কী লেখা আছে। আমি

তীব্রভাবে কর্তব্য অনুভব করলাম, কোরানে কী লেখা আছে তা সকলকে জানিয়ে দেবার। আমি অন্ধবিশ্বাস থেকে মুক্ত হয়ে গেছি, অন্যরা সেখানে ডুবে মরবে কেন। শুধু নিজে মুক্ত হলে ত হবে না। সবাইকে মুক্ত করতে হবে। সত্য জানাতে হবে সবাইকে। তাই সবার কাছে কোরানের অনুবাদ তিলাওয়াত করতে শুরু করলাম। কারুর সাথে দেখা হলে তিলাওয়াত করতে শুরু করি। নতুন কারুর সাথে পরিচয় হলে তিলাওয়াত করে শোনাই। আমি কোরানের একটা বাংলা রেকর্ডারে পরিণত হই। কারুর সাথে কথা শুরু হলেই রেকর্ড চালু করে দিই। সবাই বিরক্ত হয় আমার কথায়। রেগে যায়। আমার কথা কেউ শোনে না, বিশ্বাস করে না। কেউ বইটির অনুবাদ পড়ে না দেখেই বলে, আমি মিথ্যা বলছি। ঘরে ও বাইরে সবাই একবাক্যে ব'লে দেয়, আমার সাথে সম্পর্ক রাখা হারাম। আমি খুব একা হয়ে যাই। হতাশ হই, নিরাশ হই। তবুও সবাইকে ভয়ানক নর্দমা থেকে মুক্ত করার বিবেকী তাড়না অনুভব করি। ছোটভাইকেও ফোন করে করে তিলাওয়াত শোনাতে থাকি। সেও বিরক্ত হয়। তবুও আমি কোরানে হাফিজের মতো তিলাওয়াত করে চলি। একদিন সে আমাকে বলে, মুক্তমনা নামে একটা সাইট আছে। তুমি মুক্তমনা পড়ো।

আমি মুক্তমনা পড়তে শুরু করলাম। আহা, এ আমি কীসের সন্ধান পেলাম! দিনরাত পড়ি। নাওয়া-খাওয়া ভুলে পড়ি। ডুবে থাকি। আমি এক বিশাল লাইব্রেরির সন্ধান পেলাম। এখানে আছে বিজ্ঞানের প্রান্তিক সব খবর, আছে যুক্তি , আছে মানবতার কথা , আছে সকল মানু ষর সমান অধিকারের কথা , ! আছে কবিতা। আরো কত কি , আছে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের কথা , আছে ইতিহাস , আছে সাহিত্য মুগ্ধ হই। নিজেকে আর একা লাগে না আমার। আমার মত , আমি পড়ে পড়ে বিভোর হই অন্ধবিশ্বাসমুক্ত মানুষ অনেক আছে আরো। যারা সমাজ পরিবর্তন ক রতে চায়, মানুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চায়, সকল মানুষকে বিজ্ঞানমনস্ক যুক্তিবাদী করে তুলতে চায়, একটি মানবিক সুন্দর সমাজ গড়ে তোলার জন্য যারা আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যায় নিঃস্বার্থে। আমি এদেরই একজন হয়ে গেলাম মনে মনে।

আমি বিজ্ঞানের ছাত্রী নই। বিজ্ঞানের সাধারণ ব্যাপারগুলিও জানতাম না। মুক্তমনায় এসে আমি অভিজিৎ রায়ের লেখাগুলি মন্ত্রমুগ্ধের মত পড়তে থাকলাম। আহা, কী অপরূপ তাঁর লেখার ভাষা! কী আশ্চর্য সুন্দর তাঁর লেখনীর স্টাইল! তাঁর একেকটা লেখা তথ্যে উপাত্তে ভাষায় প্রকাশে সৌন্দর্যে এমন পরিপূর্ণ! এ যেন লেখা নয়, যেন অদ্ভুত সুন্দর কোনো শিল্প। অভিজিৎ রায় হয়ে উঠলেন আমার অভি'দা, আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধার ব্যক্তি, আমার হিরো। তিনি এমন একটি জায়গা তৈরি করেছেন যেখানে মানুষ এসে বিজ্ঞান জানতে পারে, ধর্মগুলির ভণ্ডামি জানতে পারে, অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে পারে। মানুষ এসে কথা বলতে পারে। বিজ্ঞানের কথা, মানবতার কথা, ধর্মনিরপেক্ষতার কথা, সাহিত্যের কথা, শিল্পের কথা।

আমি কোরান পড়ে অন্ধবিশ্বাসমুক্ত হবার পরেও কাউকে সরাসরি বলতাম না, আমি নাস্তিক। কোরানের আয়াতগুলি বলে যেতাম। ওরা জিজ্ঞেস করতো, আপনি এভাবে ধর্মের সমালোচনা করেন! আপনি নামাজ পড়ে ন না? আমি কাঁচুমাচু করে বলতাম, মাঝে মাঝে পড়ি আরকি। সব সময় পড়ি না। তো আপনি রোজা রাখেন না? আমি বলতাম, রাখি, তবে সবগুলি রাখি না। মিথ্যা বলতাম মানুষকে। আমি যে পুরোপুরি অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসেছি তা বলতে সংকোচ বোধ করতাম, লজ্জা বোধ করতাম, সমাজ সংসারকে ভয় পেতাম। একসময় মানুষের লাথি খেয়ে জড় পদার্থের মতো পড়ে থাকতাম। টুঁ-শব্দও করতাম না। ততদিনে আমরা আলাদা বাসা নিয়েছিলাম। তাই নিজেকে আর হ্যালোইন কস্টিউম (বোরকা) বা বস্তায় পুরে রাখা থেকে একটু মুক্তি পেয়েছিলাম। তবুও মাথার চুল ঢেকে রাখার বাধ্য-বাধকতা ছিল। মুক্তমনা পড়ে পড়ে, এখানকার বিতর্কগুলি পড়ে পড়ে আমি কথা বলতে শিখি। আমার সাথে কেউ অন্যায় করলে জবাব দিই। প্রতিবাদ করি। আমার চুলগুলিকে আমি বন্দিত্ব থেকে মুক্ত করে দিই। আমি বস্তা থেকে বেরিয়ে আসি। এবার আমি নিজের থেকেই সবাইকে বলি, আমি নাস্তিক। আমি কোনো উপাসনা করি না কোনো বানোয়াট কিছুর কাছে। প্রার্থনা মানে সময় নষ্ট। আমি আর সংকোচ বোধ করি না, লজ্জা করি না, ভয় করি না নিজেকে অন্ধবিশ্বাসমুক্ত বলতে। আমি এখন বলতে পারি, নাস্তিকতা কোনো অপরাধ নয়, লজ্জা পাবার বিষয় নয়। ধর্মগুলিই বরং খারাপির বিশাল বিশাল গুদাম। আমি কোদালকে কোদাল বলতে আর দ্বিধা করি না। আমি নিজের অধিকার সচেতন হই। আমি বুঝতে শিখি, আমার স্বাধীনতা আমার নিজের কাছে। আমার পোষাকের স্বাধীনতা, আমার খাওয়ার স্বাধীনতা, আমার পড়ার স্বাধীনতা ইত্যাদি আর কারুর কাছে জিম্মি নয়। আমি আর নিজেকে বস্তাবন্দী বস্ত নয়, একজন মানুষ ভাবতে শিখি। এসবই মুক্তমনার অবদান।

এবার আমি শুধু নীরব-পাঠক হয়ে থাকতে চাইলাম না। মুক্তমনায় মন্তব্য করার, লিখার আমার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগলো। আমি এই মানুষগুলির সাথে মত বিনিময় করতে চাই। নিজের কথা লিখতে চাই এখানে। কিন্তু কিভাবে তা জানি না। আমি বাংলা টাইপ করতে জানতাম না। কম্পিউটারের ব্যবহার কিছুই জানতাম না। ভাইকে জিজ্ঞেস করলাম, কীভাবে বাংলা লিখতে হয়। সে বললো, অভ্র ডাউনলোড করো। তারপর টাইপিং শেখো। আমি মনপ্রাণ দিয়ে টাইপিং শিখে ফেললাম শুধুই মুক্তমনায় লেখার জন্য। আবার ভাবলাম, আমি তো লিখতেই জানি না। আমি কিছু মন্তব্য করলে, কিছু লিখে পাঠালে কি মুক্তমনায় তা ছাপানো হবে। একদিন সাহস করে একটা মন্তব্য করেই ফেললাম। কিছুক্ষণ পর পর মুক্তমনায় ঢুকে দেখছি মন্তব্যটি ছাপানো হয়েছে কিনা। না, দেখছি না। এক সময় দেখলাম, আমার মন্তব্যটি ছাপানো হয়েছে। আমার প্রিয় মুক্তমনায় আমার মত সামান্য একজন মানুষের সামান্য একটি মন্তব্য ছাপানো হয়েছে- এই আনন্দে আমি আত্মহারা হয়ে গেলাম। এবার প্রায় সব লেখায় আমি আমার মতামত জানাতে লাগলাম। কয়েকদিন পরে মডারেশনের পক্ষ থেকে আমাকে ইমেইল চেক করতে বলা হলো। কারণ আমাকে সদস্যপদ দেওয়া হয়েছে। আমার আনন্দ আর ধরে না। দুরু দুরু বক্ষে একটা লেখা লিখে পাঠিয়ে দিলাম। লেখা ছাপা হয়ে গেল। সেই প্রথমদিন থেকে মুক্তমনা আমার কতটুকু আপন তা বলে বোঝাতে পারবো না। অভি 'দা ও তাঁর তৈরি

মুক্তমনার কাছে আমার এক জীবনের চেয়ে বেশি ঋণ। কোরানের অনুবাদ পড়ে অন্ধবিশ্বাসমুক্ত নাস্তিক হওয়ার পরে মুক্তমনায় এসে আমি বদ্ধ উন্মাদ হওয়া থেকে বেঁচেছি। সমমনা অন্ধকারমুক্ত মানুষদের সাথে মত বিনিময় করার সুযোগ পেয়েছি। বিজ্ঞান দর্শন সাহিত্য ইতিহাস ইত্যাদি সম্পর্কে জেনেছি অনেক অনেক কিছু। সমকামিতা ও সমকামীদের প্রতি ছিল আমার ঘৃণা; যা আমার মধ্যে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ থেকে সংক্রমিত হয়েছিল। অভিদার লেখা সমকামিতা বইটি পড়ে সেই ভ্রান্ত মনোভাব কেটে গেছে। বইটি পড়ে আমি জেনেছি, সমকামিতা কোনো অপরাধ নয়, যেমন কোনো অপরাধ নয় বিষমকামিতা। জেনেছি এর বৈজ্ঞানিক ব্যাপারগুলিও। জীবনে আমি কিছুই হতে পারিনি। আমি অন্ধবিশ্বাসমুক্ত হয়েছি এবং আমি মুক্তমনার একজন লেখক- এটা আমার জীবনের সকল ব্যর্থতাকে ভুলিয়ে দেয়।

জাতি ধর্ম বর্ণ লিঙ্গ নির্বিশেষে পৃথিবীর যেকোথাও যেকোনো মানুষের উপর কোনো অন্যায় হলে অভি'দা সে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লেখেন, অত্যাচারিতের পাশে দাঁড়ান তাঁর লেখার মাধ্যমে। তাঁর লেখাগুলি পড়ে বরাবরই মনে হয়, একজন মানুষ এত পড়াশোনা করে কীভাবে। অনেক পড়াশোনা অনেকেই করে। কিন্তু জ্ঞান আহরণ করে তা সন্নিবেশিত করে এমন শিল্পের মত করে লিখতে পারে ক'জন? জ্ঞান আহরণে এমন সুতীব্র পিপাসা এবং তা মানুষকে জানানোর এমন অসম্ভব ক্ষ্যাপামি আর কারো মধ্যে আছে কিনা জানি না।

অভি'দাকে মেসেজ দিয়ে দিয়ে বলতাম, দাদা, এই বিষয়ে একটু লিখুন, ওই বিষয়ে একটু লিখুন। আমার অনুরোধে লিখেছিলেনও। সে লেখা দেখে আমার সেকি আনন্দ! আমার অনুরোধে অভি'দা লিখেছেন। কতজনকে যে আমি সেই লেখা পড়িয়েছি। আনন্দে ফেটে পড়ে গর্ব করে বলেছি, দ্যাখো, আমার কথাতে দাদা এই লেখাটা লিখেছেন। লিখেছিলেনও ফাটাফাটি যথারীতি।

আজ বাংলা ভাষায় অনলাইলে অনেকেই লিখছেন ধর্মের বিরুদ্ধে। অনলাইনে বাংলায় নাস্তিক্যবাদের অন্যতম সংগঠক হচ্ছেন অভি'দা। আলো হাতে তিনিই প্রথম নেমেছিলেন বিষম আঁধারের পথে মানুষকে আলো দেখাতে, অন্ধকার হতে উদ্ধার করতে। যেন-তেন আলো তো নয়, নেমেছিলেন তিনি নক্ষত্র হাতে নিয়ে। তিনি জানতেন, এই পথ মসৃণ নয়, স্বাপদসংকুল। তিনি জানতেন, এ পথে হায়েনারা ওঁৎ পেতে থাকে নররক্তের লোভে। তিনি লিখেছিলেন, বিনা রক্তে বিজয় অর্জিত হয় না। নিজের রক্ত দিয়ে, এই ক্ষণজন্মা জীবন ইসলামিস্টদের হাতে বলি হতে দিয়ে কি নিজের কথার প্রমাণ দিয়ে গেলেন, অভি'দা?

অভি'দা বিজ্ঞানের কথা লিখেছেন, যুক্তির কথা লিখেছেন, লিখেছেন মানবতার কথা, মানবাধিকারের কথা, লিখেছেন মুক্তিযুদ্ধের কথা, লিখেছেন যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কথা, লিখেছেন যেকোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে। মুক্তমনা নামের একটা অসাধারণ সাইট তৈরি করেছেন যেখানে এসে মানুষ এসব বিষয়ে কথা বলতে পারে, আলোচনা করতে পারে, বিতর্ক করতে পারে। অনেক অপরাধ যেন করে

ফেলেছিলেন অভি'দা। আর এই অপরাধেই তাঁকে খুন হতে হয়েছে তাঁর প্রিয় জন্মভূমির মাটিতে, তাঁর প্রিয় বইমেলার ফুটপাতে। যে জায়গায় তিনি বেড়ে উঠেছিলেন, তাঁর সে অত্যন্ত আপন, চিরচেনা জায়গায় হাজার লোকের ভীড়ে, অনেকগুলি সিসিটিভির সামনে, পুলিশের উপস্থিতির অদূরে ইসলামিস্টরা তাঁকে নির্বিঘ্নে কুপিয়ে কুপিয়ে খুন করে চলে গেছে। একবার ভাবুন, বাংলাদেশের মাটিতে ইসলামিস্ট খুনিরা কতটুকু স্বাধীন, কতটুকু নির্ভীক। নীলকে খুন করেছে ওরা তার বাসায় গিয়ে দিনে দুপুরে। পাঁচতলা বিল্ডিঙের একটি ফ্ল্যাটে থাকতো নীল। সেখা নে গিয়ে দিনে দুপুরে দাপটের সাথে কুপিয়ে কুপিয়ে খুন করেছে ওকে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে একটা চকোলেট খাওয়া যেমন কোনো ব্যাপার না, কোনো অপরাধ না, বাংলাদেশে লেখক খুনও তেমনি কোনো ব্যাপারই না। পাকিস্তানি হায়েনারা যেমন তালিকা করে বাংলার বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছিল এখনকার ইসলামিস্টরাও তাই করছে। জাতির আলোকিত শ্রেষ্ঠ সন্তানদের হত্যা করেছে ওরা। সরকার কেন এসব হত্যাকাণ্ডের বিচার করছে না? এটা কি কোনো দেশ, নাকি কশাইখানা? এটা কি কোনো দেশ নাকি মানবতার বধ্যভূমি?

অভিদার রক্তমাখা মগজ পড়ে আছে ফুটপাতে অর্থহীন ভাবে, তাঁর কোপানো নিথর দেহ অসহায়ভাবে উপুড় হয়ে পড়ে আছে ফুটপাতে তাঁরই তাজারক্তের স্রোতের উপর। বন্যাদির মাথায়ও লেগাছে কয়েকটি কোপ। একটা আঙ্গুল হারিয়েছেন তিনি। কোপ খাওয়া শরীরে, একটা আঙ্গুল হারিয়ে, নিজের এবং তাঁর প্রেমিক, জীবনসঙ্গী ও শ্রেষ্ঠবন্ধুর রক্তের স্রোতের ওপর দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে সবার কাছে সাহায্য চেয়ে যাচ্ছেন, কেউ এগিয়ে আসুন, অভি'কে বাঁচান।
চারিদিকে এতগুলি সিসিটিভির একটিতেও অভি'দাকে কুপিয়ে কুপিয়ে হত্যা করার দৃশ্য ভিডিও হয়নি - এই অবান্তর কথা কি আমরা বিশ্বাস করি? ভিডিও থাকলেই বা কি? খুনিদের সবাই খুন করতে দেখলেই বা কি হতো? এই সকল খুনিদের বিচার করবে কে? যে সরকার বিজ্ঞানমনস্ক মানবতাবাদী নাস্তিক লেখকদের হত্যার জন্য প্রকাশ্যে খুনিদের প্রত্যক্ষ উৎসাহ উদ্দীপনা দিয়ে যাচ্ছে, ইসলামিস্টদের বানানো লিস্ট অনুযায়ী নাস্তিক লেখক ধরে ধরে জেলে পুরছে, ব্লাসফেমী আইন পাস করছে, মদিনা সনদ মোতাবেক দেশ চালাচ্ছে সেই সরকার কি করবে হুমায়ূন আজাদ, থাবা বাবা, অভিজিৎ রায়, ওয়াশিকুর বাবু, অনন্ত বিজয় ও নিলয় নীলের খুনিদের বিচার?

তবুও আমরা বিচার চেয়ে যাবো। আমরা আমাদের কলমের লড়াই চালিয়ে যাবো। আমরা কলম ছাড়ব না, কীবোর্ড ছাড়ব না। সরকারকে বাধ্য করে ছাড়বো এই সকল নিরপরাধ মানুষের হত্যা র বিচার করতে।

অভিজিৎ-চেতনার মৃত্যু নেই। অভিজিৎ'দার লেখাগুলির মৃত্যু নেই। নক্ষত্রের মতো জ্বলজ্বল করে জ্বলবে তাঁর লেখাগুলি অনন্তকাল। এক অভিজিৎ থেকে অগণিত অভিজিৎ সৃষ্ট হয়েছে, হচ্ছে, হতে থাকবে।



অভিদা'র জন্মদিন

হিল্লোল দত্ত

আজ মনে পড়ছে বড্ড অভিদার কথা, অভিজিৎ রায় নামের এক ম্যান উইদ দ্যা মিশনের কথা, এক সহাস্য, সদাতরুণ, সদালড়ুয়ে অথচ সজ্জনের কথা।

খুব ইচ্ছে করছি বলি, অভিদা, আপনাকে জড়িয়ে, আপনার হাত দুটো জড়িয়ে একটু বসে থাকি। অভিমানভেজা গলায় বলতে থাকি, দেখুন অভিদা, আজ সারাদেশের, সারা দুনিয়ার অবস্থা দেখুন। সাগরে ভাসছে রোহিঙ্গা অনিকেত, বাঙালি নিম্নবিত্ত; মরুতে, পরবাসে উদ্বাস্তু শিবিরে দুর্বিষহ জীবনযাপন করছে সিরীয় শরণার্থীরা; কচি বয়েসে অকথ্য যৌন নির্যাতন ও ক্রীতদাসীর বাজারে উঠছে ইয়াজিদি বালিকারা; পালাতে গিয়ে প্রাণ দিচ্ছে কুর্দি শিশুরা; নিজের রক্তে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকছে বাঙালি ব্লগারেরা; দেশের স্বৈরাচার হম্বিতম্বি করছে দ্বিদলীয় শাসনের মুখের উপর গণতন্ত্রের দাবিতে; অর্থনৈতিক সুবিধে বাড়ার সাথে সাথে তেজি হচ্ছে মৌলবাদের হুঙ্কার; নামকাবাস্তে প্রগতিশীল সরকার ক্ষমতায় থেকে স্বেচ্ছান্ধ হয়ে ধর্মান্ধদের সুবিধে করে দিচ্ছে 'পাছে ভোট নষ্ট হয়'; শিশুনারীনির্যাতন, হত্যা ও ধর্ষণ প্রতিদিনকার পত্রিকার অবহেলিত খবরে রূপ নিয়েছে; ধর্মীয়-জাতিগত-চেতনাগত সংখ্যালঘুদের ওপর নিরন্তর নীরব নিষ্পেষণ অন্তহীন; দাঁত বের করে হাত কচলাচ্ছে হেজাবি জোট (হেফাজত-জামাত-বিএনপি) কারণ লীগসরকারের প্রতিটি অমানবিক সিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্তহীনতা তাদের ক্ষমতায়নের পথ আরো কয়েক গজ প্রশস্ত করছে...

এই অশ্লেষার রাক্ষসী বেলায় আপনার তীব্র অভিঘাতময় লেখনির, সুচিন্তিত সাদামাটা বিবেকবান কথাবন্ধের, কিবোর্ডের আন্দোলনে নেতৃত্বের অভাবটা বড্ড বেশি করে অনুভব করি বারংবার।

মনে পড়ে, শুধু মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের মতো আশাবাদী, আনন্দময়, জীবনবাদী মানুষের চরম হতাশ পংক্তিগুলো:

শতাব্দীর সূর্য আজি রক্তমেঘ-মাঝে
অস্ত গেল, হিংসার উৎসবে আজি বাজে
অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উন্মাদ রাগিনী
ভয়ংকরী। দয়াহীন সভ্যতানাগিনী
তুলেছে কুটিল ফণা চক্ষের নিমেষে
গুপ্ত বিষদন্ত তার ভরি তীব্র বিষে।
স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত, লোভে লোভে
ঘটেছে সংগ্রাম-প্রলয়মন্থনক্ষোভে

ভদ্রবেশী বর্বরতা উঠিয়াছে জাগি
পঙ্কশয্যা হতে। লজ্জা শরম তেয়াগি
জাতিপ্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অন্যায়
ধর্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়।
কবিদল চিৎকারিছে জাগাইয়া ভীতি
শ্মশানকুক্কুরদের কাড়াকাড়ি-গীতি।

ভোগবাদ আর মৌলবাদের অন্তহীন বেসামাল বাড়াবাড়ির ভেতরে জমা হচ্ছে যত অমানবিক, কুটিলতম, জঘন্যতম, নারকীয় অন্যায়। মানুষের চোখের একের পর এক প্রতিকারহীন অন্যায় হয়ে পড়ছে স্বাভাবিকতম ঘটনা, অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে মানুষ এসবে, কখনো নিজেই পড়ছে জড়িয়ে। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর এক লেখায় কিছুটা এরকম একটা কথা বলেছিলেন যে, মানুষ যখন পশু হয় তখন নিজের মুখোশে পশুত্বটা ঢেকে ফেলে বলে সে আরো ভয়ঙ্কর হয়, কারণ চেনার পথ থাকে না। তেমন অজস্র পশুতে ছেয়ে গেছে চারপাশ, কারণ বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদছে।

আপনার জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানানোর কোনো সুযোগ পেলাম না অভিদা, মনের ভেতর অদম্য ব্যথা, অক্ষম ক্ষোভের বরফগলা নদী হয়তো আমায় নিজেকেই ভাসিয়ে নিয়ে যাবে যদি অর্গল খুলে দেই।

তারচে বরং ভাবি, সেই কিশোরটির যে আপনার প্রথম বইয়ের প্রথম দিকের পাঠকদের একজন ছিলো, এবং পড়ে সে বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে বিজ্ঞানের সৌন্দর্য ও সৌগন্ধে সচকিত হয়ে পড়েছিলো, যোগাযোগও করতে চেয়েছিলো হয়তো আপনার সাথে। তারপর ব্লগ নামের যৌবনমুখর, কলরবমুখর, চিন্তাতর্কলেখনমুখর ক্ষেত্রটিতে আপনার সাথে পরিচয়ের পর আপনারাই আমন্ত্রণে মুক্তমনায় লিখতে আসার সেই আনন্দময় মুহূর্তটির কথা, সেই সম্মানের কথা সে ভোলে নি এখনো। ভোলেনি মুক্তমনায় তার ব্লগজীবনে প্রদত্ত সেরা সম্মানটির কথা। ভোলে নি ২০১২-এর বইমেলায় আপনার সাথে সশরীরে দেখা হওয়ার উজ্জ্বলতম মুহূর্তটির কথা। সেসময় সে মুক্তমনা নিয়ে যেসব হাবিজাবি উচ্চাশার কথা, স্বপ্নের কথা বলছিলো আপনার সামনে এবং আপনি নীরবে শুনছিলেন, সম্মতও হচ্ছিলেন, সেটা যে তার জন্যে কতবড় ড্রিম কামস ট্রুয়ের মতো ছিলো, সেটা আপনি জেনেও যেতে পারলেন না! জানতে পারলেন না ২০১৫-এর বইমেলায় আপনার ও বন্যাদির তার সাথে দেখা, আড্ডাবাজি আরো কজন পরিচিত লেখক ও ব্লগার মিলে এবং পরদিন সকালে বাইরে তিনজনের একত্রে ঘন্টাভর গালগল্প, খাওয়াদাওয়া এবং কতো যে চিন্তাস্বপ্নপরিকল্পনা!

হায়, অধরা রয়ে গেলো যে অভিদা এখনো কতো কাজ, কতো ভাবনা, কতো কল্পনা!
আর তারপর সেই কৃষ্ণ ২৬শে!

না, অভিদা। আমি, আপনার ভাষায় বা অতিশয়োক্তিতে আপনার ‘প্রিয় মানুষ, প্রিয় লেখক’ আর লিখতে পারি না কিছুই। ভেবে, গুছিয়ে, চিন্তা করে কিছু পরিবেশন করতে পারি না। আপনি চলে-যাওয়ার সময় আমার আঙুলগুলো এভাবে চাপাতির সাথে কেটে নিয়ে গেলেন! বন্যাদিকে আঘাত

থেকে একটুও তো বাঁচাতে পারলাম না অভিদা! আপনি ছাড়া আপনার জন্মদিন বন্যাদিকে কতোটা আহত করবে, ভাবার শক্তিটাই যে নেই এখন!

ফেব্রুয়ারি মাসটাই বুঝি রক্তাক্ত হয়ে গেলো। আর কখনো বইমেলায় যেতে পারবো কিনা জানি না অভিদা, সেই পথ আপনার রক্তে পিচ্ছিল হয়ে হায়েনার অট্টহাসিতে বন্ধ হয়ে গেলো হয়তো আমার জন্যে। শেষদিন খুব করে বারবার বলছিলেন, আমার কোনো বই তৈরি আছে? থাকলে আপনি ছাপানোর ব্যবস্থা করবেন। অন্যদের যদি ভালো বই পাই, তাও আপনি ছাপানোর ব্যবস্থা করবেন বলে বললেন। আরো যেসব কথা হলো, সব তো লিখতেও পারছি না এখন আর। কখনো পারবো কিনা, জানি না তাও!

স্ত্রী যখন রোগশয্যায়, তখন ভেবেছিলাম তার জন্যে হলেও নিজের একটা বই তাকে উৎসর্গ করে বের করবো, সেই স্বপ্ন পূর্ণ হয় নি। আপনার জন্যে, আপনি খুশি হবেন বলে কিছু লেখার, কোনো বই বের করার ইচ্ছে ছিলো, সেটাও হলো না আর। আমার পথে পথে পাথরই ছড়ানো থাকে অহরহ। সব জাহান্নামে যাক, শুধু আপনি যদি বেঁচে থাকতেন আজ অভিদা, যদি থাকতেন...

একটা ছোটো কাজ করেছি। বেশ কিছুদিন ধরে ভাবছিলাম, বিজ্ঞানের নানা দিক নিয়ে কিছু গান লিখবো। ভিনদেশে কতো কিছু নিয়েই যে গান বাঁধা হয়, আর আমরা শুধু যেন নচিকেতার আমি - তুমি-তুমি-আমির পারমুটেশন আর কম্বিনেশনে বন্দি! বিজ্ঞানও হয়ে উঠুক গানের অনুপ্রেরণা, উৎস ও সঙ্গী। যদিও সুরজ্ঞান তেমন নেই, তবুও লিখে ফেললাম। দেখা যাক, কখনো সুরাশ্লিষ্ট হয়ে মানুষের কানে বা গানের জগতে ধরা দেয় কিনা! আপনার জন্মদিনে উপহার হিসেবে এই অকিঞ্চিৎকর ব্যাপারটুকুই থাকলো, আপনার হাসিমুখটা মনে পড়ছে, আপনি খুব অখুশি হতেন না অভিদা আমি জানি...

মৌলের সবচেয়ে খুদে অংশের নাম,
বিক্রিয়াসক্ষম, পরমাণু বা এ্যাটম।
প্রোটন ও নিউট্রনে মিলে গড়ে কেন্দ্র,
নিউক্লিয়াস নামে সেটুকু অতন্দ্র।
আধানে ধনাত্মক প্রোটনচরিত্র,
নিউট্রনে আধানে নেই লেশমাত্র।
নিউক্লিয়াস ঘিরে পাক খায় কক্ষে
ইলেক্ট্রনের দল, নানাবিধ অক্ষে।
ইলেক্ট্রনের জানি আধান ঋণাত্মক,
এই তিন কণা মিলে পরমাণু সার্থক।
এস, পি কক্ষপথে ইলেক্ট্রনের দল

ওঠানামা করে বলে শক্তির চলাচল।
প্রোটন ও নিউট্রন মিলে পরমাণুভর,
ইলেক্ট্রনের ভর নগণ্য, কম দর।
কটা প্রোটন আছে পরমাণুটার ভেতরে,
তাই দিয়ে পারমাণবিক সংখ্যা ধরে।
কিভাবে ইলেক্ট্রন এ্যাটমেতে ছড়ানো,
তার নানা নীতি আছে, সবগুলো কী জানো?
পরমাণুরাজ্যের নিয়ম বিচিত্র,
বিজ্ঞানআলো দিয়ে এসো আঁকি চিত্র।

শঙ্কর নামের পশ্চিমবঙ্গীয় কথাসাহিত্যিকের এক কিশোর গল্প পড়েছিলাম। প্রাক্তন উচ্চপদস্থ এক পিতা তাঁর পুত্রের দুর্ঘটনায় অপঘাতমৃত্যুর পরও তাঁর কন্যার কাছে সন্তানের জন্মদিনের কেক পাঠান। বোনের করুণতর অনুভূতি, “চোখের জলে ভাসতে ভাসতে কেক কাটতে হয়।” অভিজিৎদার জন্মদিনেও হয়তো আপনজনদের সেই বেদনাবহ অভিজ্ঞতা, এখন থেকে, কে জানে!

হায় মহাবিশ্ব, এতো বিপুল তুমি, এতোটাই সুবিস্তৃত, তারপরও আমাদের বেদনারাজি এতো সুগভীর, এতো অন্তহীন, এতো অমোচনীয়!



অভিজিৎ রায়ঃ আঁধারে আলো জ্বালানো এক প্রকৃত বিজ্ঞানমনস্ক অভিযাত্রীর নাম

হোরাস

আজ সেপ্টেম্বরের ১২ তারিখ, অভিজিৎ রায়ের জন্মদিন। আজকের দিনটি আমাদের মুক্তমনা পরিবারের সদস্যদের জন্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ একটা দিন কারণ ধর্মান্ধ, মৌলবাদী সন্ত্রাসীদের হাতে নিহত হবার পর এটাই অভিজিতের প্রথম জন্মদিন। আজকের এই বিশেষ দিনে আমরা অভিজিতের জীবন এবং তাঁর লেখক সত্বাকে স্মরণ করবার জন্য কলম তুলে নিয়েছি। অনুধাবন করার চেষ্টা করছি আমাদের মননে এবং চিন্তা ভাবনায় অভিজিতের কোন প্রভাব আছে কিনা বা থাকলে কিভাবে আছে?

খুব ছোটবেলা থেকেই বিজ্ঞানের প্রতি আমার আগ্রহ ছিল খুব বেশী। সব কিছুর পিছনেই যে বৈজ্ঞানিক কোন ব্যাখ্যা আছে, থাকতেই হবে এটা ছিল আমার বদ্ধমূল ধারণা। কিভাবে আমার মনে এই ধারণা গেড়ে বসেছিল সে কথা আজ আর তেমন করে মনে করতে পারি না। তবে মনে আছে খুব ছোট থাকতেই প্রচুর বই পড়ার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল আমার, নাওয়া খাওয়া ভুলে সুযোগ পেলেই শুধু বই পড়তাম। আর ধর্মের কল্প কাহিনী গুলো কখনই আমার কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে হতনা। পরিষ্কার বুঝতে পারতাম ধর্মীয় অনুশাসন, নিয়ম-কানুন গুলো সব মানুষেরই সৃষ্টি। তবে নিজের ধারনার প্রতি অতটা প্রত্যয় ছিল না।

২০০৫ সালের কথা, কিভাবে কিভাবে যেন সদালাপ নামক একটা অনলাইনে ফোরামে গিয়ে হাজির হই। সেখানেই প্রথম পরিচয় হয় অভিজিতের লেখার সাথে। অভিজিতের কোন লেখাটা প্রথম পড়েছিলাম আজ আর সেটা মনে নেই। বিজ্ঞানের প্রতি প্রচন্ড আগ্রহ থাকায় অভিজিতের লেখার ভক্ত হতে সময় লাগেনি এক মূহুর্তও। সেখান থেকেই মুক্তমনার খোঁজ পাই এবং নিয়মিত মুক্তমনায় লেখা পরতে শুরু করি। মুক্তমনা সাইটটি তখন ফোরাম হিসাবেই চলত, ব্লগ হয়ে ওঠেনি। অভিজিৎ সহ অন্যান্য লেখকদের বিজ্ঞান এবং ধর্ম বিষয়ক বিভিন্ন ধরনের এবং স্বাদের লেখা পড়তে পড়তে এতদিন আমি মনে মনে যা ভাবতাম সেগুলো সব প্রত্যয়ে পরিনত হয়। বুঝতে পারি আমার চিন্তা ভাবনা ঠিকই আছে। এতদিন আমার ভিতরে যে আস্হার অভাব চিল তা ঘুচে গেছে।আর আমার অত্যন্ত আগ্রহের বিষয় - বিবর্তন তত্ত্ব - নিয়ে অনেক প্রশ্নের উত্তর আমি তৎদিনে পেয়ে গেছি। শুধু তাই না আমি আরও বেশী আগ্রহী হয়ে উঠি বর্তমান সময়ের প্রখ্যাত জীব বিজ্ঞানীদের অনেকেরই বই পড়ার ব্যাপারে।

মুক্তমনায় লেখা পড়তে পড়তেই প্রথমে খোঁজ পাই সচলায়তন, এবং সামহয়্যার-ইন ব্লগের, এরপর আমারব্লগের। এই তিন ব্লগেই ছিল অভিজিতের পদচারনা। এতদিন সব দেখে শুনে আমার নিজেরও লেখার আগ্রহ একটু একটু করে বেড়েই চলেছে। তবে মুক্তমনায় কখনো লিখব সেটা কখনো ভেবে উঠিনি, যা পরবর্তীতে অভিজিতের উৎসাহেই সম্ভব হয়ে ওঠে। প্রথমে আমার ব্লগ এবং পরে সামহয়্যার ইন ব্লগকে বেছে নিয়েছিলাম লেখালেখির জন্যে। আমারব্লগেই অভিজিতের সাথে কমেন্ট, পাল্টা কমেন্টে আস্তে আস্তে পরিচয়ের সূত্রপাত। এরপর একদিন অভিজিত আমাকে আমন্ত্রণ জানায় মুক্তমনায় লেখার জন্যে। তারপর থেকেই মুক্তমনার সাথে আমার পথ চলার শুরু।

অভিজিতকে যতটুকু চিনেছিলাম তাতে করে নিশ্চিত ভাবেই বলা যায় সে ছিল আপাদমস্তক একজন বিজ্ঞান মনস্ক মানুষ। এই জগৎ সংসারের সব কিছুকেই সে বিচার করত একজন খাঁটি বিজ্ঞানীর দৃষ্টিভংগী থেকে। একজন প্রকৃত বিজ্ঞান মনস্ক মানুষ এবং সত্যিকারের একজন প্রাকটিসিং বিজ্ঞানীর চিন্তা ভাবনায় কোন তফাৎ থাকার কথা না। স্পষ্টতই বিজ্ঞান মনস্কতার খুব জোড়ালো প্রভাব ছিল তার লেখালেখিতে, জীবন সম্পর্কিত ধ্যান ধারনায়। অভিজিত কখনই অযৌক্তিক ধর্মীয় রীতিনীতি, কিংবা সামাজিক নিয়মকানুনের সমালোচনায় পিছপা ছিলনা। আর এ কারনে আস্তিক, নাস্তিক, সুশীল সব তরফ থেকেই তাকে ট্যাগিং করা হয়েছিল উগ্র নাস্তিক হিসাবে।
ব্যক্তি, সমাজ, এবং রাস্ট্র প্রতিনিয়ত ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর ভর করে অন্যদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণ করে থাকে। একবার যদি কোন অন্যায়কে ধর্মীয় বিশ্বাসের আবরনে মুড়ে দেয়া যায় তবে তা চলে যায় ধরা ছোঁয়ার বাইরে। আর এ কারনে প্রতিটি বিজ্ঞান মনস্ক মানুষের উচিত সচেতন ভাবে এসব অপ্রমানিত, অপরিক্ষণীয় দাবীর বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া।

জ্যোতির্বিজ্ঞানী লরেন্স ক্রাউস সম্প্রতি একটি আর্টিকেল প্রকাশ করেছেন "All Scientists Should Be Militant Atheists" নামে। তার আর্টিকেলের অধিকাংশ কথাই অভিজিতের বিরুদ্ধে করা ট্যাগিং এর জবাব হতে পারে অনা্য়াসেই। লরেন্স ক্রাউসের মতে একজন বিজ্ঞান মনস্ক মানুষের কাছে সমালোচনার উর্ধ্বে কোন ধারনা নেই, থাকতে পারে না। কোন চিন্তা বা ধারনাকে যুক্তি দিয়ে আক্রমণ করা যাবে না এই ধারনাটাই বিজ্ঞানের মূল ভিত্তির সাথে সাংঘর্ষিক। বিজ্ঞান মূলত একটি নাস্তিকভাবাপন্ন প্রতিষ্ঠান। যে কোন কিছুকে প্রশ্নবিদ্ধ করার অঙ্গীকারের সাথে বিজ্ঞান নামক নাস্তিকভাবাপন্ন প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক খুবই গভীর । এ বিষয়ে জীব বিজ্ঞানী JBS Haldane এর একটি উক্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্যঃ "My practice as a scientist is atheistic, that is to say, when I set up an experiment I assume that no god, angel, or devil is going to interfere with its course and this assumption has been justified by such success as I have achieved in my professional career."

ক্রাউস বলছেন, "I see a direct link, in short, between the ethics that guide science and

those that guide civic life. ...Whenever scientific claims are presented as unquestionable, they undermine science. Similarly, when religious actions or claims about sanctity can be made with impunity in our society, we undermine the very basis of modern secular democracy. We owe it to ourselves and to our children not to give a free pass to governments–totalitarian, theocratic, or democratic–that endorse, encourage, enforce, or otherwise legitimize the suppression of open questioning in order to protect ideas that are considered "sacred." Five hundred years of science have liberated humanity from the shackles of enforced ignorance. We should celebrate this openly and enthusiastically, regardless of whom it may offend.

যেহেতু বিজ্ঞান কোন sacred ধারনায় বিশ্বাস করে না তাই বিজ্ঞান মনস্কতা একজন মানুষকে ধর্ম বিশ্বাস থেকে দূরে রাখতে বাধ্য। মহাবিশ্ব কিভাবে কাজ করছে এটা আমরা যত বেশী জানছি তত বেশী উদ্দেশ্যহীন বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। এছাড়া বিজ্ঞানমনস্ক যে কোন মানুষের দায়িত্ব হল কোন কিছু সম্পর্কে মিথ্যা না বলা, মিথ্যার প্রশ্রয় না দেয়া। আর সেটা করতে যেয়ে যদি কেউ উগ্র নাস্তিক ট্যাগিং পেয়েও যায় তবুও কোন বিজ্ঞান মনস্ক মানুষেরই সেই ট্যাগিং নিয়ে লজ্জিত হবার কোন কারন নেই। আর সেই অর্থে সব বিজ্ঞান মনস্ক মানুষেরই কিছুটা হলেও উগ্র হওয়া আবশ্যকীয়। আর স্বীকার করতে দ্বিধা নেই একজন প্রকৃত বিজ্ঞান মনস্ক মানুষ হিসাবে অভিজিৎ ছিল কিছুটা উগ্র। আর অভিজিতের বন্ধু হিসাবে, সহব্লগার হিসাবে আমার নিজেকেও উগ্র হিসাবে পরিচয় দিতে কোন অসুবিধা নেই। মানুষের কল্যাণের স্বার্থেই আমাদের সবার এরকম কিছুটা হলেও উগ্র হওয়া বাঞ্ছনীয়।



অভিজিৎ রায়ঃ যার সাথে আরো অনেক দূর হেটে যাওয়ার কথা ছিল

সৈকত চৌধুরী

অভিজিৎ রায়। না, অসাধারণ কোনো মানুষ তিনি ছিলেন না। একদম সাদামাটা তার চাল-চলন-ভাষা; কোনো বক্রতা নেই, কোনো কুটিলতা নেই। অভিজিৎ রায় যখন কিছু বলতেন তা সরাসরিই বলতেন, এর তরজমা-তফসিরের প্রয়োজন হত না। স্পষ্টবাদিতা ছিল তাঁর অন্যতম প্রধান গুণ। আর ছিল সারল্য মাখা শিশু-সুলভ কৌতুহল যেটা তার অন্তর্দৃষ্টি পর্যবেক্ষণের চেষ্টা করলে সহজেই ধরা পড়ে। কেন মহাবিশ্ব এ অবস্থায় এলো, এর স্বরূপ কী, মহাবিশ্বের ঘটনাবলী, এর উৎপত্তি, প্রজাতির বিবর্তন ও উদ্ভব, মানুষের বিভিন্ন আবেগের স্বরূপ এগুলো নিয়ে তিনি লিখে গেছেন পাতার পর পাতা। নিজে জানার এবং অপরকে জানানোর যে অধীর আগ্রহ তার মাঝে ছিল সেটা তাকে নিয়ে গেছে ভিন্ন ধাপে।

আধুনিক বিজ্ঞানের যুগান্তকরী, চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী কোনো আবিষ্কার, যেসব হয়ত হৃদয়ঙ্গম করতে আমাদের হিমশিম খেতে হচ্ছে; সহজ করে সেইসব বোঝাতে অভিজিৎ রায় আন্তরিকতা নিয়ে কিন্তু নিজ থেকেই এসে দাঁড়াতেন। একদম সহজ ভাষায় সবার জন্য লিখে দিতেন প্রায় তাৎক্ষণিক। এভাবেই চলছিল গত দেড় দশক।

যদিও তার লেখার বিষয় ছিল বিজ্ঞান ও দর্শনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে, তারপরেও মানবিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তিনি ঘুরে দাঁড়িয়েছেন। ফিলিস্তিনের নিপীড়িত মানুষের জন্য লিখেছেন, সংখ্যালঘু-আদিবাসী নিয়েও তিনি খোঁজখবর রাখতেন। সমকামীদের অধিকার নিয়ে তো পুরো একটি বই-ই লিখে ফেলেছিলেন। এদের অধিকারের পক্ষে এভাবে কেউ হয়ত দাঁড়াত আরো শতাব্দিকাল পর, অনেক অনেক নিপীড়নের পর। কিন্তু অভিজিৎ সেটা করে দেখালেন এ সময়েই। তিনিই সম্ভবত সহজ বাংলায় সর্বপ্রথম আমাদের শিখিয়েছেন বিজ্ঞান আর অবিজ্ঞানের পার্থক্য, এ বিষয়ে লিখে গেছেন বিস্তর। তিনি-ই দেখিয়েছিলেন কোনো কিছুর ঐশ্বরিক ব্যাখ্যার কোনো মানে হয় না, ঈশ্বর একটি বাড়তি হাইপোথেসিস মাত্র। এগুলো বলতে গিয়ে পতিত বুদ্ধিজীবীদের মত কোনো সুবিধাবাদের অন্তরালে নিজেকে ঢেকে নেন নি, কোনো রাখঢাক তার ছিল না। এটা একদিকে তাকে জনপ্রিয় করে তুলেছিল সত্য সন্ধানীদের কাছে, সংশয়বাদিদের কাছে অপরদিকে তিনি এক বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন ছদ্মবিজ্ঞানের আশ্রয়ে থাকা অন্ধকারের ফেরিওয়ালা ও ধর্মব্যবসায়ীদের কাছে।

অভিজিৎ রায় সম্পর্কে বেশি কথা বলার সময় হয়ত এখনো আসে নি, এখনো তিনি আমাদের মাঝে পুরো জীবন্ত হয়ে গেছেন। আমার কৈশোরকাল পুরোটাই অভিজিৎ'ময়। মুক্তমনা তখন শুধু ওয়েব

সাইট ছিল, ব্লগ হয়নি। সেখানে লিখতেন দেশ-বিদেশের বহু লেখক। ঐ সময়কার বেশ কিছু লেখা এখনো মনে গেঁথে আছে। আর অভিজিৎ রায় নিজে তো লিখতেনই। তখনকার গুরুত্বপূর্ণ কিছু লেখা নিয়ে তাঁর প্রথম বইটি 'আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী' প্রকাশিত হয়েছিল ২০০৫ সালে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি গানের এই কলিকে বইটির নাম হিসাবে নিয়েছিলেন। বইয়ের এই নাম থেকেই তাঁর ভাবনার নান্দনিক আর দার্শনিক কিছু দিকও প্রকাশ পায়। বইটির এক জায়গায় এসে এখন থমকে দাঁড়াই, তিনি ব্রুনো প্রসঙ্গে বলেছেন,

'বোঝাই যায়, ব্রুনোর নশ্বর দেহ যখন আগুনের লালচে উত্তাপে ছাই হয়ে যাচ্ছিল, 'ধর্ম বেঁচে গেল' ভেবে ধর্মবাদীরা কি উদ্বাহু নৃত্যই না করেছিল সেদিন! তারপরও কি ঈশ্বর আর তার পুত্ররা সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর ঘোরা শেষ পর্যন্ত থামাতে পেরেছিলেন?"

অভিজিৎ রায়'কেও হত্যা করা হল চরম নৃশংসভাবে। এর আগে হুমায়ুন আজাদের উপর হামলা হল। হত্যা করা হল অনেকগুলো মেধাবী ব্লগার-লেখককে: অনন্ত বিজয়, ওয়াশিকুর বাবু, রাজীব হায়দার, নীলাদ্রি নিলয়। কিন্তু মানুষের অগ্রগতি কি তাতে থামানো গেছে? এসব হত্যাকাণ্ড হাস্যকর অপবিশ্বাসগুলোকে কি বাস্তব করে তুলেছে?

আবহমান কাল থেকেই যারা প্রথা-বিরোধী, সমাজের অচলায়তনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন তাদেরকে নির্যাতন করা হয়েছে, হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু এদেরই হাত ধরে মানুষ এগিয়ে গেছে বহু বহু দূর, অন্ধকার গহ্বর থেকে বেরিয়ে ধীরে ধীরে এসেছে আলোর দিকে। আমরাও নি:সন্দেহে অভিজিৎ রায়'এর মশালের আলোয় এগিয়ে যাব এক সভ্য পৃথিবীর দিকে। কিন্তু দু:খ একটাই, তাঁর সাথে আরো অনেক অনেক দূর হেঁটে যাওয়ার কথা ছিল, আশা ছিল, স্বপ্ন ছিল।

যদিও আমরা অভিজিৎ রায় সহ অনেক প্রতিভাবান লেখকদের হারিয়েছি তারপরেও নিরাশ হওয়ার কোনো কারণ দেখি না। এখন বিশ্বায়নের যুগ, পৃথিবীর কোথাও অন্ধকার জমে থাকবে না বেশিদিন । অতি দ্রুত অমানবিক এবং হাস্যকর মিথগুলো মানুষের মধ্য থেকে বিদায় নিবে, বিলুপ্ত হবে কলমের বদলে হাতে চাপাতি নেয়া অসুরের দল।



মুক্তমনা ব্লগ ও আমার নাস্তিকতার হাতেখড়ি

সজীব মোহন্ত

'অভিজিৎ রায়' ও 'মুক্তমনা ব্লগ' নামগুলোর সাথে পরিচয় ২০১০ সালের মাঝামাঝিতে যখন বাংলা ব্লগে পদচারণা শুরু করি। আমি যে ব্লগের সদস্য ছিলাম সেই ব্লগে যখন ধর্মের কোন বিষয় নিয়ে তর্ক বিতর্ক হত তখন সেখানে 'অভিজিৎ রায়' ও 'মুক্তমনা' ব্লগের নাম আপনা আপনি চলে আসত। তখন শুধু জানতাম 'অভিজিৎ রায়' একজন নাস্তিক আর 'মুক্তমনা' নাস্তিকদের ব্লগ! নিজে ধর্মীয় বইগুলো না পড়ে শুধুই শুনে শুনে ধার্মিক ছিলাম বলে ধর্ম বিষয়ে মাথা ঘামাতাম না ফলে সে সময় মুক্তমনা'তে ঢোকা হয় নি। প্রতিদিনই দেখতাম বোমা হামলায় মানুষ মরে, একে অপরের মন্দির মসজিদ ভাঙ্গে তখন মনে মনে ভাবতাম এরা আসলে ধর্ম সম্পর্কে জানেনা বলেই এমন করছে! সেই ছোটবেলা থেকেই শুনে আসছি প্রতিটি ধর্ম শান্তির কথা বলে, ন্যায়ের কথা বলে, ধর্মগুলোতে শুধু শান্তি আর শান্তি! যারা খুন, ধর্ষণ, লুণ্ঠন করছে তারা না বুঝে এসব কাজ করছে এতে ধর্মের কোন দোষ নেই! এভাবে ভাবতে ভাবতে আর সব ধার্মিকদের মত আমি ব্লগে ফুল, পাখি, প্রকৃতি, কবিতা নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম ফলে ধর্ম নিয়ে ভাবার সময় মোটেও ছিল না। জানতাম আমার ধর্ম; সঠিক ধর্ম।

আমার মুক্তচিন্তার যাত্রাটা শুরু হয় মূলত রাজিব হায়দারের মৃত্যুর পর থেকেই। তখন শাহবাগ শ্লোগানে শ্লোগানে উত্তাল, গণজাগরণ মঞ্চ লোকে লোকারণ্য।এর মধ্যে ফেব্রুয়ারির ১৫ তারিখ রাতে জঙ্গিদের হাতে খুন হয়ে যান রাজিব হায়দার। রাজিব হায়দারের মুত্যুর খবর শুনার পরই প্রথম মনে প্রশ্ন জাগে ধর্ম যদি শান্তির কথা বলে তবে মানুষ ধর্মের নামে খুন করে কেন? জন্মের পর থেকেই শুনে আসছি ইসলাম শান্তির ধর্ম, ইসলাম মানবতার ধর্ম, ইসলামে খুন খারাপির কোন স্থান নেই। টিভি, মসজিদের মাইক, ওয়াজ মাহফিল, পত্রিকা, ইন্টারনেট মিলিয়ে কত হাজার বার যে শুনে আসছি ' ইসলাম শান্তির ধর্ম' তা লিখে রাখলে বোধহয় এই তিন শব্দ দিয়ে একটি বড় আকারের বই ছাপানো যেত! যাইহোক, মনের কৌতুহল মিটানোর জন্য রাজিব হায়দারের মৃত্যুর পরদিন থেকে শুরু করলাম 'মুক্তমনা'য় অনুসন্ধান। জানার মূল আগ্রহ ছিল কেন নাস্তিকরা ধর্মের সমালোচনা করে? কেন ধার্মিকরা ধর্মের নামে খুন করে?

শুরু করলাম 'মুক্তমনা' ব্লগ থেকে পিডিএফ ফাইল ডাউনলোড করা। প্রথমেই অভিজিৎ'দার লেখাগুলো ডাউনলোড করা শুরু করলাম কারণ তখন শুধু ঐ একটি নামের সাথে পরিচিত ছিলাম! মনোযোগ দিয়ে শুরু করলাম নাস্তিকের লেখা পড়া। কে জানত তখন এই লেখাগুলো আমার চিন্তাধারা পুরোপুরি পাল্টে দিবে। তখন থেকেই একে একে পড়লাম অভিজিৎ'দার লেখা 'ব্যাড ডিজাইন' 'বিজ্ঞানময় কিতাব' 'নৈতিকতা কি শুধুই বেহেস্তে যাবার পাসপোর্ট' 'ঈশ্বরই কি সৃষ্টির আদি বা প্রথম কারণ' 'মহাবিশ্ব এবং ঈশ্বর- একটি দার্শনিক আলোচনা' 'সমকামিতা (সমপ্রেম)কি প্রকৃতি

বিরুদ্ধ' 'আস্তিকতা বনাম নাস্তিকতার' প্রত্যুত্তরে ইত্যাদি। আরো পড়লাম বিশ্বাসের ভাইরাস, অবিশ্বাসের দর্শন। তারপর একে একে অনন্ত'দার 'সনাতন ধর্মের দৃষ্টিতে নারী' পার্থিব জগতের অপার্থিবতা বিশ্লেষণ' 'মহাপ্লাবনের বাস্তবত: পৌরাণিক অতিকথন বনাম বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান' 'ভগবদগীতায় বিজ্ঞান অন্বেষণ ও অন্যান্য '। মিজান রহমানের 'আমার স্বর্গ এখানে' 'হতবুদ্ধি, হতবাক'। রণদীপম বসু'র 'সর্বগ্রাসী অপ-'বাদ' বনাম একজন আরজ আলী মাতুব্বর' অস্পৃশ্য ও ব্রাহ্মণবাদ এবং একজন বাবাসাহেব'। অপার্থিব জামানের 'বিবর্তনের দৃষ্টিতে জীবন' ' বিবর্তনের দৃষ্টিতে নৈতিকতার উদ্ভব' ' বিজ্ঞান ধর্ম ও বিশ্বাস' 'মানব প্রকৃতি কি জন্মগত, না পরিবেশগত?' । এভাবে একে একে পড়লাম বিপ্লব পাল, প্রদীপ দেব , বন্যা আহমেদ, আকাশ মালিক, ফরিদ আহমেদ, নাস্তিকের ধর্মকথা সহ আরো অনেকের লেখা।

মুক্তমনায় এসে জানতে পারলাম 'আরজ আলী মাতুব্বর' নামে একজন দার্শনিকের কথা। তার 'সত্যের সন্ধান' পড়ার পর আমি পুরোপুরি নিধার্মিক হয়ে গেলাম! উনার লেখা পড়ে মাথায় শুধু প্রশ্ন ঘুরত! 'সত্যের সন্ধান' পড়ে প্রশ্ন করতে শুরু করলাম আশপাশের ধার্মিকদের! কেউ দেখি আমার প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারে না। ব্যক্তিগত ভাবে আমার কাছে মনে হয় শুধু আরজ আলী মাতুব্বরের 'সত্যের সন্ধান' বইটি যে কেউ অনুসন্ধিৎসু মন দিয়ে পড়লেই নাস্তিক হতে বাধ্য। এরপর আস্তে আস্তে ইউটিউব থেকে বিবর্তনবাদ, পৃথিবী কিভাবে সৃষ্টি হল, মানুষ কোথা থেকে এল, ধর্মগুলো কিভাবে এল, এইসব বিষয়ের উপর তৈরি ডকোমেন্টরিগুলো দেখতে লাগলাম। এভাবে আস্তে আস্তে সব ধারণা পরিস্কার হয়ে গেল ধর্মীয় কুসংস্কার ও ভন্ডামি সম্পর্কে।

আজ থেকে শ পাঁচেক বছর আগে কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও যে সময় অতিক্রান্ত করেছিলেন আজ আমরা সেই সময় অতিক্রান্ত করছি। কোপার্নিকাসকে হত্যার পর থেকে, পৃথিবী কি সূর্যের চারদিকে ঘুরা বন্ধ করে দিয়েছে? ঠিক তেমনি মুক্তমনাদের হত্যা করলেই কি মিথ্যার উপর প্রতিষ্টিত গাঁজাখুরি গল্পের কাল্পনিক ধর্মগুলো সত্য হয়ে যাবে? শুধু এক বই পড়ুয়াদের বুঝা উচিৎ রাজীব হায়দার, অভিজিৎ রায়, ওয়াশিকুর বাবু, অনন্ত বিজয়, নিলয় নীলদের হত্যা করলেই তোমাদের মিথ্যা ধর্ম সত্য হয়ে যাবে না। চার্চের যেসব পাদ্রীরা ব্রুনোকে আগুনে পুড়িয়ে মেরেছিল তাদের আজ আর কেউ চিনে না কিন্তু ব্রুনো, কোপার্নিকাস, গ্যালিলিওদের শত শত বছর পরেও মানুষ জানে তেমনি যারা এদেশের মুক্তচিন্তকদের হত্যা করেছে তাদের কেউ চিনবেও না কিন্তু রাজীব হায়দার, অভিজিৎ রায়, ওয়াশিকুর বাবু, অনন্ত বিজয়, নিলয় নীলদের নাম শত বছর পরেও স্বমহিমায় থাকবে।

একজন 'অভিজিৎ রায়' ও 'মুক্তমনা' ব্লগ আমাকে মুক্তচিন্তা করতে শিখিয়েছিল। একজন গোঁড়া ধার্মিক থেকে মুক্তমনা হিসেবে তৈরি করতে মুক্তমনা ব্লগের অবদান কতটুকু তা শুধু আমি জানি। ২৬ ফেব্রুয়ারী রাতে যখন টিভিতে দেখলাম অভিজিৎ'দা জঙ্গিদের হামলায় মারা গেছেন মনে হচ্ছিল নিজের শরীর থেকে যেন কিছু একটা খসে পড়েছে। আফসোস করছিলাম কেন দেশে আসলেন? নিজের বিপদ জেনেও কোন মানুষ কি এভাবে একটি জঙ্গির আস্তানায় পা দেয়? এখন বুঝি ভয়

দেখিয়ে মুক্তমনাদের আটকিয়ে রাখা যায় না। এক রাজিব হায়দারের মৃত্যু আমার মত হাজারও রাজিব হায়দারদের জন্ম হয়েছে। এক অভিজিৎয়ের মৃত্যু কত লক্ষ অভিজিৎয়ের জন্ম দিচ্ছে, দিবে তা সময়েই তা বলে দিবে। অভিজিৎ দার শারীরিক উপস্থিতি নেই কিন্তু তিনি এদেশের মুক্তচিন্তা আন্দোলনের অগ্রপথিক হয়ে থাকবেন সবসময় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কলম চলছে, কলম চলবে। আলো আসবেই।



জন্মদিনের পুষ্পাঞ্জলি

নীল অরিন্দম

২০১৩ এর শেষের দিকের কথা - ক্লাসের অবসরে সারাদিন ফেসবুক ব্রাউস করি আর নিজের একটা ব্লগে কবিতা লিখি । আমার এক ফেসবুক ফ্রেন্ড(সঙ্গত কারনে নাম উল্লেখ করছি না) একদিন দেখলাম একটা লিংক শেয়ার করেছে । যেখানে মুক্তমনা শব্দটা ভেসে আছে । মুক্তমনা শব্দটাতে কেমন যেন আকৃষ্ট হয়ে গেলাম , কখন যে লিংক এ ক্লিক করে পড়তে শুরু করেছিলাম জানিই না । যদিও তখন এই মুক্তমনা শব্দটার সাথে বিশেষ পরিচিত ছিলাম না । যাইহোক, মুক্তমনা ব্লগে ঢুকে দু একটি লেখা পড়ার পর-ই কেমন যেন আমার ভেতরে এতকাল জমে থাকা প্রশ্নগুলো উল্টে পাল্টে দিলো মুহূর্তক্ষনেই । ওমন অগ্নিগর্বা কলামগুলো আমাকে সত্যিই বেশ ভাবিয়েছিলো ।

যদিও পড়ার নেশা প্রায় ছোটবেলা থেকেই ছিল । এমনকি মাধ্যমিকের সময়ই হুমায়ুন আজাদ ও তসলিমা নাসরিনের অনেকগুলো বই পড়া হয়েগিয়েছিল । কিন্তু এদিকে আমি কট্টরপন্থি হিন্দু পরিবারের ছেলে হবার সুবাদে ছোটবেলা থেকেই এ পুজা, সে পুজা দেখে দেখে বড় হয়ছি ; এমন কি ধর্মের প্রতি উদাসীনতা থাকা সত্তেও বাবা-মায়ের চাপে ধর্মীয় কাজে অংশগ্রহন করতে বাধ্য হয়েছি । তখন থেকেই ঈশ্বর শব্দের কার্যকারিতা সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়ি । তারপর সেই ষোল বছর থেকেই সকল ধর্মীয় কার্যকলাপকে বিদেয় জানিয়েছিলাম । কিন্তু ঈশ্বর নামক কাল্পনিক সত্ত্বাটাকে তখনো পুরোপুরি বিদেয় জানাতে পারি নি ।

মুক্তমনার লেখা নিয়মিত পড়তে শুরু করলাম । ধীরে ধীরে ঈশ্বরের কার্যকলাপই না , ঈশ্বর নামক বস্তুর অস্তিত্বের প্রতিও হলাম সন্দিহান । আর এদিকে মুক্তমনায় যে সব বইগুলো রিকমান্ড করতো, সেই বইয়ের পিডিএফ ডাউনলোড করে পড়তে শুরু করলাম । ততদিনে অভিজিৎ রায় সম্পর্কে জেনে গিয়েছি । জেনে গিয়েছিলাম মুক্তমনার মানে ।

আর ২০১৪ এর শেষের দিকে আমার হাতে এলো “অবিশ্বাসের দর্শন” বইটি । বইটা পড়তে শুরু করার পরই এক অকৃত্তিম ভালোবাসা জন্ম নিয়েছিলো অভিজিৎ রায়ের লেখনির প্রতি । একটা দুর্বোদ্ধ কথাকেও যে অতি সহজে মনোমুগ্ধকর প্রাঞ্জল ভাবে প্রকাশ করা যায়, তা অভিজিৎ রায়ের এই “অবিশ্বাসের দর্শন” না পড়লে কোনকালে জানতেও পারতাম না ।

আর নিজের ভেতর থাকা কাল্পনিক ঈশ্বর নামক সত্ত্বাকে পুরোপুরি দূরও করতে পারতাম না । আর

তারপর থেকেই এই অভিজিৎ রায় কে অভিজিৎ'দা হিসেবে সম্বোধন করা শুরু করলাম বন্ধুবান্ধবের আড্ডায়। আর তারপর থেকেই শুরু আমার অবিশ্বাসী জীবন। এদিকে ফেসবুকে নিজের অবিশ্বাসের কথা বলতে বলতে সমমনা আরও অনেকের সাথে যুক্ত হলাম। আর অভিজিৎ রায়ের বিশ্বাসের ভাইরাস, শূন্য থেকে মহাবিশ্ব ও আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী বইগুলো আমার সেল্ফে। কিন্তু তখনও পড়ে উঠি নি বইগুলো।

আর এবছরের ফেব্রুয়ারি তে অভিজিৎ রায় বাঙলাদেশে আসবেন বলে ফেসবুকে সমমনা অনেকেই দেখলাম উৎফুল্ল। আমিও খুশি হয়েছিলাম। কিন্তু এরকম একটা আমূল পরিবর্তন বাঙলাদেশের ব্লগিং এ হবে তা ভাবিনি সেদিন কেউই। আর যার সূত্রপাত হবে আমার অভিজিৎ'দার .... । তারপর সেদিন থেকে আমি অভিজিৎ'দার বইগুলো যতবার পড়েছি চোখের জলের দাগ রেখে দিয়েছি জমিয়ে।

অভিজিৎ রায়, গ্যালিলিও রা হাজার বছর পর পর পৃথিবীতে আসেন। আর পৃথিবীর মানুষের মতো দেখতে অমানুষেরা তাদের চলার পথ কে রুদ্ধ করে দেয় বার বার। কিন্তু যতদিন পৃথিবীতে একজনও সত্যিকারের মানুষ বেঁচে থাকবে ততদিন অভিজিৎ রায় দের মৃত্যু নেই।
তোমার প্রতি সহস্র মানুষের এ ভালবাসা যেন শতাব্দী থেকে শতাব্দীময় প্রতীক্ষা।।



আমি যেভাবে বখে গেলাম

নিকসন কান্তি

‘আলোকিত হওয়ার গল্প’ কথাটা বেশ অস্বস্তিতে ফেলে। ‘আলোকিত মানুষ’ এই শব্দমালা যিনি জনপ্রিয় করেছেন সেই আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ একসময় বলেছিলেন যে আলোকিত মানুষ বলে আসলে কিছু নেই। আলোকিত মানুষ একটা স্বপ্নের নাম। মানুষ জীবনভর সেই স্বপ্নের কাছাকাছি যাবার চেষ্টা করতে পারে কেবল। এই এগিয়ে যাওয়াই সেই চিরঅধরা স্বপ্নের সার্থকতা।

সুতরাং, আলোকিত হওয়ার গল্প বাদ। মুক্তমনা কি হতে পেরেছি? কনফিডেন্টলী দাবীতো করতে পারি না। এই ব্লগের এক একজনের লেখা পড়ি আর নিজেকে স্রেফ অশিক্ষিত মনে হতে থাকে। আচ্ছা, যুক্তিবাদী? ওরে বাবা.. থাক থাক। কোনমতে মিনমিন করে নিজেকে কেবল নাস্তিক বলে স্বীকার করতে পারি। আর বর্তমান বাংলাদেশে, হয়তো প্রাচীন বাংলাদেশেও, নাস্তিকতা একরকম বখামি ছাড়া আর কী! তাই- বখে যাওয়ার গল্প।

জন্মেছি বাংলাদেশে। মুসলিম প্রধান একটি মফস্বল শহরের এক হিন্দু পরিবারে। চারদিকে একঘরও হিন্দু প্রতিবেশী না থাকায় এবং বাবা ধর্মের ব্যাপারে উদাসীন ধরনের হওয়ায় আমাদের পরিবারে ধর্মচর্চা প্রায় ছিলোনা বললেই চলে। মা একাই ঘরের এক কোণে শ্রী রামকৃষ্ণের একটা ছবি রেখে নিয়মিত ধুপধুনা দিতেন। তো কয়েকবার বাসা পাল্টানোর পর এক পর্যায়ে আর উপযুক্ত কোণ বের না হওয়ায় বেচারা রামকৃষ্ণও গন। বড় ভাই-বোনদের মুখে শুনেছি বাবা নাকি মাকে একটা অদ্ভুত কথা বলতেন। তিনি বলতেন, ছেলেমেয়েদের ধর্ম পালন করতে বাধ্য করবে না। এরা বড় হোক। পড়াশুনা করুক। নিজে নিজে কোনদিন শুরু করলে করবে। তুমি কখনো জোর করবে না।

বাবা মারা যাবার সময় আমি বেশ ছোট। বড়জোর থ্রীতে পড়ি। কিন্তু আমি নিজেও দেখেছি, মা সারাজীবন বাবার কথাটা মেনে চলেছেন। এই যেমন, মা হয়তো কোন একটা মন্দিরে গেলেন আমাকে সাথে নিয়ে। পুজো দিচ্ছেন। আমি মন্দিরের সামনের মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছি। মা পুজো সেরে আমাকে একবার ডাকলেন মন্দিরের ভেতরে ঢুকতে। আমি গাঁইগুঁই করে সরে গেলাম। মাও দ্বিতীয়বার আর ডাকলেন না।

তো এই তুরিকায় বড় হবার কারনে আমার কিংবা আমার বড় ভাই-বোনদের মধ্যে ধর্ম বিষয়ে একটা গা-ছাড়া ভাব বরাবরই ছিলো। তরুন বয়সে ভাইয়া তার বন্ধুবান্ধবদের সাথে মহাসুখে গো-মাংস খেতেন খবর পেতাম। মাকে কখনো এ নিয়ে কোন কথা বলতে শুনিনি। আমিও তথৈবচ। ধর্মবিশ্বাসটা মোটামুটি সুতায় ঝুলতে থাকার কারনে ছিঁড়ে যেতে সময় লাগেনি; যখন এসএসসি পরীক্ষার পর গ্রামে বেড়াতে গিয়ে মাসতুতো ভাইয়ের বাসায় বসে প্রবীর ঘোষের ‘অলৌকিক নয়,

লৌকিক' এর প্রথম খন্ডটা পড়েছিলাম। অনুভূতিতে কোন আঘাত নয়.. এমনকি কোন বিস্ময়ও নয়; আমার আগাগোড়া রিএ্যাকশনটা ছিলো 'আরে তাই তো'.. 'ঠিকই তো'..।

বখামির সে-ই শুরু। কয়েক বছর পরে একসময় যখন বাসায় আরাম করে শুয়ে বসে 'আমি কেন ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না' বইটা পড়ছিলাম, মাকে দেখলাম প্রথমবারের মতো একটু চমকে উঠতে। কিছু বলেন নি অবশ্য। এদিকে তদ্দিনে আমি পুরোপুরি উচ্ছন্নে গেছি। তবু বিশেষ করে এই বইটা নিয়ে মজার স্মৃতি আছে। তখন মাত্র ভার্সিটিতে উঠেছি। দেখানেপনার লোভটা ষোল আনা আছে। ব্যাগের মধ্যে কোন না কোন গল্পের বই তো থাকতোই। বন্ধুরাও পড়তে নিতো। তো একদিন ইচ্ছা করে ঐ বইটা নিয়ে গেলাম। তারপর ক্লাসের ফাঁকেফাঁকে সেটা বের করে পড়া বইটাই গভীর মনযোগ দিয়ে মাঝখান থেকে আবার পড়তে লাগলাম। কিসের আর পড়া। খুঁজে খুঁজে সেনসেটিভ পেজগুলো একটা একটা খুলে রেখে বইয়ে চোখ রেখেই লক্ষ্য রাখছিলাম আশপাশ থেকে কেউ পড়ার চেষ্টা করে কিনা। কাছের বন্ধুরা এসে এসে বই উল্টে নামটা দেখে নিচ্ছিলো। আর প্রত্যেকেই থতমত খেয়ে আবার সোজা করে রাখছিলো। আর আমি এদিকে খুবই-ডিস্টার্ব-ফিল-করছি ভাব করে মনে মনে খিক খিক করছি। খুব কাছের একজনকে ক্যাজুয়ালী জিজ্ঞেসও করলাম, 'পড়তে নিবি নাকি?' যে ছেলে এমনিতে আমার আধা-পড়া বই কেড়ে নিয়ে যায়, সেদিন দেখলাম তার মুখ শুকিয়ে গেলো। বলে কিনা, 'আচ্ছা.. নিবো.. পরে'। আরেকজন সিরিয়াস ভঙ্গিতে মন্তব্য করলো, 'আমার ধারনা এই বই পড়লে আমার বিশ্বাসটা আরো বাইড়া যাবে'। লও ঠ্যালা!

সেদিন একটা জিনিস বুঝেছিলাম। ধর্মবিশ্বাস মাথায় একবার মোটামুটি গেঁথে গেলে স্রেফ পড়াশুনা করে বোধহয় সেটা বের হয়না বা কমে না। মনে হয় আমার মতো প্রায় ধর্মচর্চাহীন পরিবেশে শৈশব-কৈশোর কাটালেই কেবল ধর্মবিশ্বাস থেকে পুরোপুরি সরে আসা সম্ভব। এর বাইরে অবিশ্বাসী হয়ে ওঠার সম্ভাবনা সম্ভবত খুবই কম।

এসব বহুদিন আগের কথা। তখনো ইন্টারনেটের ব্যবহার তেমন জানি না। অভিজিৎ রায়ের নামও শুনিনি। ব্লগ পড়া, ফেসবুকিং করা শুরু করেছি এই সেদিন। দুই হাজার দশ এগারোর দিকে। প্রথম প্রথম সামু পড়তাম। সেখানকারই একটা পোস্ট থেকে অন্য বাংলা ব্লগগুলোর খোঁজ পেয়ে ঢুঁ মারা শুরু করলাম। সচলায়তন খুব ভালো লাগলো। তারপর মুক্তমনা।

এমন চেটেপুটে আর কোন ব্লগ পড়িনি। খুব ঘন ঘন নতুন পোস্ট না আসায় আমার সুবিধাই হয়েছিলো। পেছনের লেখাগুলোও হাভাতের মতো পড়তে লাগলাম। খালি মনে হতো, কোথায় ছিলাম আমি এতদিন! কী ঘন্টা করছিলাম!

তবুও এসব নিজের মধ্যেই রেখে যাচ্ছিলাম। তেমন কারো সাথে শেয়ার করিনি। বন্ধুদের সাথেও নয়। তখনও আমি বড্ড সুশীল। কারো অনুভূতিতে আঘাত দেয়া ঠিক না- এমনই ভাবি। আমি নিজে ‘সবই ব্যাদে আছে’ ধরনের লেখা পড়ে মজা পাচ্ছি- পাই। সবাইকে পড়ানো কী দরকার! মানুষ কষ্ট পাবে না? থাক থাক।

আমাকে প্রথমবারের মতো একটা ভালো ঝাঁকুনি দিলো থাবা বাবার মৃত্যু-পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ। মাহমুদুর রহমান বীর হয়ে উঠলেন। কতজনের সাথে যে তখন তর্ক করেছি! সমীকরণে এক্স এর মান বের করার মতো করে ধাপে ধাপে দেখিয়েছি- ইস্যুটা ছিলো যুদ্ধাপরাধীর বিচার; ধর্ম অধর্ম নয়। সেখানে নাস্তিকতাকে ইস্যু হিসাবে সামনে নিয়ে এসে পুরো বিষয়টাকে গুলিয়ে দেয়া, হাওয়ার দিক বদলে দেয়া মানে হচ্ছে স্রেফ পেছন থেকে ছুরি মেরে জিতে যাওয়া। পেছন থেকে ছুরি মেরে যে জেতে তাকে একরকম বিজয়ী বলা যেতে পারে, বীর কিভাবে বলি! কিন্তু না, তবুও বার বার সেই একই কথা শুনতে হচ্ছিলো। কাছের কিছু মানুষের নতুন একটা চেহারা দেখেছি তখন। প্রায় মন ভেঙে গিয়েছিলো।

তবু সে ঘটনাও নয়। আমার নিয়তি ঠিক করে দিলো ২৬ ফেব্রুয়ারী ২০১৫। হয়তো গোটা বাংলাদেশেরই।

ঐদিন সকালে- বোধহয় বিডিনিউজেই- অভিজিৎ দা’র একটা লেখা দেখেছিলাম। (এখন একবার কনফার্ম হতে গিয়ে সেটা আর খুঁজে পেলাম না। কি আশ্চর্য!) কিছুদূর পড়েই বুঝলাম এ জিনিস রিডিং পড়ে গেলে হবে না; বানান করে পড়তে হবে। সুতরাং সন্ধ্যায়। তারপর অফিস শেষে বাসায় ফিরে লেখাটার কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে কি একটা যেন ছবি দেখতে বসে গেলাম। রাত এগারটার দিকে ফেসবুক খুলে দেখি... ছোপ ছোপ রক্ত।

ঐ তারিখটা এবং তার পরের কয়েকদিনে মানুষের রেসপন্স বাঙালীর শেষ মুখোশটা খুলে দিয়ে গেলো। অভাবনীয় যুক্তি শুনলাম- ফেসবুক নয়- বন্ধুর কাছ থেকেইঃ তোমার বাকস্বাধীনতা থাকলে আমারও হাতস্বাধীনতা আছে!

ভালোই হলো; চিনে নিলাম কিছু মানুষকে। শিখে নিলাম কোথায় লাইন টানতে হয়। বুঝতে পারলাম আমারও সময় এসেছে নিজের মুখোশটা খুলে ফেলার- ভালো ছেলের মুখোশ। আমি তো ভালো ছেলে নই। আমি তো নাস্তিক।

নিজের জন্য কিছু মন্ত্র তৈরী করলাম; নিজেই অষ্টপ্রহর জপ করার জন্য -
১। কাউকে আপগ্রেড করার চেষ্টা করো না; জগতের সকল প্রাণী তোমার চেয়ে বেশি জানে এবং বেশি বোঝে। সুতরাং, যে বিষ্ঠা-কুপে সুখে আছে তাকে সেখানেই সুখে থাকতে দাও।
২। সম্মান খুব দামী জিনিস। অপাত্রে ঢেলো না। যে যতটুকুর উপযুক্ত তার একবিন্দু বেশি দিও না। সর্বজীবে দয়া চুড়ান্ত গাধামীর আরেক নাম।
৩। পড়াশোনা কর। লেখালেখি করতে হবে।
৪। যে প্রশ্ন জানার জন্য করা হয়নি বরং কুতর্ক শুরু করার জন্য করা হয়েছে সে প্রশ্নের উত্তর দিয়ো না। ও.. ভালো কথা, 'মুড়ি খাও' উত্তরটা দিতে পারো।
৫। লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট- সবার কাছে ভালো থাকার দরকার নেই।

"সেই থেকে শুরু দিন বদলের পালা।"

পুনশ্চঃ
বাংলাদেশের মুক্তচিন্তার ইতিহাসে অভিজিৎ রায়ের জন্মদিনের তুলনায় তার হত্যাকান্ডের দিনটি অনেক অনেক বেশি গুরুত্ববহ। তবু দু'টোই পালন করা যেতে পারে। জন্মদিনটি পালিত হোক শ্রদ্ধায়, ভালোবাসায়, ঠিক এমনই কোন বিষয় ভিত্তিক সম্মিলিত কাজের মধ্য দিয়ে। আর ২৬ শে ফেব্রুয়ারী পালিত হোক শুধুই প্রতিবাদে। স্রেফ দাবানলের ভাষায়।



অভিজিৎ রায় ২০১৫

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

২৬ ফেব্রুয়ারি'১৫ রাত ১০ টা। বাসার ফ্লোরে বসে রতের খাবার খাচ্ছি পাশে টিভি চলছে, রিমোট আমার বন্ধুর হাতে একটু পর পর চ্যানেল পাল্টাচ্ছে, আমিও কিছুক্ষণ পর পর টিভির দিকে তাকাই। আমার এখন মনে নেই কোন চ্যানেলে প্রথম দেখেছি ব্রেকিং নিউজ টা অভিজিৎ রায়কে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বিত্তরা এবং তার স্ত্রী'র অবস্থা আশঙ্কাজনক। তখন মনে হয়েছে আমি আকাশ থেকে পরেছি। অভিজিৎ রায় বাংলাদেশে কবে এসেছে তাও জানিনা । পরে বুঝতে পারলাম নিরাপত্তার কারনেই ফেইসবুকে জানায়নি। তখন আমার চোখকে আমি বিশ্বাস করতে পারছি না, আমার কানকে আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। সঙ্গে সঙ্গে ঢাবি'র এক বন্ধুকে ফোন করলাম সে বই মেলায় থাকার কথা কিন্তু সে ছিল না, সে অন্য একজনের কাছ থেকে ফোনে নিশ্চিত হয়ে আমাকে জানালো আসলেই অভিজিৎ রায় আর নেই! আমার মাথায় তখন কিছু কাজ করছে না, এই খবরটি জানানোর মত আমার অনেক বন্ধু আছে বড় ভাই আছে কিন্তু কারো কথাই আমার মনে আসতে ছিল ছিল না। শুধু চাঁদপুরের এক ছোট ভাইকে ফোনে ট্রাই করছি কিন্তু তার ফোন বন্ধ ছিল, তবুও বারবার চেষ্টা করলাম। টেবিলে মাথা পেলে কতক্ষন নীরবে ছিলাম , চিৎকার করে কাঁদতে চাইছি কিন্তু পারছি না। মাথায় চিন্তা ও ভয় নিয়ে রাতটা কাটালাম। সকালে কম্পিউটারের সামনে বসলাম কাজ করার জন্য, এক হাত মাউসে এক হাত কিবোর্ডে আর চোখ মনিটরের পর্দায়, কিন্তু আমার মন তো এখানে নেই। শুধু চিন্তা করি অভিজিৎ রায় আর নেই, সে আর লিখতে পারবে না, এই কথাটি'ই ভাবতেই আমার কেমন লাগে। আমি এখন পর্যন্ত এমন কোন দিন নাই যে অভিজিৎ রায় কে মনে করছি না, ফেসবুকে ঢুকলেই দেখাযায় অনেকে এখনো অভি'দার ছবি প্রোফাইল পিকচার দিয়ে রেখেছে, বন্যা আপু এখন মাঝে মাঝে ফেইসবুকে আসে পোস্ট দেয়, এবং আমারও ফেইসবুকে ফ্রোপাইল পিকচার অভি'দার মুক্তমনার প্রোফাইল পিকচারটা । আমার ল্যাপ্টপের ডেস্কটপের ব্যাকরাউন্ডে অভিজিত'দা বন্যা আপু এবং তাদের সন্তানের একটা ছবি থাকে। অভি'দাকে মনে রাখার অনেক কিছুই প্রতিনিয়ত আমার চোখের সামনে থাকে। অভি'দাকে মনে করার জন্য কিছুই না থাকলেও চলে। আমি পারব, যখন সব কিছু থেকে অনেকদূরে চলে যাবো সেদিনও আমি অভি'দার কথা আমার মনে থাকবে।

আমার তখন আস্তে আস্তে মনে পরেছিল কাকে কাকে ফোন করা দরকার, প্রথমে ফোন করলাম চাঁদপুরের এক বন্ধুকে সে জানালো সে রাতেই শুনেছে সে বলল আমি এতো কষ্ট পেয়েছি যে আমার মা-বাবার মৃত্যুও মনে হয় আমাকে এতো কষ্ট দেবে না। তারপর সিলেটে ফোন করলাম আরেক বন্ধুকে সে বলল সে জানে। তখন ফোন টা রেখে চিন্তা করলাম সেই ৪/৫ বছর আগের কথা কবে থেকে অভি'দাকে চিনি তার নাম শুনি। 'শিক্ষা আন্দোলন মঞ্চ' নামে একটা পত্রিকা ছিল সেখানে অভিজিৎ'দা লিখতো, সেই প্রথম দেখেছিলাম অভিজিৎ'দার নাম সাথে বন্যা আপুর নামও ছিল।

তারপর ফেইসবুকে আসি কিছু দিন পরে। নিজে বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকার কারনে সহজেই মুক্তমনাদের চিনতে পারি, তখন আমি শুধু সামু ব্লগ এবং মুক্তমনা ব্লগে ঢুকি। সামুতে লিঙ্ক আসলে জেতাম এভাবে বেশি যাওয়া হত না, কিন্তু মুক্তমনায় আমার যাওয়া হত কারন সেখান থেকে ই-বুক ডাউনলোড করতাম, পড়তাম এবং আরও কয়েকজনকে দিতাম। আমি মুক্তমনাকে নিয়ে গল্প করতাম , মুক্তমনাকেই আমি সবার কাছে সেরা ব্লগ বলতাম এখনো বলি। সেখান থেকেই আমার ভিন্ন কিছুতে ভিন্ন চিন্তার সাথে পরিচয়। তখন নিজের ভিতর আস্তে আস্তে প্রশ্নও আসতো সমাধান হত, ধর্মীয় দ্যান ধরনা মাথা থেকে চলে গেল। এভাবেই পরিবর্তন হতে শুরু করলাম। বিজ্ঞানের প্রতি প্রেম জন্মালো, বই পড়া বেড়ে গেল, এমনকি আস্তে আস্তে কয়েকটা বাংলা ব্লগে লিখতে শুরু করলাম। কিন্তু মুক্তমনার আমি শুধুই পাঠক। কারন আমি দেখলাম সেখানকার লেখকরা অনেক উচ্চশিক্ষত এবং সেখানে সাধারণ লেখা খুব কমই থাকে। প্রত্যেক টা লেখারই কোয়ালিটি আছে। তাই আমি মুক্তমনার নিয়মিত পাঠক হয়ে গেলাম। ফেইসবুকে অভি'দার সাথে এড হলাম, ছোট বড় সব লেখাই তখন চোখে পরত এমনকি কোন পত্রিকায় লেখলেও পড়া হত। এভাবেই খুব ধীরে ধীরে অভি'দাকে চিনেছি। সে জন্যই চলে যাওয়াটা মেনে নেওয়া যায় না।

অভি'দার লেখা ই-বুক গুলো আমি যাকে পেরেছি তাকেই দিয়েছি, একবার 'সমকামিতা কি প্রকৃতি বিরুদ্ধ?' লেখাটি দিলাম এক বন্ধুকে সে মুক্তমনাই ছিল কিন্তু অভি'দার লেখা আগে কখনই পড়ে নাই, এই লেখাটি পরে সে আমাকে বলল 'আমি তো অভিজির রায়ের একটি লেখা পড়েই ফ্যান হয়ে গেলাম', এই লেখাটি আমাকেও অনেক প্রভাবিত করেছে ১৬ পৃষ্ঠার একটি লেখা দিয়ে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, সমকামিতা প্রকৃতিবিরুদ্ধ না। আমার আরেক বন্ধু বলেছে তার সবথেকে ভালো লেগেছে 'মহাবিশ্বের প্রান ও বুদ্ধিমত্তার খোজে'। এক ছোট ভাই বলেছে তার ভালো লেগেছে 'বিশ্বাসের ভাইরাস'। এভাবে অনেকের সাথেই আমার অভিজিৎ রায় সম্পর্কে আলোচনা হত। কেউ যদি আমাকে জিজ্ঞাস করতো বাংলাদেশে এই মুহূর্তে বিজ্ঞান দর্শন নিয়ে কে বেশি এগিয়ে আমি অভিজিৎ রায়ের কথা বলতাম, খুব সচেতন ভাবেই বলতাম। মনে পড়ছে অভি'দার লেখা মার্ক্সবাদ কে নিয়ে লেখা সেখানে তিনি মার্ক্সবাদ এবং সমাজতন্ত্রের সমলোচনা করেছে, কিন্তু আমি নিজে মার্ক্সবাদী হয়েও সেটি পড়ে অভি'দার প্রতি ঘৃণা জন্মায় নি। কারন সেখানে তিনি তার মত করে যুক্তি দিয়ে লিখেছিলেন। সেই লেখার ৫ বছর পর কলকাতার অশোক মুখার্জি নামে একজন মুক্তমনাই এই লেখার জবাব দিয়েছেন বিস্তারিত ভাবে আমি সেটাও পড়েছি তিনিও অভি'দাকে আক্রমণাত্মক কিছু বলেনি অথচ তিনি মার্ক্সবাদী তাত্ত্বিক। সেই লেখার কমেন্ট বক্সে আবার অভি'দার জবাব দেখলাম অভি'দা তাকে প্রথমে এই বিস্তারিত লেখার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি শুরু করেছিলেন। এখান থেকে শিখলাম কাউকে গালি কিংবা অবহেলা না করেও যুক্তি তর্ক চালানো যায় যদি দুজনেরই সমলোচনা সহ্য করার ক্ষমতা থাকে।

এক ছোটভাই একদিন আমাকে বলে ভাই আমি অভিজিৎ রায়কে কিছু প্রশ্ন করতে চাই করবো কিনা বুঝতে পারছি না। আমি বললাম প্রশ্ন কর দেখো না একবার, সে করলো এমনকি খুব ভালো

ভাবে তাকে উত্তরও দিয়েছে অভি'দা। সে আমাকে ফোন করে বলে ভাই এতো বিখ্যাত মানুষ হয়েও আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে আমিতো অবাক। আমি বললাম হ্যাঁ অবাকই হওয়ার কথা কারন ফেসবুকে অনেকে সেলেব্রিটি হওয়ার পড়ে পাল্টিয়ে যায় এবং অবহেলা করে তার মাঝেও কয়েকজন ভালো মানুষ আছে তাদের দেখে তো অভাক হয়াই ভালো। এমন ছোট খাটো অনেক আড্ডা আলোচনার সাথে জড়িয়ে আছে অভিজিৎ রায়ের নাম। যে নাম কোন দিন মাথা থেকে যাবে না।

২০১৩ সালের শাহবাগ আন্দোলনের সময় অভি'দাকে দেখেছি নিয়মিত খোজ খবর রাখতে এই নিয়ে ফেইসবুকে ব্লগে লিখতে, তিনি দেশে নেই কিন্তু ঐ সময় মনটা ছিল শাহবাগে আমি জোর দিয়ে বলতে পারি। কয়েকদিন পরে 'শহীদ রুমি স্কোয়াড' জামায়াত শিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবীতে আমরন অনশন করেছিলো। তখন অভি'দা একটা ব্লগ লিখেছিল শিরোনাম ছিল এমন "যারা ভোর আনবে বলে কথা দিয়েছিল" সেখানে তিনি লিখেছিলেন তাদের অনশন দেখে সেদিন তিনি লাঞ্চ করেনি কাজের কথা বলে কম্পিউটারের সামনে ছিলেন কলিগরা জাতে না বুঝতে পারে, এমনকি রাতেও খাওয়ার ঠিক আগে তিনি বাসা থেকে বেরিয়ে গিয়েছেন যাতে কেউ কিছু বুঝতে না পারে। আমি লেখাটি পড়ে নীরবে কতক্ষন ছিলাম এবং ভাবলাম দেশর জন্য মানুষের জন্য ভালোবাসা থাকলে যে যেখানেই থাকুক সেই ভালবাসার এতটুকুও কমে যাবে না।

২০১৪ সালের দিকে আমি ভেবেছিলাম অভি'দাকে ফেইসবুকে ম্যাসেজ করবো মুক্তমনায় লিখতে চাই বলে। কারন এখন আমার নিজের উন্নতি হয়েছে, একটু বেশি সময় নিয়ে লিখলে মুক্তমনায় প্রকাশ করা যাবে। এই ভাবনাটা আমার মাথায় ছিল এমনকি আমি দুজনের সাথে বলেছিও কিন্তু আমার ম্যাসেজ দেওয়ায় আগেই চলে গেলেন অভি'দা আমি স্তম্ভিত হয়ে রইলাম, কেন এতো দিন করলাম না। অভি'দা যদি একাউন্ট খুলে দিয়ে যেতো আমি গর্বিত হতাম । কিন্তু তা তো আর হল না!

অভি'দার মৃত্যুর পর যখন শুনলাম তার লাশ হসপিটালে দান করে দিয়েছে তখন অভি'দার প্রতি আরও সম্মান বেড়ে গেল। তিনি দেহ দান করে আরও অনেককেই উৎসাহিত করে গেল। আহমদ শরীফ, আরজ আলী এবং অভিজিৎ রায় এখন একি জায়গায় পৌছে গেল।

অভি'দা বাংলাদেশের তরুণদের একটি আদর্শের নাম, তিনি বেঁচে নেই কিন্তু তার সমস্ত লেখা সংরক্ষন আছে যা আরও হাজার পরেও এর প্রাসঙ্গিকতা যাবে না। যেমনটা যায় নি সক্রেটিস, ব্রুনো এবং গ্যালেলিও'র প্রাসঙ্গিকতা। ব্যাক্তি অভিজিৎ রায় কে হত্যা করলেও তার আদর্শ কে কি মৌলবাদীরা হত্যা করতে পেরেছে? না, পারেনি । পারবে না। অভি'দা বেঁচে থাকলে হয়তো আরও ২০/৩০ টা বই বের হত, কিন্তু এখন আর হবে তবে কি সব থেমে যাবে? না, আরও নতুন নতুন অভিজিৎ আসবে অনন্ত আসবে তারাই আলো চড়াবে সেই আশাই আজ বুকে ধারন করি।

অভি'দা একটা লেখার শেষে মাহমুদুজ্জামান বাবুর একটা গানের কয়েকটা লাইন লিখেছিলেন...

'ভোর হয়নি, আজ হলনা কাল হবে কিনা তাও জানা নেই
পরশু ভোর আসবেই
এই আশাবাস তুমি ভুল না'।

আশাবাদ ভুলি না। আশাবাদ ভুললে তো আর কিছুই থাকবে না। মনে পড়ছে V For Vendetta মুভির একটি কথা "We are told to remember the idea and not the man. Because a man can fail. He can be caught, he can be killed and forgotten. But 400 years later an idea can still change the world."

অভিজিৎ রায় নিজেও জানতেন না তিনি আমাদের কাছে কতটা উঁচুতে পৌছে গিয়েছিলেন। যে মানুষ একাধারে ধর্ম-জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শন-সাহিত্য - রাজনীতি ও ধর্মীয় গোঁড়ামি এতসব বিষয় নিয়ে লিখতে পারেন , সে আর যাই হোক সাধারণ মানুষ না। যে এতো মানুষের মন জয় করতে পারে। যে বিদেশে থেকেও সারাক্ষন ভাবতেন নিজের দেশের কথা। যার এতো প্রতিবা তার শুধু জন্ম দিনই স্মরণ করতে চাই । আর কিছুই মনে আনতে চাই না।

শুভ জন্মদিন
শ্রদ্ধেয় অভিজিৎ রায়।



স্মৃতিতে অভিজিৎদা

আরিফুর রহমান রনী

“বিবর্তনের দৃষ্টিতে নৈতিকতার উদ্ভব” “অনন্ত মহাবিশ্বের খোঁজে” এ দুটি লেখা পড়ে চিন্তাজগতে বড় ধরনের ধাক্কা লাগে। অভিজিৎ দার লেখা দুটি আর্টিকেল পড়ে নতুন ও সত্য জগতটিতে আমার অনুপ্রবেশ হয়। আমাদের প্রজন্মের মহীরুহ অভিজিৎ দা। তাঁর লেখায় আমরা সাহস পেয়েছি, পেয়েছি আলো। আমাদেরকে নিয়ে গিয়েছেন আলো হাতে আঁধারের পথটি পাড়ি দিয়ে অনেকটা পথ। দাদার মৃত্যু এ জাতিকে কয়েক যুগ পিছিয়ে দিয়েছে। ধিক্কার জানাই এ সরকারকে যারা দেশের এই উজ্জ্বল প্রতিভার নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ ও অনীহ। দাদা মৌলবাদী গোষ্ঠীর মূলোৎপাটনে এতটাই অগ্রগণ্য ছিলেন যে তাঁর হত্যার মাস্টারপ্ল্যানে আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় সকল মৌলবাদী গোষ্ঠী ও মৌলবাদী সমর্থকরা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ছিল তা নানা ঘটনায় প্রমানিত।

দাদার লেখা এখনো পড়ছি , তা থেকে ভাবছি, শিখছি ; এভাবেই অভিজিৎ দা আমার মত লাখো পাঠকের মাঝে আলো জ্বালছেন প্রতিনিয়ত।

ইতি
অভিজিৎ দার আলোয় আলোকিত একজন ক্ষুদ্র পাঠক,
আরিফুর রহমান রনী



মুক্তমনার মুক্তো পড়ে মুক্ত বিহঙ্গঃ আলোকিত হওয়ার গল্প

ঔপপত্তিক ঐকপত্য

“যা কিছু হারায়, গিন্নি বলেন, কেষ্টা ব্যাটাই চোর।”

এভাবে কেষ্টা ব্যাটাকে প্রতিবার চুরির দায় দেয়ার ফলাফল কল্পনাতীত সুদূরপ্রসারী! মুহাম্মদ কি কখনো ভেবেছিলেন যে দেড়শো কোটি লোক তার দেখানো পথে চলবে? অন্তত একশো কোটি লোক তার নামে নির্দ্বিধায় নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে দেবে? কিংবা শুধুমাত্র তাকে কটাক্ষ করা হয়েছে বলে নিতান্ত সাধারণ লোকটি রক্তপিপাসু হয়ে উঠবে?

আসলে একই ধরনের চর্চা বারবার করতে থাকলে কিংবা একই ধরনের ঘটনা বারবার ঘটতে থাকলে সেটাকে সত্য বলে মেনে নেয়া ব্যতীত গত্যন্তর থাকে না; একে বইয়ের ভাষায় “অভ্যাসগত সত্য” বলা হয়। এসব চর্চা/ ঘটনা ব্যক্তির ইচ্ছায় হচ্ছে নাকি অনিচ্ছায় সেটা এখানে ধর্তব্য নয়। উদাহরণস্বরূপ “সব ইহুদি-নাসারাদের ষড়যন্ত্র” কিংবা “ইহা সহিহ ইসলাম নহে” বাক্যদ্বয় বহুল প্রচলিত। মোল্লারা ওয়াজ (ইসলামি জলসা) করবেন আর ইহুদি-নাসারাদের দুচারটে গালি দেবেন না তেমনটা সচরাচর ঘটে না। আবার এত এত ফেরকার কোনো একটার ভুলের দায়ও অন্য পক্ষ নেয় না ওটা সহিহ ইসলাম নয় বলে। সমস্যা হলো সুশিক্ষার অভাবে আমাদের দেশে মোল্লারা ধর্মের নামে যা বলে অধিকাংশ লোকেই তা বিশ্বাস করে চোখমুখ বন্ধ করে। কারো নিজ চোখে দেখে নেয়ার ইচ্ছাও জাগে না। কার খেয়েদেয়ে অত সময় আছে যে, সাড়ে ছয় হাজারেরও অধিক আয়াত ও তিরিশ হাজার হাদিস ঘেঁটে সত্যাসত্য নিরূপণ করবে? আর এসব কারণে কুরান-হাদিসে না থাকলেও কুরান-হাদিসের নামে মোল্লারা অনেক কথা বলতে পারেন এবং বলে পারও পেয়ে যান। আমাদের দেশে এ ধরনের ইসলামি জলসা আগে কোনো একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলে বছরে একবার হতো। এখন মাদ্রাসা বাড়ার সাথে পাল্লা দিয়ে এসব জলসার পরিমাণও বাড়ছে। সবচাইতে বড়ব্যাপার হলো এসব জলসার বাইরেও সমাজের বৃহৎ অংশ জুড়ে ধর্ম শিক্ষা দেয়া চলে আসছে যুগের পর যুগ ধরে। আর সেটা হলো মানুষের প্রথম শিক্ষালয় তথা পরিবার।

মানবশিশু জন্মগ্রহণ করে ধর্মহীন হিসেবে। তার প্রমাণ হলো কোনো শিশুকে ছোটবেলা থেকে যদি কোনো নির্দিষ্ট ধর্মের আচার-আচরণ না শিখিয়ে কেবল দৈনন্দিন জীবন পরিচালনার জন্য অবশ্যপালনীয় নিয়ম-কানুন শেখানো হয় তাহলে সে কখনো কোনো অলীক ঈশ্বরের কাছে মাথা নত করবে তো নাই বরং সে এসব কল্পকথা বলে হেসে উড়িয়ে দিবে। একটা বাচ্চা যখন বড় হতে থাকে তখন স্বাভাবিকভাবেই তার মনে নতুন কিছু সম্পর্কে জানার স্পৃহা তৈরি হয়| এই স্পৃহা কিন্তু

কাউকে তৈরি করে দিতে হয়না; জৈবিকভাবেই তার ডি.এন.এ. তে এ সম্পর্কিত নির্দেশনা সেট করা থাকে| আর এটা থাকে বেঁচে থাকার তাগিদেই। মানবশিশু প্রথম যে অঙ্গকে সবচেয়ে বেশি কাজে লাগায় তা হলো মুখ। সে যাই তার সামনে পায় মুখ দিয়ে তার গুণাগুণ বিচার করতে শেখে। এটা প্রাকৃতিক। বিভিন্ন জন্তুকে মায়ের স্তনের অবস্থান চিনিয়ে দিতে হয়না। তারাও কোড কর্তৃক তাড়িত হয়। এখানে এসে হয়তো প্রাচীন মানুষ কাউকে এসব তাড়নার "সেট আপ কারী" হিসেবে ভেবে নিয়ে ধর্মের উৎপত্তি ঘটাতে পারে। করতে পারে কোনো অলীক অবতারের অবতারণা ! কিন্তু আমরা এখন জানি মানুষ যখন সভ্য হতে শুরু করেছে তখন থেকেই ধীরে ধীরে তার জিনের মধ্যে টিকে থাকার স্বার্থে বিশেষ কিছু নির্দেশ ঢুকে গিয়েছে| আমাদের মস্তিষ্কের নিউরন গুলোও একভাবে বিবর্তিত হয়ে চলেছে| এক পুরুষ থেকে পরের পুরুষে যাওয়ার সময় বেঁচে থাকার জন্য অপ্রয়োজনীয় নির্দেশ সমূহ রিজেক্ট করে টিকে থাকার স্বার্থে তুলনামূলক প্রয়োজনীয় নির্দেশসমূহ সংরক্ষণ করে চলেছে প্রতিটি প্রাণীর মস্তিষ্ক।

অনেককেই বলতে দেখা যায় আজকালকার ছেলেপুলেরা অনেক এডভান্স। কেউ কেউ তো একে কলিকালও বলেন! এর কারণটাও কিন্তু সেই জিন থেকে জিনের বয়ে চলা নির্দেশই| অনেকটা ছাকন প্রক্রিয়ার মতো করে এক পুরুষ থেকে পরবর্তী পুরুষে যায় বলে নির্দেশগুলো যথাসম্ভব পরিচ্ছন্ন হতে থাকে| সে কারণেই দেখা যায় দিন দিন আমাদের উত্তর পুরুষদের বিচক্ষণতা বাড়ছে। আমরাও তথ্য - প্রযুক্তিতে বেশ দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছি।

যাহোক, প্রথমে যা বলছিলাম - বাচ্চাদের সেই নতুন কিছু জানতে চাওয়ার পথে যদি বাধার সৃষ্টি করা হয় তাহলে তার বুদ্ধির বিকাশ কি সঠিকভাবে হবে??

বাচ্চা যদি জিজ্ঞেস করে আমাদের বানিয়েছে কে?
আপনি জবাবে বলেন আল্লাহ...
কিন্তু আপনার বাচ্চা যদি জিজ্ঞেস করে আল্লাহকে কে বানিয়েছে?
আপনি জবাবে হয় তাকে ধমক দেবেন নাহয় বলবেন এসব প্রশ্ন করতে নেই...

কিন্তু কেনো করতে নেই? আপনার ধর্ম যদি ইউনিভার্সাল ট্রুথ হয় তাহলে তো তাকে ঘুরে ফিরে সেখানেই আসতে হবে|

একটিবার ভাবুন তো, আমরা কি আমাদের ধর্ম বাছাই করে নিয়েছি?? কয়জন অপরাপর ধর্মসমূহের সাথে তুলনা করে পরে ধর্মে বিশ্বাস করেন?? আসলে আমরা আগে বিশ্বাস করি, পরে সে বিশ্বাসের পেছনে যুক্তি খুঁজি।

মানুষ জানে প্রশ্নের মাধ্যমেই। তাকে যদি সেটাই করতে না দেয়া হয় তাহলে সে জানবে কিভাবে?? ধর্মগুলি যদি স্বতঃসিদ্ধই হয় তাহলে তাদের প্রশ্নবাণে জর্জরিত হতে আপত্তি কিসের?? বেয়াড়া প্রশ্নের উচিত জবাব দেয়াই তো প্রশ্নকারীর থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দেয়ার জন্য যথেষ্ঠ।

এই যে এতকিছু ভাবনা তার কিয়দংশ আমি ভাবার অবকাশ পেয়েছিলাম ছোটবেলা থেকেই। সাধারণ বিজ্ঞান পড়ার সময় জেনেছিলাম শিখার অন্যতম প্রধান উপায় প্রশ্ন করতে জানা। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষককে প্রশ্ন করে বেকায়দায় ফেলতে খুব মজা পেতাম। এসব কারণে অবশ্য কম মার খেতে হয়নি। আমার বাবা ব্যাংকার ও মা গৃহিণী হলেও পরিবারটা বেশ ধার্মিক ছিলো। ছোট ভাই কোরানের হাফেজ। বাবা দুবারের হাজী। আমার খুব মনে আছে পাঁচ বছর বয়স থেকেই বাবা বাড়িতে হুজুর রেখে দিয়েছিলেন আরবি পড়াতে। এক বছরের মাথায় কায়দা শেষে সিপারাও প্রায় শেষ করে ফেলেছিলাম। হুজুর আসতেন বিকালে। আর আমার মন থাকতো খেলার মাঠে। বাপের শাসনের কাছে আমার খেলার ইচ্ছা বারবার মার খেয়ে যাচ্ছিলো। যখন সাত বছরে পৌঁছলাম তখন শুরু বাপের পেছনে নামাজ পড়া। এসব ঝামেলার কাজ অবশ্য তখনও মনে হয়নি বরং হুজুরের কাছে বিভিন্ন আমলের ফায়েদা জেনে মনে মনে হিসাব কষতাম আজ মুনকার মিয়া কতগুলা নেকি লিখেছে! যাকেই সামনে পেতাম সালাম দিতাম। কারণ সালামে ৯০ নেকি। বয়স যখন দশ হলো তখন শুরু হলো অত্যাচার। আমি এমনিতে বেশ ঘুমকাতুরে। সকালের নামাজ পড়ার জন্য যে পরিমাণ টর্চার সহ্য করেছি তাতে মনে হতো এর চেয়ে মরে যাই! বাপের কাজ ছিলো ভোরে বিছানায় থাকতেই মুখে পানির ঝাপটা মেরে সাধের ঘুমের বারোটা বাজানো। চোখ ডলতে ডলতে ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই ফজরের নামাজ আদায় হতো। আরেকটু বড় হওয়ার পর পড়লাম আরেক সমস্যায়। মাসে কয়েকবার স্বপ্নদোষ হতো। লজ্জায় ভোরে গোসল করতে পারতাম না আবার বাপ-মাকে বলতেও পারতাম না। বাপে ঠিকই জলের ঝাপটা দিতো, আমি বের হয়ে মসজিদে না যেয়ে (নাপাক অবস্থায় মসজিদে যাওয়া হারাম) এখানে ওখানে বসে থাকতাম; আধঘন্টা পরে বাসায় ফিরতাম। বাপে জিজ্ঞাসা করতো মসজিদে গিয়েছিলি? বলতাম- হ্যাঁ। বলতো কোন কাতারে (সারি) দাঁড়িয়েছিলিস? আমি তো দেখলাম না। বলতাম অন্য মসজিদে গিয়েছি! সেই থেকে নামাজটাকে এক ধরনের অত্যাচার বলে মনে হতে লাগলো।

এরই মধ্যে আমি এস.এস.সি পাশ করে ফেলেছি। আমার মধ্যে বেশ কয়েকটা বেয়াড়া প্রশ্নও গজিয়ে গিয়েছে। প্রায় বিকালেই বাবা বিভিন্ন ধর্মীয় বই পড়তেন। আমার ভালো লাগতো নবী রাসূলদের জীবনী পড়তে। এসব পড়তে পড়তেই আমার ঈমান ক্রমশ দুর্বল হতে লাগলো। কারণ এসব ঘটনার অধিকাংশই ছিলো অসম্ভব। যেসব জায়গায় খটকা লাগতো, বাবাকে নাহয় স্কুলের ধর্ম শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করতাম। বলা বাহুল্য তারা যেসব উত্তর দিতেন সেগুলো আমার মনঃপূত হতোনা নাহয় তারা বলতেন এতো প্রশ্ন করলে আল্লাহ নারাজ হবেন! আমার তখনকার কিছু বেয়াড়া প্রশ্ন ছিলো এমন:

* মানুষ না হয় জান্নাত বা জাহান্নামে যাবে কিন্তু অন্যান্য প্রাণিসমূহের ব্যাপারে ন্যায়বিচারক আল্লাহ কি ফয়সালা করবেন?? একটা সবল গরু আরেকটা তুলনামূলক দুর্বল গরুকে গুঁতো দেয়ার বিচার আল্লাহ কি করবেন না?

** আল্লাহ তো সব ভাষাই বোঝেন| তাহলে কুরান বাংলায় পড়তে কি সমস্যা? আরবিতে অক্ষর প্রতি এক নেকি হলে বাংলায়ও কি হবে?

*** আল্লাহর চোখে সবাই সমান হলে আমি কেনো সাহাবীদের সময়ে জন্মালাম না?
**** আগে মানুষ মোজেজা দেখে ঈমান আনার সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু আমি তো কোনো মোজেজা দেখছি না। এটা আল্লাহর ন্যায়বিচার হয় কীভাবে?
এসব প্রশ্ন শুনে বাবা আমাকে নিয়ে গেলো এক পীরের কাছে। পীরের নাম মাওলানা ফরিদ উদ্দীন মাসউদ (শোলাকিয়ার ঈমাম)। তিনি আমাকে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে আদর করতে করতে বোঝালেন, “যুক্তিতে মুক্তি নাই বরং উক্তিতেই মুক্তি। আর এই উক্তি হলো স্বয়ং আল্লাহ প্রেরিত পাক কোরান। সব বিষয়ে প্রশ্ন করা ঠিকনা। আল্লাহ এমন এক স্বত্ত্বা যার ব্যাপারে চিন্তা করতে গেলে মানুষ পাগল হয়ে যায়।” আমি পাগল হবার ভয়ে হ্যাঁ-হুঁ করে গেলাম! বাবা ভাবলেন ছেলে লাইনে চলে এসেছে। কিন্তু আমার মনের খুঁতখুঁতানি স্বভাবটা থেকেই গেলো।

আরো বড় হলাম। এইচ.এস.সি পাশ করলাম। নামাজ-রোজা করি ঠিকই কিন্তু পুরোপুরি মন থেকে না। এরই মধ্যে একবার ১০ দিন, একবার ২০ দিন, একবরি ৪০ দিন ও ১০-১২ বার তিনদিনের জন্য আল্লাহর পথেও (তাবলিগ) গেলাম। সেখানে দেখলাম সন্ত্রাসী থেকে শুরু করে চোর-বাটপার সব তাবলিগে যায়! কেউ কেউ আবার স্ত্রী-সন্তানের জন্য যৎসামান্য টাকা রেখে ৪০ দিনের জন্য বেড়িয়ে পড়ে। এ চল্লিশ দিনে স্ত্রী সন্তানরা কী খেলো না খেলো তার কোনো খোঁজখবরই রাখেন না! আমার নানা জীবনের ৪০ টা বছর এই তাবলিগ করে করেই কাটিয়ে দিয়েছেন। দুই মামা, চার মা-খালাকে নানী কীভাবে বড় করেছেন সেটা উনিই জানেন। নানা তার স্ত্রী-সন্তানদের অধিকার কতটুকু পূরণ করেছেন সেটা মা-খালাদের আচরণেই বুঝা যেতো। এতসব দেখে আর ভেবে ধর্মের উপর একটা বীতশ্রদ্ধ ভাব এসে গেলো। চিল্লায় (আল্লাহর রাস্তায় ৪০ দিন) গিয়ে আমি ধর্মীয় বিবিধ বই পড়তে থাকলাম আর মনের মধ্যে প্রশ্নের পাহাড় জমতে থাকলো। তখনো পর্যন্ত ধর্ম নাই এমনটা মানতে মন সায় দিচ্ছিলো না। তাই মনকে প্রবোধ দেয়ার জন্য প্রশ্নের কিছু উত্তরও বের করতে থাকলাম। যেমন-

প্রশ্ন-ক)
আলেম-উলামাগণ বলেন- পবিত্র কুরানে হাজারের উপ্রে বিজ্ঞানময় আয়াত আছে | একই সাথে দুনিয়াতে লাখ লাখ ইসলামী পণ্ডিত , আলেম, রিসার্চার ছিলেন এবং আছেন | তার পরেও বেশিরভাগ বিজ্ঞানী বিধর্মী কেনো? অথবা বিজ্ঞানের বেশিরভাগ আবিষ্কার বিধর্মীদের হাতেই হয় কেনো?

উত্তরঃ
১| মুসলমানগণকে কুরানে ধর্ম-কর্ম করার ব্যাপারে তুলনামূলক বেশি উৎসাহ দেয়ায় তারা বিজ্ঞান চর্চার ব্যাপারে ততটা উৎসাহী নয় | জ্ঞান অর্জনের কথা বলা হলেও গুটি কয়েক আয়াতে বলা হয়েছে বরং আল্লাহর এবাদতের ব্যাপারে জোর দেয়ায় তারা জ্ঞান-বিজ্ঞানে ততটা আগ্রহী নয় | অপরদিকে বিধর্মীরা কুরান রিসার্চ করেই ঐসব আবিষ্কার করে | এজন্যই সব আবিষ্কার কুরানের সাথে মিলে যায়!

২| মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত | আর মুসলমান হলো " আশরাফুল মানুষ" (অর্থাৎ মানুষের মধ্যে সেরা বা শ্রেষ্ঠ!) আল্লাহ বাদবাকি মাখলুক (উদ্ভিদ-প্রাণী) যেমন সৃষ্টি করেছেন মানুষের উপকার বা খেদমত জন্য আর বিধর্মীদের সৃষ্টি করছেন মুসলমানদের উপকার বা খেদমতের জন্য! মুসলমানরা শুধু এবাদতের মাধ্যমে আল্লাহকে রাজী-খুশি রাখবে; তার জীবন ধারণের সুবিধা ও সহজসাধ্য করার জন্য আল্লাহ বিধর্মীদের তো ফিট করে দিয়েছিনই!

সম্পূরক প্রশ্নঃ (১)
বিধর্মীরা কুরান রিসার্চ করেই এই সমস্ত যুগান্তকারী আবিষ্কার করতেছে | বেশ ভালো কথা! কিন্তু কোনো বিজ্ঞানীকেই তো এখনো পর্যন্ত শুনি নাই কোরানকে ক্রেডিট দিতে? বরং যে সকল আবিষ্কার কয়েকশো বছর পুর্বেই হয়েছে আলেমরা সেইসব আবিষ্কার কুরানে খুজেঁ পেতে কয়েকশ বছর লাগিয়েছেন!

সম্পূরক উত্তরঃ
তারা তো কাফির-মুরতাদ! তাই তারা কুরানকে ক্রেডিট দেয়না! সব ইহুদি-নাছারাদের ষড়যন্ত্র! বাকিটুকুর ব্যাপারে মন্তব্য নাই!

সম্পূরক প্রশ্নঃ (২)
আল্লাহ মানুষ ছাড়া বাদবাকি মাখলুক সৃষ্টি করছেন মানুষের উপকারের জন্য- কিন্তু মানুষের অপকার হয় এইরকম মাখলুক হাজার হাজার আছে | এগুলা সৃষ্টির রহস্য কি? উদাহরণস্বরূপ- মশা নামক প্রাণিটা সৃষ্টির মাহাত্ম্য এই অধমের মাথায় কোনোকালেই ঢুকে নাই | বর্ণনায় পাওয়া যায় নমরুদকে ঘায়েল করার জন্য আল্লাহ ঝাঁকে ঝাঁকে মশা প্রেরণ করেছিলেন। যদি তাই হয় তাহলে আল্লাহর কাছে পৃথিবীর মুসলমানরা নমরুদের গজবের কারণ দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে অথচ ইহুদি-কাফিররা মশার অত্যাচারে আক্রান্ত হয়না বললেই চলে- ক্যাম্নে কি?! (বলা বাহুল্য, বিজ্ঞান মশা

উৎপাদনের জন্য বদ্ধ জলের কথা বলে) | আর বিধর্মীদের যদি মুসলমানদের উপকারেই সৃষ্টি করা হয় তাহলে "দুনিয়া মুমিনের জন্য কষ্টের জায়গা" হলো কীভাবে?

উত্তরঃ
আমার জানা নাই! (কেউ জানলে দয়া কইরা জানাইয়েন |)

প্রশ্ন- খ)
সবই না হয় বুঝলাম- কাফির বিজ্ঞানীরা ক্রেডিট না দিক, যখন তারা কোরান রিসার্চ করে তখন তো তারা জান্নাতের সীমাহীন আমোদ-ফূর্তি আর জাহান্নামের অবর্ণনীয় কষ্টের কথাও পড়ে | আপনি যদি জানেন যে, আপনার আজকের এই কাজের জন্য ভালো ফল আর ঐ কাজের জন্য খারাপ ফল পাবেন সেক্ষেত্রে কোন বেকুব আছে যে খারাপ ফলের দিকে ধাবিত হবে? নিজের বুঝ তো পাগলেও বোঝে!

উত্তরঃ
আরে! আপনি তো আসলেই বোকা! তারা তো দুনিয়া পাইলেই খুশি! আর ইসলাম মানতে গেলে তো আপনারা দুনিয়ায় আকাম করতে পারবেন না, নাইট ক্লাবে যেতে পারবেন না, বেগানা মেয়ে দেখতে পারবেন না, মদ খেতে পারবেন না, জেনা করতে পারবেন না | তারা দুনিয়ার এই আয়েশই পেতে চায়! পরেরটা পরে দেখা যাবে ভাব আর কি! আর কুরানে স্পষ্ট লেখা আছে, হেদায়েতের মালিক আল্লাহ; আল্লাহ না চাইলে আপনি নিজের ইচ্ছায় ঈমানদার হতে পারবেন না | আল্লাহ তাদের কান, চোখে সীসা ঢেলে দিয়েছেন আর অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন | তারা কোনোদিনই ঈমান আনবে না!

সম্পূরক প্রশ্নঃ
তাইলে তো দেখা যাচ্ছে সব দোষ আল্লাহর! তারা কি এমন অপরাধ করেছিলো যে তারা মুসলমান ঘরে না জন্মা নিয়ে বিধর্মী জন্ম নিলো? আল্লাহর সাথে তাদের কী এমন শত্রুতা যে তিনি তাদের কানে, চোখে নিজ হাতে সীসা ঢেলে দিয়েছেন; অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন?

উত্তরঃ
তাদের আল্লাহ বিবেক দিয়েছেন | জ্ঞান হবার পর সে যদি সঠিক ধর্ম খুঁজতো তাহলে ঠিকই শান্তির ধর্ম ইসলামের সন্ধান পেতো!!! আর এটা তাদের কর্মফল!! ঐ যে বললাম না- তারা আখিরাত চায় না, দুনিয়া চায়! এ ব্যাপারে আল্লাহই ভালো জানেন!

সম্পূরক প্রশ্নঃ
আরে ভাই আমি কি করবো না করবো সেইটা তো আল্লাহ নিজেই ঠিক কইরা রেখেছেন আমার জন্মেরও হাজার হাজার বছর আগে | তাহলে দোষটা আমার হলো কীভাবে? আল্লাহর ইশারা ছাড়া যদি গাছের পাতাও না নড়ে তাহলে (আমি যদি বিধর্মী হই) সেই আল্লাহর ইশারা ছাড়া আমি বুঝবো কীভাবে যে আমাকে কোন ধর্ম সত্য ধর্ম সেটা খুঁজতে হবে???

উত্তরঃ
আল্লাহ আপনাকে বিবেক-বুদ্ধি দিয়েছে, সর্বশ্রেষ্ঠ জীবন বিধান দিয়েছে | আপনি বিধর্মী হলেও কোনো না কোনো সময় আপ্পার কাছে সত্য পথের দাওয়াত আসছে বা আসবে! সেই দাওয়াত কবুল করে সেই মত চলার দায়-দায়িত্ব সম্পূর্ণ আপনার!

সম্পূরক প্রশ্নঃ
একটু আগেই বললেন "সব কিছু আগে থেকেই ঠিক করা- সব আল্লাহর তরফ থেকেই হয়" এখন আবার বলছেন "বুদ্ধি-বিবেক দিয়া চলার কথা" - পুরো ব্যাপারটা কি স্ববিরোধীতা নয়??

উত্তরঃ
আল্লাহ ক্বাদিরুন- মহাজ্ঞানী | তিনি আগেই জানতেন আপনি কিরকম হবেন! তিনি সেই মতই সব ঠিক করে রেখেছেন! সব কিছুর ব্যাপারে তিনিই ভালো জানেন!

এ যেনো "থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়" অবস্থা। বেশিরভাগ ধর্মীয় বিতর্ক-বাহাস এ পর্যায়ে এসে অমীমাংসিতভাবে শেষ হতো। এ চক্র থেকে বেরুবার কোনো উপায় খুঁজে পেতাম না। দিন যেতে লাগলো। আমার মনেও প্রশ্ন জমতে লাগলো। এ সময়টা যে আমি কীরকম অস্থিরতার মধ্য দিয়ে পার করেছি তা কেবল আমি জানি! একেবারে "কইতে নারি, সইতে নারি" অবস্থা। আরো কতিপয় অমীমাংসিত প্রশ্নঃ

১.
আমাদের দেশের যানবাহনসমূহে "আল্লাহর নামে চলিলাম" লেখাটি দেখেননি এমন লোক খুব কম আছে বোধ করি। আবার কিছু কিছু যাহবাহনে তো আরো একধাপ এগিয়ে যাত্রার সময় যাত্রা যেনো নিরাপদ হয় তার দোয়াঃ "বিসমিল্লাহি মাযরেহা ওয়া মুরছাহা ইন্না রাব্বি লা গাফুরুর রাহীম" লেখা থাকে। এখন আমার প্রশ্ন হলো- আল্লার নাম নিয়া যাত্রা শুরু করার পরও যদি যাত্রা অশুভ হয় অর্থাৎ দুর্ঘটনার শিকার হতে হয় তাইলে আল্লার নামের কোনো মর্তবা থাকলো কি?? কেউ যদি বলেন যে,

যা হওয়ার কথা অরথাৎ যা লাওহে মাহফুযে লিপিবদ্ধ করা আছে তা তো হবেই! তাহলে আমি বলবো- তাইলে শুধুশুধুই যাত্রার সময় আর আল্লার উপর ভরসা করে কী লাভ??

২.
ভালো কাজসমূহ ডান দিক থেকে বা ডান হাত দিয়ে বা ডান পা দিয়ে শুরু করতে হয় আর খারাপ কাজসমূহ তার উল্টো। এসব কুসংস্কারের আদৌ কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি কি আছে?? থাকলে সেটা কি??

৩.
অন্তরের রোগ নিয়ে ইসলামী স্কলারেরা বহু কিতাব লিখেছেন। আমার ধারণা মুসলমান মাত্রই সেসব কোনো না কোনো কিতাব পড়েছেন। তাছাড়া পীর সাহেবদের সহবতে মানুষ যায়ই অন্তর\ দিল\ ক্বালবের জং দূর করে শুদ্ধতম ব্যক্তি হতে। আমার নিজেরও সেরকম একজন পীরের সান্নিধ্যে বাধ্য হয়ে আসতে হয়েছিলো (ওনার কথা আগেই বলেছি)। তিনি আমার অন্তরের রোগ দূর করতে আমাকে একটা আমল দিয়েছিলেন। প্রতিদিন সকাল-বিকাল ১০০ বার সুভান আল্লাহ, ১০০ বার আলহামদুলিল্লাহ, ১০০ বার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ১০০ বার আল্লাহু আকবার ও যে কোনো দরূদ ১০০ বার। তিনি নাকি মোহাম্মদের বংশধর; একটি কাগজে তার নাম থেকে শুরু করে মোহাম্মদ পর্যন্ত পুরুষদের পর্যায়ক্রমিক নাম লেখা ছিলো। তিনি আমাদের পরিবারের বেশ কাছের লোক। আমাদের বাড়িতে তিনি এ পর্যন্ত তিন-তিনবার তাশরীফ রেখেছেন।

এখন আমার প্রশ্ন হলো- আসলে ক্বালব জিনিসটা কি?? আমি যতদূর জানি মানুষ মস্তিষ্ক দিয়ে ভাবনা-চিন্তা করে! সুতরাং, রোগ হলে মস্তিষ্কের নিউরনসমূহের হতে পারে! তাহলে জ্ঞানী ঐসব আলেমদের " অন্তরের রোগ" সারাবার মানে কি?? তারা তো ঐশীবাণী কোরান পড়েই আলেম হয়েছেন। তার মানে পরম জ্ঞানী আল্লাও ক্বালব বলতে যে আসলে কিছু নাই সেটা জানতেন না?? হাউ ইজ ইট পসিবল??

৪.
ছবি তোলা ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম। তাহলে হাজীরা যে ভিসা-পাসপোর্টে ছবি দেন সেগুলো যায়েজ হয় কীভাবে?? কিংবা জাকির নায়েক যে রীতিমতো একটা চ্যানেল খুলে বসে আছেন (ভিডিও হলো অসংখ্য স্থিরচিত্র বা ছবির মেলবন্ধন) সেটা যায়েজ হয় কীভাবে?? তাছাড়া জাকির মিয়ার ইসলামিক টিভিতে কয়দিন আগে দেখলাম আধুনিক টেকনোলজির সমন্বয়ে একটা মোবাইলের (পিস বা শান্তি মোবাইল) বিজ্ঞাপন দিতে যা ইসলামিক টিভির পক্ষ থেকে বাজারে ছাড়া হয়েছে। বলা বাহুল্য সেটায় ক্যামেরা (ফ্রন্ট ও ব্যাক উভয়ই) তো আছেই এমনকি সেটা থ্রিজি সাপোর্টেড। সেই ক্যামেরা দিয়ে

ছবি তুললে কি সেগুলো যায়েজ হবে?? মোবাইলটির দাম প্রায় ২৮ হাজার টাকা। আঠাশ হাজার টাকা খরচ করে মোবাইল কেনাটা কি অপচয় নয়??

৫.

মানুষের জন্ম-মৃত্যু সব আল্লার হাতে। কিন্তু বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে মানুষের মৃত্যুহার (বিশেষ করে প্রসূতিকালীন মাতৃ ও শিশু মৃত্যু) অনেক কমে গেছে। তাহলে আল্লার সাথে আধুনিক টেকনোলজীর কি "কোল্ড ওয়ার" চলছে নাকি?! বলা বাহুল্য যে ওয়ারে আল্লার পরাজয়ের হার দিন দিন বেড়েই চলছে! কে জানে! যেভাবে বিজ্ঞান এগিয়ে চলছে তাতে হয়তো আগামী শতাব্দীতেই আল্লাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে তিনি আযরাইল সাহেবকে বরখাস্ত করবেন নাকি নতুন কাজে নিয়োগ দিবেন!!

ডাক্তাররা আল্লার সাথে মুখোমুখি চ্যালেঞ্জে নেমেছেন বললে কি অত্যুক্তি হবে?? আমার ধারণা, ডাক্তাররা নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতেই "জন্ম-মৃত্যু সব আল্লার হাতে" টার্মটা ব্যবহার করেন! আমার বোধগম্য হয় না ডাক্তার এতো কষ্ট করে অপারেশন করে একটা রোগীকে বাঁচাবার পরেও সমস্ত ক্রেডিট আল্লার হয় কিভাবে?? সম্ভবত ভুল অপারেশনে রোগী মরলেও যাতে ডাক্তারের কাঁধে দোষটা না আসে তাই ডাক্তাররা নিজেদের ক্রেডিটকে স্বেচ্ছা নির্বাসনে পাঠিয়েছেন!

তাবলিগে গেলে অনেকেই বলতো তারা মুহাম্মদকে স্বপ্নে দেখেছে! আমার তখন মনে মনে প্রশ্ন জাগতো! প্রথমত, যে লোককে আপনি আগে কখনো দেখেননি তাকে চিনবেন কী করে? দ্বিতীয়ত, যদিওবা সে নিজেই নিজের পরিচয় দেয় তথাপি তিনি যে অসত্য বলছেন না তার নিশ্চয়তা আছে কি? যেখানে কথিত আছে শয়তান খোদ মুহাম্মদকে ধোঁকা দিয়ে আল্লাহর অজান্তে (জানলে তিনি নিশ্চয়ই এমনটা হতে দিতেন না) তিন তিনখানা আস্ত আয়াত নাযিল করিয়ে ফেলে সেখানে আমরা তো নস্যি!

যাহোক, এরই মধ্যে হাতে এলো জাভা ফোন (নোকিয়া-৬১২০ ক্ল্যাসিক)। আন্তর্জালের অবারিত দুনিয়ায় ঢুকলাম। সময় কেটে যাচ্ছিলো ফেসবুকে। ফেসবুকে দুয়েকটা পেজ চালাতাম। সেসব পেজে কৌতুক পোস্ট করতাম। ঘটনাচক্রে একদিন রস+আলোর লেখক আলিম আল রাজির সাথে ইনবক্সে আলাপ হলো। জাহিদ নামে আরেকটা ছেলের সাথেও আলাপ হতো ইনবক্সে। কথায় কথায় ওনাদের সাথে ধর্মের ব্যাপারে কথা উঠলে ওনাদের কোনো একজন অথবা উভয়েই মুক্তমনার কথা বললেন। এদিকে "আমরা সত্য কথা বলি তাই আমরা বেয়াদব" নামের একটা ফেসবুক পেজেও ধর্মের বিরুদ্ধে যুক্তি দিয়ে লিখা হতো। সেখান থেকেও কিছুটা ধারণা পেলাম। অবশেষে সব দ্বিধা ঝেড়ে একবুক কাঁপুনি নিয়ে মুক্তমনায় ঢুকলাম। পড়লাম বোকা মেয়ের ৬০ টি প্রশ্ন, ১৯ এর মিরাকল, অভিদার বিজ্ঞানভিত্তিক লেখা, ভবঘুরের মোহাম্মদ ও ইসলাম সিরিজ, তামান্না ঝুমুর উপর

নাজিলকৃত আয়াত, আকাশ মালিক, কাসেম, ফরিদ আহমেদ এর লেখাসহ আরো ক ত কী! তখন আমার মনে হচ্ছিলো যেনো আমি হীরার খনি হাতে পেয়েছি। তখন লেখা আসতো কম কিন্তু লেখাগুলোর মান ছিলো অসাধারণ। চাতক পাখির ন্যায় বসে থাকতাম কবে পাবো নতুন লেখা। বলা বাহুল্য আমাদের গ্রামে তখন নেটের স্পিড ছিলো খুবই কম। মুক্তমনার বড় বড় লেখাগুলো মোবাইলে লোড হতোনা। নেট স্পিড পাওয়ার জন্য টয়লেটের ছাদ, পেয়ারা গাছের ডাল, নদীর পাড় কিছুই বাদ রাখিনি। আমার পুরো নেশা ধরিয়ে দিয়েছিলো মুক্তমনা। বেশ অনেকগুলো প্রশ্নের জবাব যখন পাচ্ছিলাম তখন নিজেকে বিশ্বের সেরা সুখীদের একজন মনে হচ্ছিলো। আবার যখন দেখতাম আমার কোনো প্রেডিকশন সেখানকার কারো লেখার সাথে মিলে গেছে তখন রীতিমতো নেচে উঠতাম! মুক্তমনার এরকম মুক্তোসম লেখা পড়ে আমি মুক্ত বিহঙ্গ হয়ে বিজ্ঞানাকাশে উড়তে সক্ষম হয়েছিলাম। আমার সংশয়ী দৃষ্টিকে নাস্তিকীয় দৃষ্টিতে রূপান্তরে মুক্তমনার ভূমিকা অনস্বীকার্য।

তবে কষ্টকর ব্যাপারগুলোরও গোড়াপত্তন হলো তখন থেকেই। আগে তাও মাঝেসাঝে নামাজ পড়তাম। এবারে একেবারেই ছেড়ে দিলাম। বাসা থেকে চাপ আসতে লাগলো। আমি একা হয়ে পড়তে লাগলাম। ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের থেকে দূরে সরে এলাম; কারণ যদি মুখ ফসকে কোনো ধর্মবহির্ভূত কথা বেড়িয়ে আসে! আমার নোকিয়া ৬১২০ ক্ল্যাসিক হয়ে উঠলো আমার সবচেয়ে কাছের বন্ধু। তারপর চাকুরি হলো, বাসায় পিসি এলো। ২০১৩ সাল থেকেই আমার ব্লগে এক-আধটু লিখতাম। মুক্তমনায় লেখার খুব লোভ ছিলো। কিন্তু আমার লেখা মুক্তমনায় ছাপা হবে কীনা সেটা নিয়ে দোটানায় পড়ে যেতাম বলে আর লেখা দেয়া হতো না। একদিন ফেসবুকে অভিদাকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠালাম। তিনি একসেপ্ট করলেন। সবচেয়ে আশ্চর্য হলাম এটা জেনে যে তিনি বললেন আপনি ওয়াচে আছেন! আমি বললাম লেখা পাঠাবো? তিনি সম্মতি দিলেন। আর কী আশ্চর্য! দুদিনের মাথায় আমার সদস্যপদও হয়ে গেলো।

যেদিনই সারারাত জেগে কোনো লেখা লিখি সেদিনই মনে পড়ে দাদাকে। কারণ যেদিনই সারারাত জেগেছি সেদিনই ভোরের দিকে অভিদার সাথে ফেসবুক চ্যাটে কথা হতো। তাঁর মতো অমায়িক লোক আমি কমই দেখেছি। একটা ঘটনা বলে লেখার ইতি টানছি। আমি বেশিরভাগ সময় বাইরে থাকি বলে মোবাইলেই নেট ব্রাউজ করতে হয়। একদিন ভোরে দাদাকে নক দিয়ে বললাম, একটা রিকোয়েস্ট ছিলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কী?" আমি বললাম মুক্তমনাকে মোবাইল ফ্রেন্ডলি বানানো যায় না?(আগে মোবাইল থেকে মুক্তমনা সদস্যরা লগ ইন করতে পারতেন না) তিনি শুধু বললেন টেকি টিমের সাথে কথা বলে দেখি। পরের দিন তিনিই নক দিয়ে বললেন দেখুন তো! দেখলাম মোবাইল থেকেও লগইন করা যাচ্ছে। আমি সেদিন এতো খুশি হয়েছিলাম যা ভাষায় প্রকাশ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। মুক্তমনা আসলে কেমন হয় তা ড. অভিজিৎ রায়কে দেখে শেখা উচিত। আমি যতদিন বেঁচে থাকবো ওনার বদান্যতার কথা ভুলবো না।।



অভিজিৎ রায়ঃ
অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজে এক আলোকবর্তিকার প্রতিচ্ছবি

রুশো আলম

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন একবন্ধুর মাধ্যমে প্রথম মুক্তমনা ব্লগের সঙ্গে পরিচিতি হয় এবং এটিই ছিল আমার প্রথম ব্লগ সম্পৃক্ততা। এর আগে কোন ব্লগের সঙ্গেই আমার কোন সম্পর্ক ছিল না। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হলেও প্রকৌশল তথা বিজ্ঞানের প্রতি আমার তেমন একটা আগ্রহ ছিল না বললেই চলে। এর চেয়ে যুক্তিবাদ, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস এসবই টানত বেশি। এর বাইরে ক্রীড়াপ্রেমী ছিলাম। অবসর সময়ে ফুটবল, ক্রিকেট, টেবিল টেনিস এসব নিয়েই থাকতাম। ছোটবেলায় ধার্মিক থাকলেও বয়স যতই বেড়েছে ধর্ম, সৃষ্টিতত্ত্ব, আত্মা সহ নানা বিষয় নিয়ে এক ঝাঁক প্রশ্ন কাজ করত মাথায় কিন্ত কোন প্রশ্নেরই গ্রহণযোগ্য উত্তর খুঁজে পেতাম না। উল্টো প্রশ্ন করলে ধার্মিকদের কাছ থেকে "সব বিষয়ে প্রশ্ন করতে নেই", "যারা বিজ্ঞান অল্প জানে তারাই হয় নাস্তিক" এই টাইপের কথাও শুনতে হত। মনের গহীনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে সন্দেহ দানা বাধলেও তাই একেবারে শৈশব থেকে গড়ে উঠা ধর্মীয় বিশ্বাস গুলোকেও পুরোপুরি ত্যাগ করতে পারতাম না।

মুলত সন্দেহ আর বিশ্বাসের এক ধরনের দোলাচলের মধ্য দিয়ে কাটতো সে সময়ের দিনগুলো।

একদিন কিভাবে কিভাবে যেন আরজ আলী মাতুব্বরের "সত্যের সন্ধানে" বইটি হাতে পাই। এক নিশ্বাসে পড়ে ফেলি সেটি। দীর্ঘ দিন ধরে মনের মধ্যে লালিত অনেক ভ্রান্ত বিশ্বাসকে তীব্র ভাবে আঘাত করে বইটি। আরজ আলী মাতুব্বরের লেখা এই বই পড়েই প্রথম ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে সন্দিহান হয়ে পড়েছিলাম। তথাকথিত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাবিহীন একজন মানুষের এত উচ্চমানের দর্শন চিন্তা দেখে সেসময় অবাকও হয়েছিলাম খুব। মূলত এরপর থেকেই তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব ও ঈশ্বর দর্শন নিয়ে আমার আগ্রহ জন্মায়।

একসময় হুমায়ূন আজাদ, প্রবীর ঘোষ সহ বেশ কিছু মুক্তচিন্তক লেখকদের বই পড়েছি। হুমায়ূন আজাদের "আমার অবিশ্বাস" এবং প্রবীর ঘোষের "অলৌকিক নয় লৌকিক" এই দুটো বই আমার জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই দুটো বই আমার চিন্তা ভাবনাকে এক লাফে এগিয়ে নিয়েছিল অনেক দূর। এর বাইরেও মাঝে মধ্যে নিজের আগ্রহেই দর্শন, ধর্মত্ত্ব সহ নানা বিষয়ের উপর বাংলা ভাষায় লেখা বইপত্র খুজতাম। কিন্ত আগ্রহ থাকা স্বত্তেও খুব বেশি বই খুঁজে পাইনি। তাছাড়া সব সময় টাকা দিয়ে বই কেনার সামর্থ্যও সেসময় ছিল না। ফলে মুক্তমনা ব্লগের সন্ধান পাওয়া ছিল আমার কাছে রীতিমত আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়ার মত ব্যাপার। বাংলা ভাষায় এত তথ্য সমৃদ্ধ লেখা আর যুক্তি

তর্ক করার এই আদর্শ প্লাটফর্মটির সঙ্গে কেন আরো আগে পরিচয় হয় নি তা নিয়ে সে সময় জন্ম নিয়েছিল প্রচন্ড আফসোস। মূলত এরপর থেকেই মুক্তমনার সঙ্গে নিয়মিত পথ চলা শুরু।

মুক্তমনা ঘাটতে গিয়েই প্রথম এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক অভিজিৎ রায়ের লেখার সঙ্গে পরিচয় হওয়া। অভিজিৎ রায়ের কোন লেখাটি সর্ব প্রথম পড়েছিলাম তা মনে নেই তবে এটি মনে আছে প্রথম লেখাতেই মনের মাঝে মুগ্ধতার এক অদ্ভুত আবেশ ছড়িয়ে ছিলেন তিনি। দর্শন, বিজ্ঞানের মত কাঠখোট্টা বিষয়গুলো যে এত প্রাঞ্জল ভাষায় লেখা যায় সেটা প্রথম ধারনা হয় তার লেখা পড়েই। এরপর যতই দিন গেছে তার লেখার প্রতি মুগ্ধতা দিন কে দিন বেড়েছে। বিবর্তনবাদ , মহাবিশ্বের উৎপত্তি, ধর্মের অসারতা , মুক্তিযুদ্ধ , উপজাতিদের অধিকার, মাঝে মধ্যে অবাক হয়ে ভাবতাম কোন বিষয়েই বা তিনি লেখেননি । আত্মা বিষয়ক তার একটি ধারাবাহিক লেখা পড়েছিলাম যেটি ছিল এক কথায় মাষ্টারপিস। অনেক প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাই তার সেই লেখাটির মাধ্যমে। "ডারউইন দিবস", "কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশন" এবং "কেন কোন কিছু না থাকার বদলে কিছু আছে" শীর্ষক লেখা গুলোও ছিল এক কথায় অসাধারন। তার লেখা শুধু মনের মাঝে দীর্ঘ দিন ধরে লালিত প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে পেতেই সহায়তা করেনি, অনেক বিষয়ে আমার দৃষ্টিভঙ্গিকে রীতিমত পাল্টে দিয়েছে।

এক সময় অন্য অনেকের মত আমিও সমকামীদের নিয়ে বিরুপ মনোভাব পোষণ করতাম। কিন্ত সমকামীতা যে মোটেও প্রকৃতি বিরুদ্ধ কিছু নয় , সমকামীদেরও যে আমাদের সমাজে পূর্ণ অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে এই বিষয়ে নুতুন করে ভাবতে শেখায় অভিজিৎ রায়ের লেখাগুলি। দেশপ্রেম বিষয়ক তার একটি লেখার কথাও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। এভাবেই একটু একটু করে অভিজিৎ রায়ের লেখার প্রতি মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ি। এর বাইরে বিপ্লব পাল, বন্যা আহমেদ , ফরিদ আহমেদের লেখাও ভাল লাগতো। মূলত মুক্তমনা লেখকদের লেখালেখিতেই ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়ীকতা, কুসংস্কারের বেড়াজাল ছিড়ে একটু একটু করে এগোতে থাকি আলোর পথে। এক পর্যায়ে আবিস্কার করি বিজ্ঞানের কাঠখোট্টা বিষয় যেগুলোর প্রতি আমার কোন কালেই আগ্রহ ছিল না, সেগুলোর প্রতিও কিভাবে কিভাবে যেন আগ্রহ ফিরতে শুরু করেছে। বিজ্ঞানের প্রান্তিক বিষয়গুলো পড়তে যেন আবারো আনন্দ পেতে শুরু করি। আজ বিজ্ঞানের প্রতি আমার যতটুকু আগ্রহ তার প্রায় অনেকটাই অভিজিৎ রায়ের কৃতিত্ব।

বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্মত্বত্ত সহ নানা বিষয়ে অভিজিৎ রায়ের অগাধ পান্ডিত্য যেমন মুগ্ধ করত তেমনি নিজের জ্ঞানের দৈন্যতার কারনে তার সামনে এক ধরনের হীনমন্যতায় ভুগতাম। এই হীনমন্যতার কারনে মনে অনেক প্রশ্ন থাকা স্বত্তেও সেগুলো তাকে করা হয়নি। এই হীনমন্যতা কাটতে সময় লেগেছিল অনেক দিন। তারপর ওনার কিছু লেখায় মন্তব্য করে আলোচনায় অংশ নিয়েছিলাম কিন্ত সেটিও খুব বেশি নয়। ইচ্ছে ছিল তার সঙ্গে অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা করার। কিন্ত কে জানত

ধর্মান্ধতায় আচ্ছন্ন এই বাংলাদেশে এই মানুষটি অত্যন্ত স্বল্পায়ু নিয়ে জন্মেছিলেন। তার সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে পরিচিত না হওয়ার এই আক্ষেপ সারা জীবনই আমার সঙ্গী হবে।

ব্যক্তি অভিজিৎ রায় সম্পর্কে আমার খুব একটা জানাশোনা ছিল না। তবে দূর থেকে যতটুকু পর্যবেক্ষণ করেছি তাতে তার একটি বিষয় আমাকে খুবই অভিভূত করেছে। সেটি ছিল তার নিরহংকার। এত জনপ্রিয় হবার পরও তার মধ্যে কখনো বিন্দুমাত্র অহংকার দেখিনি। জনপ্রিয়তা যে অধঃপতনের পথে প্রথম ধাপ এই বিষয়ে পূর্ণ সচেতন ছিলেন তিনি। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা দরকার। ২০১৩ সালের শাহবাগ আন্দোলন ছিল স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। অন্তর্জালে দীর্ঘ দিন ধরে চলা বাংলা ব্লগ আন্দোলন রীতিমত লাইম লাইটে চলে আসে এই আন্দোলনের মাধ্যমে। ফলশ্রুতিতে কিছু ব্লগারও রীতিমত তারকা খ্যাতি পায়। বিখ্যাত হবার পর তাদের অনেকের আচরন বদলে যেতে দেখেছি। অনেকে আবার ব্লগ ছেড়ে ফেসবুকে মিনি ষ্ট্যাটাস লেখাকেই তাদের লেখালেখির প্রধান সম্বল বানিয়ে নেয়। কিন্ত অভিজিৎ রায় ছিলেন এদের মাঝে উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। ফেসবুকের সস্তা জনপ্রিয়তার মোহ ত্যাগ করে ব্লগে বিস্তারিত লেখা এবং আলোচনাকেই তিনি উপযুক্ত বলে মনে করতেন।

শত ব্যস্ততার মাঝেও তাকে ব্লগে নিয়মিত সময় দিতে দেখেছি, দেখেছি অনেক অর্থহীন তর্ক বিতর্কে ধৈর্য সহকারে অংশ নিতে। ধর্মান্ধদের ব্যক্তি আক্রমন, হুমকি-ধামকি কোন কিছুই তাকে টলাতে পারেনি তার আদর্শ থেকে। তিনি সম্ভবত জিওর্দানোব্রুনো , কোপার্নিকাস সহ যে সকল বিজ্ঞানী, মানবতাবাদীগণ ধর্মান্ধদের অত্যাচার নিগ্রহের শিকার হয়েছেন তাদের দ্বারা প্রবল ভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন। এই প্রবল অনুপ্রেরণাই ছিল তার লেখালেখির অফুরান উৎস। আদর্শিক দৃঢ়তা, নিরহংকার আর মাটিতে পা রাখার এই আশ্চর্য ক্ষমতাই তাকে অন্যদের চেয়ে আলাদা করেছে। তবে পারভেজ আলমের সঙ্গে তার “সালাফী সেক্যুলার” শীর্ষক বিতর্ক যে কদর্য ব্যক্তি আক্রমনে রুপ নিয়েছিল সেটি মোটেও ভাল লাগে নি। অভিজিৎ রায় যিনি এদেশের অনেক মানুষের কাছে আদর্শ তার কাছে এই জাতীয় আচরন মোটেও প্রত্যাশিত ছিল না।

মুক্তমনা ব্লগটিই ছিল অভিজিৎ রায়ের প্রধান ধ্যান জ্ঞান। ফলে অভিজিৎ রায়ের অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যু ছিল মুক্তমনার জন্য অনেক বড় আঘাত। সে সময় মুক্তমনার ভবিষ্যৎ নিয়ে ব্যক্তিগতভাবেও কিছুটা সংশয়ের মধ্যে ছিলাম। এরই মাঝে মুক্তমনায় উগ্র নাস্তিকতা বনাম ভদ্র নাস্তিকতাকে কেন্দ্র করে যে বিভাজনটা তৈরী হল সেটিও ছিল সম্পূর্ণ অনাকাঙ্ক্ষিত। মানছি যে সে সময়ের প্রেক্ষাপটে মাননীয় মডারেটর কিছু কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কিন্ত মত প্রকাশের স্বাধীনতা তথা মন্তব্য মডারেশনের ব্যাপারে মডারেটর আরো সহনশীল হবেন বলেই প্রত্যাশা করছি। সেই সঙ্গে অভিজিৎ রায়ের লেখা গুলোকে কি করে আরো বৃহৎ পরিসরে ছড়িয়ে দেয়া যায় সেটাও ভেবে দেখার অনুরোধ করছি।

গ্যালিলিও বলেছিলেন-" You cannot teach a man anything, you can only help him find it within himself."

অভিজিৎ রায়ের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব এটাই যে তিনি আমার মত হাজারো তরুনের মনের মাঝে জ্ঞানের আলোকে প্রজ্জ্বলিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি সবকিছুকে অবিশ্বাস করতে বলেছেন , প্রশ্ন করতে শিখিয়েছেন, তিনি তার তীক্ষ ভাবনা চিন্তাগুলোকে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন হাজারো মানুষের মাঝে। পরিশেষে একটি কথাই বলতে চাই , দাদা আপনি জানেন কিনা জানি না আপনি আমার মত হাজারো তরুণের জীবন দর্শনকে পাল্টে দিয়েছেন, মন থেকে প্রতিক্রিয়াশীলতার সর্বশেষ চিহ্নটিকেও মুছে ফেলেছেন, সর্বোপরি এই মহাজগতটাকে উপলব্ধি করতে শিখিয়েছেন নুতুন করে। একজন মানুষের জীবনে এর চেয়ে বড় স্বার্থকতা আছে বলে মনে করি না। জেনে রাখবেন ধর্মান্ধতা ,সাম্প্রদায়ীকতা, কুপমন্ডকতার বিরুদ্ধে বিজ্ঞানমুখী প্রগতিশীল সমাজ গঠনের যে আন্দোলন আপনি শুরু করেছিলেন সেই আন্দোলন কোন ধর্মান্ধের ক্ষণিকের আঘাতে কখনোই থেমে যাবে না বরং আবারও ফিরে আসবে নুতুন উদ্যমে। ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার, প্রতিক্রিয়াশীলতায় আচ্ছন্ন আমাদের এই অন্ধকার সমাজে আপনি ছিলেন সময়ের চেয়ে অনেক বেশি আধুনিক , ছিলেন একজন সত্যিকারের এক আলোক যাত্রী।



যে আলো ছড়িয়ে গেলো সবখানে

ডারউইনের বিপজ্জনক ধারণা

ধর্ম সম্পর্কে নিজের দ্বিধার কথা জানিয়ে আর এ থেকে উত্তরণের পরামর্শ চেয়ে এক বন্ধু ফেসবুকে খুদেবার্তা পাঠালো। গৎবাঁধা নিয়মে ড. অভিজিৎ রায় আর মুক্তমনার অন্যান্য লেখকের লেখা সুপারিশ করলাম। তারপর অনেকদিন কোনো খবর নেই তাঁর। প্রায় সাড়ে পাঁচ মাসের মাথায় বার্তা পাঠালো, "বন্ধু, ধর্মের ভুত অনেকটাই দুর্বল হয়ে গেছে। তারপরও মাঝে মাঝে মাথা চারা দিয়ে উঠতে চায়। কুরআনের ভুল আয়াত গুলির বিজ্ঞান ভিত্তিক সমালোচনা গুলো আমার ভেতরকার ধর্মের ভুতটাকে কাবু করতে মোক্ষম অস্ত্র হিসেবে কাজ করেছে। কিন্তু দার্শনিক দিক দিয়ে ইসলামের সমালোচনা গুলো ভুত টাকে মাঝে মাঝে টুটি চেপে ধরলেও মাঝে মাঝে কাজ করে না....।" বেশ কিছু সমস্যার উল্লেখ করে সমাধান জানতে চাইলো। বুঝতে আমার বাকি রইলো না কোন পর্যায়ে আটকে আছে সে। কারণ, ঠিক এই পর্যায়গুলো আমিও পার হয়ে এসেছি। উত্তরে লিখলাম, "বুঝতে পেরেছি বন্ধু। পারলে আমিই তোমাকে এর উত্তর দিতাম। কিন্তু লিখে এতো সময় ধরে উত্তর দেবার ঐ এনার্জি আপাতত আমার নাই। তুমি যেসব প্রশ্ন করেছো, সেসবের উত্তর মোটামুটি এই লেখাগুলোতে পেয়ে যাবে....।" মুক্তমনা'র আরও কিছু লেখার লিঙ্ক পাঠিয়ে দিলাম। নয় মাস পর ২০১৪ সালের জুন মাসে ইংরেজী হরফে সে লিখলো, "দোস্ত, কেমন আছিস? তোর প্রতি অনেক কৃতজ্ঞ। তোর জন্যই আজ আমি স্বাধীন জীবন পেয়েছি। অনেক ভালো আছি।"

****

আলোকিত হবার ধরণটাতে সবার মাঝে একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। আমার ক্ষেত্রেও খুব সম্ভবত এর ব্যত্যয় ঘটে নি। অনেকের মতো আমি যেহেতু নিয়মিত লেখক নই, লেখার খুব একটা সাহস করি না। এর পরেও অভিজিৎ দা'র প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা থেকে লিখতে বসে গেছি শেষ মুহুর্তে। সাদামাটাভাবে একটা বর্ণনা দিয়ে যাবো। অভিজিৎ দা অনেকের পাশাপাশি আমাকেও যে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছিলেন, তার তুচ্ছ প্রতিদানস্বরূপ ভালবাসার এই স্বাক্ষর তাঁর জন্মদিনে তাঁরই এক সৃষ্টির ক্যানভাসে আঁকা হয়ে থাকুক।

মফস্বল একটা শহরে বসবাস ছিল আমাদের। আমাদের ছয় ভাই-বোনের দেখাশোনার ভার আম্মা আর আব্বার উপর। আব্বা চাকুরিজীবী, আম্মা নিখাদ গৃহিনী। আব্বা সংস্কৃতিমনা, আম্মা ধর্মপ্রাণ। আব্বা বারান্দায় বসে মাঝরাতে গান গাইতেন, আর আম্মা নিয়ম করে ফজরের নামাজ শেষে কোরান পাঠে বসতেন। আম্মা আর আব্বার এই দ্বৈরথ ছাপিয়ে ভাই-বোনেরা হয়ে উঠলাম সংস্কৃতিমনা আর

উদার ধর্মনিরপেক্ষ। স্কুলে-কলেজে নানান প্রতিযোগীতায় অংশ নেই, স্কাউট-বিএনসিসি করি, উদীচীর হয়ে ট্রাকে করে গণসঙ্গীত গাইতে যাই, বিকেল বেলা আবৃত্তির রিহার্সেলে যাই। এসবের পরেও, চার ভাই মিলে জুম্মার নামাজটা বাদ যায় না। রমজান মাসে রোজা রাখার পাশাপাশি পুরো পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়াও হয়ে যায়। শহরে প্রচুর হিন্দু ধর্মাবলম্বি থাকায়, আমার নিজের প্রায় সব বন্ধু হিন্দু মা-বাবার ঘরের। ঈদে তাই হিন্দু বন্ধুবান্ধবরাই বেশি বেড়াতে আসে, হৈহুল্লোড় করে। আমরাও দলবেঁধে পৌষ সংক্রান্তির হরেক রকম পিঠার লোভে ঐসব বন্ধুবান্ধবের বাড়িতে হানা দেই, আবার পুজোর রাতে এ-পাড়া ও-পাড়ায় মূর্তি-যুদ্ধ দেখে বেড়াই। আম্মা যদিও হিন্দু বাড়িতে খেতে যেতে নিষেধ করেন, তবে কখনোই তাতে খুব একটা জোরাজুরি ছিল না। আম্মার বাপের বাড়ির লোকজন খুব পরহেযগার হলেও, আব্বার সংস্পর্শে এসে ধর্মের চরমপন্থী ভাব তাঁর চরিত্র থেকে লোপ পেয়েছিল। খামাখা এই পটভূমির অবতরণের কারণ একটাই– আলোকিত হবার পেছনে শৈশবকালীন পরিবেশের অবদানটা স্মরণ করা। আমার নাস্তিক আর মানববাদি হয়ে ওঠাটা সহজ করে দিয়েছিল শৈশব আর কৈশোরের বিপরীতধর্মী মনন আর সাংস্কৃতিক আবহ। কেবল আমার ক্ষেত্রেই নয়, ভিন্ন ভৌগলিক অবস্থানের বন্ধুদের ক্ষেত্রেও এমনটা হতে দেখেছি। বেশ কিছুদিন আগে ক্যান্টিনে বসে খেতে খেতে অস্ট্রেলিয় এক সহপাঠীকে তাঁর নাস্তিকতার কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। উত্তরে সে জানালো, তাঁর মা আর বাবা দুইটি ভিন্ন ধর্মের অনুসারি। একই সাথে দু'টি ধর্ম যেহেতু সঠিক হতে পারে না, বন্ধুটির পক্ষে নাস্তিকতাকে বেছে নেয়া অনেক সহজ হয়ে গিয়েছিল। ধর্মের প্রতি সন্দেহ সৃষ্টির প্রথম প্রধান কারণটা ছিল আব্বার মৃত্যু। বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় বর্ষের পরীক্ষা চলাকালীন আব্বা আমাদের ছেড়ে চলে যান। জীবনে এই প্রথম বড় রকমের কোনো একটা মানসিক ধাক্কা খেয়েছিলাম। স্বাভাবিকভাবেই তাই ধর্মকর্ম পালন বেড়ে গিয়েছিল – আব্বাকে যে করেই হোক বেহেশতে নিয়ে যেতে হবে। হুজুরের কাছে শুনেছি, সন্তানের দোয়া নাকি "ডাইরেক্ট অ্যাকশন" করে। আল্লাহ'র নিরানব্বুইটি নাম ঠাটা মুখস্ত করে ফেলেছি। ইয়াসিন আর আর-রাহমান সুরাও প্রায় মুখস্ত। এসবের মাঝেও কেমন যেনো একটা অদ্ভুত বিদ্বেষ কাজ করছিল আল্লাহর প্রতি – এতো কষ্ট কীভাবে দেন তিনি? আব্বাকে কেনো আমার রোজগারের টাকা না দেখিয়েই তুলে নিলেন তিনি? তাছাড়া, এই যে এতো নামায-কালাম পড়ি, সত্যি কী এসবের প্রতিদান পাবো?

বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ বর্ষে পদার্পন করেছি। প্রজেক্ট থিসিস লিখতে হবে। বর্ষের শুরু থেকেই তুমুল উদ্যমে কাজ করে যাচ্ছি। যখন-তখন কাঁদা আর পানি মাড়িয়ে গাছের পাতা সংগ্রহ করতে বনের ভেতর চলে যাই। রাত জেগে পোকা খাওয়া পাতার নানান বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করি। ইন্টারনেট থেকে নামানো বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলো পড়ার চেষ্টা করি। সমস্যা হলো, যে প্রবন্ধটাই হাতে নেই, খালি ইভোল্যুশন আর ইভোল্যুশন। ইভোল্যুশনারি আর্মস রেইস, কো-ইভোল্যুশন, ইভোল্যুশনারি রেডিয়েশন– এরকম বিদ্ঘুটে সব কারিগরি শব্দগুচ্ছ। কোনো প্রবন্ধই পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারি না। বিবর্তন নিয়ে অনেক আগে বড় ভাইয়ার এইচএসসি'র বইয়ে একটা অধ্যায় পড়েছিলাম। কী সব ঘোড়ার বিবর্তন না কী যেন পড়েছিলাম, কোনো ছাতাই মনে করতে পারছি না। বিবর্তন সম্পর্কে আমার জ্ঞান তখন "ডারউইন" আর "বানর থেকে মানুষ" পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। এরকম একটা সময়ে কী

কারণে যেনো শহরের একটা নাম করা বইয়ের দোকানে গেছি। হঠাৎ করেই চোখে পড়লো "বিবর্তনের পথ ধরে" বইটি। বন্যা আহমেদের লেখা। অনেক দিন আগে প্রথম আলো পত্রিকায় দ্বিজেন শর্মার একটা লেখায় এই বইটির নাম পড়েছিলাম। ডায়রিতে টুকেও রেখেছিলাম নামটা, কিন্তু পরে আর কেনা হয়নি। সত্যি বলতে এখানটাতেই পরিবর্তনের শুরু। হলে ফিরে বইটা খুলে বসেছি। খানিকটা এগিয়ে থতমত খেতে শুরু করলাম। বিবর্তন নিয়ে লেখা, অথচ ধর্মেরও সমালোচনা করা হচ্ছে মাঝেমাঝে! কীভাবে সম্ভব? আরও পড়ছি। মাঝখানে বিরতি দিয়ে উঠে নামায আদায় করে নিচ্ছি। নামাযের দোয়ায় তখন আল্লাহর কাছে নিজের ঈমান শক্ত করে ধরে রাখার ফরিয়াদ। নামায শেষে আবারও বই নিয়ে বসেছি। এতো চমৎকার সাবলীল ভাষায় যুক্তিসম্পন্ন লেখা খুব সম্ভবত এর আগে আমি পড়িনি। বইয়ের মাঝ পথে আমার ঈমান নড়বড়ে হয়ে গেছে, নামাযের বিরতি না দিয়েই বাকি বই শেষ করলাম। তখনও আল্লাহর উপর বিশ্বাস হারাইনি, তবে নামাযটা আর পড়া হয় না কোনো এক কারণে। হঠাৎ করেই যেনো খটোমটো বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলো পড়াটা সহজ হয়ে উঠছে। বন্ধুদের সাথে বিবর্তন নিয়ে আলোচনার চেষ্টা চালাই, তবে কেউ খুব একটা আগ্রহ দেখায় না। নিজে নিজেই বইটা হাতে নিয়ে যখন-তখন পৃষ্ঠা উল্টাই। বইটার ভূমিকা আগেও পড়েছি, তবে খুব একটা মনোযোগ দেইনি। আরেকবার পড়তে গিয়ে পেয়ে গেলাম মুক্তমনা ওয়েবসাইটের ঠিকানা। আর সেখানটাতেই বন্যা আহমেদ তাঁর সাথী ও বন্ধু অভিজিৎ রায়কে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। সৌভাগ্যক্রমে আমার কাছে তখন ছোটো ভাইয়ার উপহার হিসেবে দেয়া চমৎকার একটা ল্যাপটপ আছে। এছাড়াও রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় হলের ধীরগতির ইন্টারনেট। নিজেরও একটা মডেম আছে, বাড়িতে গেলে ব্যবহার করি। কোনো এক ছুটিতে বাড়িতে যাবার পর রাতের বেলা মুক্তমনা খুলে বসলাম। চোখের পলকে অলৌকিক এক ভুবন এসে স্বাগত জানালো। এরকম একটা ওয়েবসাইট বাংলা ভাষায় রয়েছে অথচ আমি জানি না! শুরু করলাম অভিজিৎ রায়কে দিয়ে। আর কী সৌভাগ্যবান আমি, প্রথমেই চোখে পড়ে গেলো অভিজিৎ রায়ের অনন্য এক প্রবন্ধ, "বিজ্ঞানময় কিতাব"। কাকতালীয়ভাবে, এটিই নাকি বাংলায় লেখা তাঁর প্রথম প্রবন্ধ। আগ্রহ নিয়ে পড়তে শুরু করলাম। কিছুদূর গিয়ে তথ্যগুলো অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছিল। অন্যান্য ধর্ম নিয়ে যেসব উদাহরণ দেয়া হয়েছে, সে সম্পর্কে আমার জানার দরকার নেই, পরিবার আর মক্তব থেকে ইতোমধ্যেই অন্যসব ধর্মের ভ্রান্তি সম্পর্কে বিশ্বাস পোক্ত করে দেয়া হয়েছে। প্রয়োজন পড়লো তাই নিজ ধর্মকে রক্ষার। বাংলা অনুবাদসহ কয়েকটি প্রকাশনীর তিন-চারটি কোরান শরিফ আমাদের বাসায় রয়েছে, এর মাঝে একে একে সবগুলো নিয়েই বসলাম। প্রবন্ধে উল্লেখিত একেকটি সূত্র ধরে কোরানে খুঁজি, আর আমার মাথা খারাপ হতে থাকে। একেকটা আয়াত বহুবার করে দেখছি। কই? না-তো। প্রবন্ধটায় বানিয়ে বলা কিছুই নেই! সারা জীবনে কখনো অজু না করে যে কোরান ছুঁই নি, যে কোরানকে শুধুমাত্র মক্তবে নয়, স্কুলের ধর্মশিক্ষার বইয়েও বলা হয়েছে সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব, তাতে এমন নির্জলা মারাত্মক ভুলগুলো থাকে কীভাবে? আমি কি স্বপ্ন দেখছি? ভোরের দিকে আম্মা আমার কক্ষে এসে জিজ্ঞেস করলেন তখনো ঘুমাই নি কেন। চেয়ার ছেড়ে কীভাবে আম্মাকে পাশ কাটিয়ে বাথরুমে গিয়ে টেপ ছেড়ে দিয়ে মাথায় পানি ঢালছিলাম, আজও তা স্পষ্ট মনে আছে। আম্মা কোনো কিছু বুঝতে পারলেন না। একটা কোরান শরিফ হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। বাইরে ভোরের সাদা আলো, কিছুক্ষণ পরেই প্রভাত হবে। নতুন একটা সকাল। নতুন একটা সূর্য। কোরান শরিফের দিকে

তাকাই আর কান্না পায়। এতো বড় মিথ্যে কেমন করে আমি বিগত ২৩ টা বছর ধরে সঞ্চিত রেখেছি? কী করে ভন্ড এসব ধর্ম এতো যুগ পরেও বিলুপ্ত হয়ে যায় নি? আমার মনে অসংখ্য প্র শ্ন। এসবের উত্তর আমাকে পেতেই হবে। ধীরে ধীরে অভিজিৎ দা'র বাকি লেখাগুলো পড়লাম। রাতের পর রাত জেগে আর্কাইভে অন্যান্য লেখকদের পুরনো লেখা আর ই-সংকলনে রাখা অসাধারণ বইগুলো পড়তে থাকলাম। ধর্মের অসারতা আর মিথ্যা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হলেও, মাঝেমাঝেই ২৩ বছর ধরে লালন করে আসা ফালতু মৃত্যুভয় কিছুক্ষণের জন্যে হলেও মাথায় ভর করতো। সেই সময়ের একমাত্র ওষুধ ছিল পড়া, পড়া, আর পড়া। পড়তে পড়তে পুনরায় আত্মবিশ্বাস ফিরে পেতাম। এভাবেই একটা সময় নিজেকে পরিপূর্ণ মুক্তমনা রূপে আবিষ্কার করলাম। ধর্ম আর মৃত্যুর ভয় কোথায় যেন উধাও হয়ে গেল। লেখার শুরুতে দেয়া চিঠির লেখক, আমার সেই বন্ধুর মতো আমিও স্বাধীন জীবনে পদার্পন করলাম। এই স্বাধীনতাকেই যদি আলোকিত হওয়া বলা হয়ে থাকে, তবে এখানেই লেখাটি শেষ। এমনিতেই লেখার দৈর্ঘ্য অযথা বড় করে ফেলেছি। নিয়মিত লেখক না হলে যা হয় আরকি। এরপরেও, কতো কথা না-বলা রয়ে গেলো! পরিচিত কোনো মুক্তমনা বন্ধুকে কাছে পেলে, হয়তো সেদিন না বলা কথাগুলো উগড়ে দেবো। অগুস্ত রোঁদ্যা'র কল্পিত আদি থিঙ্কারের উত্তরসুরিরা যুগ-যুগান্ত ধরে জ্ঞানালোকের যে মশাল বয়ে চলেছেন, সেই মশাল সব সময় একরকম দীপ্তি ছড়ায় নি। কূপমন্ডুকতার ঘন অন্ধকারে কখনও তা ঢাকা পড়েছে, কখনও বা ধর্মান্ধদের নিপীড়নে হয়েছে নিভুনিভুপ্রায় – তবে কোনো অপশক্তিই নেভাতে পারে নি এর শিখাকে। সে জ্বলেছে, তীব্রভাবে সে জ্বলে উঠে দাবানল হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে সভ্যতার আনাচে-কানাচে। সভ্যতার নিয়ন্ত্রকেরা আপন অজ্ঞানতার চাপে আর প্রভুত্ব টিকিয়ে রাখার প্রয়াসে ধর্ম আর ভাবাদর্শের মায়ায় আচ্ছন্ন করে রেখেছে জনতাকে, পাশাপাশি অমানবিক অত্যাচার চলেছে এসব কল্পিত আর অযৌক্তিক আচার-প্রথাকে প্রশ্নবিদ্ধ করা মহামতিদের উপর। এরপরেও একগুঁয়ে কিছু অদম্য আলোর পথযাত্রী অজ্ঞানতার রাতে থেমে না গিয়ে প্রবল বেগে আলোকোজ্জ্বল করে চলেছেন চারিধার। স্বল্প সময়েই তাঁরা জয় করেছেন রাজধানীর পান্থপথ থেকে শুরু করে মফস্বল শহর আর গ্রাম-গঞ্জের অলিগলিকে। নিজের মশালে আলোকিত করেছেন নিযুত-কোটি পথচারীকে। আমাদের সেই প্রধান আলোকশিখাধারী ড. অভিজিৎ রায়, আমাদের অভিজিৎ দা, আমার হিরো, নির্লজ্জ খুনির ছুড়ির আঘাতে রক্তাক্ত হবার আগ মুহূর্তেও সেই মশাল সমুন্নত রেখেছেন। ছেড়ে যাবার পর, তাঁর প্রথম এই জন্মদিনে সবাই দেখছে, অপূর্ব সেই আলো, কেমন করে "ছড়িয়ে গেলো সবখানে"।



আমার মুক্তি আলোয় আলোয়

মারজিয়া প্রভা

পাতি মেয়ে ছিলাম আমি ! একবারে পাতি মেয়ে ! নমঃ নমঃ করে অনেক কিছুই মেনে নিতাম। পাবলিক বাসে বুড়া লোকটা পাশে বসে গুঁতাগুঁতি করছে, আমি আরও সরে সরে যেতাম, মনে হত বুড়া লোকের দোষ কি ? ভিড় বাস তাই এমনটা করছে ! এতটুকু প্রতিবাদের ভাষা জানা ছিল না আমার। জিন্স কুর্তা পড়ে যাচ্ছি, মোটা বলে মানুষ এসে ধেই ধেই টিজ করে যাচ্ছে , আলুর বস্তা বলে ডাকছে, আমি বাড়ি এসে জিন্স ছিঁড়লাম! আমি গায়ে বড় ওড়না জড়াতাম, রিকশায় ওড়না লেগে ধপাস ধপাস ! কোনদিন মনে হত না, এই বস্ত্রবন্দিত্বকে ভাঙলে কিছুই যায়ে আসবে না ! বুঝেছি আরও পরে।

আমি নাকি নারী হিসেবে যা তা ! লেখাপড়া করি, বই পড়ি, মুভি দেখি, তর্ক করি, খিস্তি ছাড়ি, ছেলেদের সাথে হই হই করে মিশি ! আমার প্রেম ভেঙ্গে গেল এইসব বলে টলে ! আমি তখন উন্মাতাল, দিশেহারা! প্রথম প্রেমে শারীরিক ভাবে অনেক কাছাকাছি এসেছিলাম, নিজেকে প্রতিনিয়ত শাপ দিতাম দুশ্চরিত্র বলে ! সুইসাইড এটেম্প নিব বলে কতশত প্ল্যান করেছি ! ক্যান জানি মরা আর হইল না !

মা বাবার কথা, আরও ভিতরে বুনে থাকা স্বপ্নের কথা ভেবে ধীরে ধীরে ফিরে আসলাম পুরান জীবনে। কিন্তু কোথায় জানি বদলে গেলাম আমি হুট করেই।

নিজের দুঃখ কষ্টের গল্প শেয়ার করে আনন্দ পেতে চাইতাম, তখন শুনতাম আরও দুঃখের কাহিনী! আরও কত নোংরা নোংরা ছেলেরা মেয়েদের জীবন বিপর্যস্ত করে দিয়েছে আরও কত নোংরাভাবে ! প্রতিনিয়ত করছে ! বস্ত্র, জীবন, যৌনতা , সবকিছু তে নারী-জীবন এক কারাগার। প্রথাগত নিয়মের বাইরে যেতে মানা।

প্রথা ভাঙলাম, যে আমি রা কাড়তাম না ঠিকঠাক প্লেসে, সেই আমি উন্মুক্ত কণ্ঠস্বরের মানুষ হলাম। স্কুলে বাচ্চা মেয়ে রেপের ঘটনায়, ইভেন্টে যোগ দিয়ে রাস্তায় দাঁড়ালাম। ফেসবুকে একটিভিটি শুরু করলাম! আশাজাগানিয়ার গল্প শুনালাম মেয়েদের। সেই কবে ছোটবেলা থেকে যৌবন অবধি, পুরুষের দুরাচার থেকে মুক্তি পেতে প্রতিবাদি হবার স্বপ্ন দেখলাম। নিজে সাইবার সেক্সুয়াল হ্যারাজমেন্টের জন্য আইনের ব্যবস্থা নিলাম।

আমি পারতাম না, এই কাজ ! ভাবতেই পারি না আরও বছর দুয়েক আগে, আমি থানায় যাব! জিডি করব! ল ইয়ারের সঙ্গে কথা বলব! একা একা এতো পথ পাড়ি দিব ! ভাবতেই গা শিউরে উঠত! এ বড় অচেনা আমি ছিলাম।
“আমি আর নেই সেই আমি”।
“দোস্ত, ছোটবেলায়, এক টিচার আমাকে আবিউজ করেছিল, কোনদিন বলতে পারি নি। আজ সে ফেবু রিকুয়েস্ট পাঠিয়েছি কোন সাহসে কে জানে ? কথা শুনাচ্ছি, তার ছ্যাঁচড়ামির কথা সবাইকে জানিয়ে দিব এবার। আমি পারতাম না দোস্ত, তোর কাছেই বলা শিখেছি”।
“আপি তুমি এতো সাহসী। ইচ্ছা হয় তোমার মত একদিন আমিও সাহসী হব, সব কথা মুখে বলতে পারব”।

“তোমার মত জীবন যাপন করতে ইচ্ছা করে, স্বাধীনচেতা। আমি পারব না আপু, সবাই পারে না, তুমি পেরেছ। তোমাকে স্যালুট”।
কানে হেডফোন গুঁজে শুনছি “আমি ভয় করব না, ভয় করব না। দু বেলা মরার আগে মরব না ভাই, মরব না”। ধী এর গলপ শুরু হচ্ছে, সমকামীদের নিয়ে বাংলাদেশের প্রথম কমিক ! আমার অনেক বন্ধু সমকামী!

আরও বছর দুয়েক আগে, আমি ভাবতেই পারতাম না সমকামিতা কোন অসুখ নয়, জেনেটিক ভেরিয়েশন। দু বছর আগে , ভাবতে পারতাম না, ধর্ম নিয়ে কোন যুক্তির জায়গা আছে, ঐশী বাণীও ডমিন্যান্ট হয়ে যেতে পারে মানুষের জীবনে। ভাবতে পারতাম না , মেয়ে হয়ে কস্মিঙ্কালে এই জন্মে মুক্তির গল্প বানাব নিজেই !

এখনও অনেক দূর যেতে বাকি ! ক্যারিয়ার বাকি, স্বপ্ন পূরণ বাকি, প্রতিবাদের আরও গল্প বাকি। কিন্তু শুরু তো করেছি, তাই মুক্তি আসবে, আলো আসবে। আশা রেখে দেই সে আলোর,
আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে,
আমার মুক্তি ধুলায় ধুলায় ঘাসে ঘাসে
আমার মুক্তি সর্বজনের মনের মাঝে,
দুঃখবিপদ-তুচ্ছ-করা কঠিন কাজে।



ভেবেছিলাম লিখবো না

অদিতি কবির খেয়া

মুক্তমনা যখন অভিজিৎ'দার জন্মদিন উপলক্ষে লেখা আহ্বান করল, প্রথমে লেখার কথা ভাবলেও লেখার বেলায় দেখি হাত সরছে না। তবু লিখি সামান্য একটু। অভিজিৎ রায় গুল্লু কে চিনি অনেক ছোটবেলা থেকেই। আমার দুই ভাই অভীক আর সেতুর উনি ভাল বন্ধু। ওনারা থাকতেন ব্রিটিশ কাউন্সিলের পরের বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকায়, সম্ভবত ১৩ নম্বর ভবনে। আমরাও বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাতেই থাকতাম আম্মার চাকুরির সুবাদে, তবে একটু দূরে। ওনার সাথে উল্টা দিকে সুজন-বিজুদের পাড়ায়, আমাদের বাসায় আর ওনাদের আবাসিক এলাকায় দেখা হত সবসময়ই। সে সময় আমাদের বড় হয়ে ওঠার বয়স, ফেলু'দা থেকে কালবেলায় যাবার বয়স।

টুকরো টুকরো ঘটনা মনে পড়ে কত! এরশাদীয় ভ্যাকেশনের সময় আমরা শামসুন নাহার হলের ভেতরে দিব্যি চলে যেতাম। একবার বিজুদের সঙ্গে করে অভিজিৎ'দা এলেন, আমি তো ওনাকে দেখে হাসতে হাসতে গড়াগড়ি। যাঁরা ওনাকে ১৪/১৫ বছর বয়সে দেখেছেন, তাঁরা জানেন উনি ভয়ানক ফর্সা, chubby ফ্যারেক্স বেবির মত ছিলেন। ওনার তখন কুট্টি কুট্টি ছোট্ট চুল আর সিন্ধুঘোটকের মত ঝোলা গোঁফ! আমি জিজ্ঞেস করলাম- কি এই অবস্থা আবার কেন? সে যা বলেছিল তা ছিল মোটামুটি এমন- কেউ তাকে সিরিয়াসলি নেয় না, সবাই গুল্লা-গুল্লু ভাবে। তাই এই ব্যাবস্থা।

আরেকবার আমি পম্পা'দিদের বাসা থেকে বের হয়ে নামছি, অভিজিৎ'দা আর কে কে যেন উঠছে। আমরা থেমে কথাবার্তা বলছি, কি একটা কথায় আমি বললাম- তুমি দুনিয়া উল্টায় ফেলো। আমরা তখন হাততালি দেব। আমার ঐ কটকটা কথায় কিন্তু উনি রাগ করেননি মোটেই।
আমার জীবনের শেষ সুন্দর বছর ২০১২। ঐ বছর বইমেলায় আমার অনূদিত একটা বই বের হয়। অভিজিৎ'দার সাথে দেখা হয়েছিল, পুরানো কথা নিয়ে অনেক হাসাহাসি হয়েছিল। বই কিনে আমাকে বললেন- অটোগ্রাফ দাও দেখি। সেটা নিয়ে আরেকপ্রস্থ হাসাহাসি হল।

অনেকেই লিখবেন কীভাবে তাঁর আলোয় আলোকিত হয়ে তাঁদের জীবন বদলে গেছে। আমিও বদলে গেছি। ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫-এর পর থেকে হাসিখুশী মানুষ থেকে ভয়ানক রকম খিটখিটা-বদ মেজাজি হয়ে পড়েছি। আমার কিছু ভাল লাগে না। মনটাকে টেনে হিঁচড়ে দূরে সরাতে চাই, বিশ্বাসঘাতক মন আমার জেদী ঘোড়ার মত এক জায়গায় স্থির থাকে।



সে আগুন ছড়িয়ে পড়ুক সবখানে

অর্ণব পাল

বাংলাদেশের অনলাইন জগতে বিজ্ঞানমনস্ক ভিন্নদৃষ্টির প্রসার ঘটাতে যে মানুষটি পথিকৃৎ ,তিনি অভিজিৎ রায়।

সামনা-সামনি পরিচিত হবার সুযোগ ঘটেনি আমার।ফেসবুকে কয়েকবার মেসেজের আদান প্রদান ,কমেন্ট বিনিময় এই যা।তাঁর ব্লগ ও লেখা পড়ে মুগ্ধ না হয়ে উপায় নেই, বিষয়গত দিকে যেমন বৈচিত্র্যময়, তেমনি সুখপাঠ্যও।পরবর্তীতে সে মুগ্ধতা চিরস্থায়ী হয় বই পড়ে,বিজ্ঞানকে সর্বজনপাঠ্য করে লেখার কঠিন কাজটি সুচারুভাবে করে গেছেন তিনি। কাদম্বরী দেবী থেকে কৃষ্ণগহ্বরের বিকিরণ, হার্ডকোর সাহিত্য থেকে বিজ্ঞান, প্রতিটি বিষয়েই তাঁর লেখনী শক্তিশালী। আন্তর্জালিক ক্ষেত্রে লেখালেখির পরিবেশটা বেশ বায়বীয়,খুব দ্রুত মন্তব্য বা আলোচনা করার সুবিধাটার নেতিবাচক দিকও কম নয়।বেশিরভাগ সময়ই পাঠক/লেখক অধৈর্যের শিকার হয়ে অগভীর আলোচনায় প্ররোচিত হন, কখনো কখনো এর থেকে জন্ম দেয় মনোমালিন্য।নিয়মিত ব্লগ ও লেখা পাঠের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি,খুব কম লেখককেই পেয়েছি,অভিজিতদার মতো; যিনি অন্যের যুক্তি শুনে নিজের কথাটিকে প্রশ্ন করার মতো সততা রাখেন।সবসময় এই বিনয়টুকু দেখছি বলে প্রিয় লেখক হিসেবে তিনি আমার কাছে অন্যরকম।দাদার মার্ক্সবাদ কি বিজ্ঞান ও রবীন্দ্রনাথের রাহাজানি শীর্ষক প্রবন্ধদুটো খুব সম্ভবত বাংলা ব্লগজগতের অন্যতম বহুলপঠিত লেখা। এই দুটো আমি বহুজনকেও পড়িয়েছি।ব্লগের লেখার কথা বললে, এখনো এই দুইটার মতো কোন ভিন্নচিন্তার লেখা আমাকে এতোটা নাড়া দিতে পারেনি।বেশ কিছু বিষয়ে দাদার চিন্তার সাথে নিজেকে মেলাতে পারিনি, এখনো কোন কোন ক্ষেত্রে না, কিন্তু ভিন্নমতে চিন্তার সৎসাহসটুকু অর্জনের পেছনে অন্যতম হয়ে আছেন এই মানুষটা।সুখপাঠ্য লেখা দিয়ে যুক্তির প্রভাব বিস্তার নয়, ভিন্নভাবে চিন্তা করার সামর্থ্যের বিকাশটাকেই আমার চিন্তার মুক্তি মনে হয়। অনলাইনে, এইচিন্তাধারার শুরুর শিক্ষা পেয়েছি অভিজিতদার কাছ থেকেই।

মুক্তমনার সাথে আমার পরিচয় ২০০৯ সালের শেষের দিকে। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার প্রস্তুতি চলছে তুমুল।ইন্টারনেট তখনো সুলভ্য হয়নি আমার মফস্বল শহরে, বাসায় কম্পিউটার না থাকার কারণে সাইবার ক্যাফেতে 'আধঘন্টা প্রতি ২০ টাকা' হারে ব্রাউজ করতে যেতাম।এখনো মনে আছে কীভাবে মুক্তমনা আবিষ্কার করি। প্রবীর ঘোষ সম্পাদিত অলৌকিক নয় ,লৌকিক নিয়ে মজে আছি; সুযোগ পেলেই ওখানে দেখা নতুন টার্মগুলো নোট করে গুগল সার্চ করে দেখতাম।ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির ওয়েবসাইটে প্রথম পাই মুক্তমনার ঠিকানা। তারপরের কথাগুলো কেমন হতে পারে আন্দাজ করে নেয়া যায়, নিয়মিত পাঠক হয়ে পড়ি মুক্তমনার।ইংরেজিতে পাঠ্যাভাস তখনো

সড়গড় হয়নি। এ অবস্থায় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদ নিয়ে পড়াশোনা করার রত্ন-ভাণ্ডারের সন্ধান পাই মুক্তমনা দেখে, নিঃসন্দেহে সেখানে অভিজিতদার লেখা ও মন্তব্য ছিল মূল্যবান মুক্তোর মতোই!

আমার এখনো বিশ্বাস হয়না দাদা নেই।যেদিন তাঁর নির্মম হত্যার খবর পেয়েছিলাম, নিদ্রাহীন ঘোরের সে রাত মনে করতে চাইনা।অপ্রিয় হলেও সত্যি, অভিজিতদার মৃত্যু মানুষের ওপর থেকেই বিশ্বাস নষ্ট করে দিয়েছে। পরক্ষণে আবার মনে হয়, আলো হাতে অভিযাত্রীর এই যে দুর্গম পথের যাত্রা তা তো শেষ হয়ে যায়নি। যে আলো অভিজিৎ রায় জ্বেলেছেন, গহীন অন্ধকারে সে আলো ছড়ানোর অমোঘ দায়িত্ব থেকে আমরা মুক্ত কি? অভিজিৎ রায় হয়ে উঠুন এই দাহকালের অভিযত্রিকের অন্তরের শক্তি। মুক্তচিন্তার আলো ছড়িয়ে পড়ুক সবখানে!



অভিজিৎরা হারলে হারবে বাংলাদেশ

ধীমান রায়

“জীবন মরণের সীমানা ছাড়ায়ে,
বন্ধু হে আমার, রয়েছ দাঁড়ায়ে।
এ মরুহৃদয়ের বিজন আকাশে
তোমার মহাসন আলোকে ঢাকা সে।। ”

প্রিয় দাদা,
আপনাকে চিঠি লিখতে বসলাম। আসলে বসলাম বলাটা ভুল হলো, বসতে রীতিমতো বাধ্য হলাম। গত এক সপ্তাহ ধরে, নিজের সাথে নিজে যুদ্ধ করছি, লিখব কি না? কি লিখব? কেন লিখবো?

বন্যাদি’র কাছ থেকে জানলাম, আপনার জন্মদিন ১২ সেপ্টেম্বর। আপনার নিজ হাতে গড়া যুক্তিবাদের প্ল্যাটফর্ম ‘মুক্তমনা’ সবাইকে লিখতে আহ্বান করেছে, আপনাকে নিয়ে, যুক্তি নিয়ে, আলোকিত হওয়া নিয়ে। প্রথমেই নিজের অজান্তে মনে হলো, আমি লিখব। আমার লেখতেই হবে। যদিও আমি কখনোই লিখি নি। কিছুই লিখি নি। তারপরও লিখব।

আপনার হত্যাকাণ্ডের খবরটা এসেছিল খুবই আকস্মিক ভাবে। ফেসবুকে ঢুকেই দেখি, কুঙ্গো থাঙ দাদার স্ট্যাটাস। বজ্রাহতের মতো বসে ছিলাম। এক দুইমিনিট না, অনেকক্ষণ । মনে হচ্ছিল সহস্রকাল পেরিয়ে যাক, এই আবর্জনার সমাজ ভেঙেচুরে অভ্যুদয় হোক নতুন যুগের, যে যুগের অনিঃশেষ প্রাণশক্তি ভাসিয়ে দিয়ে যাবে অভিজিৎ রায়ের রক্তের দাগ। ততক্ষণ না হয়, স্তব্ধ হয়ে বসে থাকি।

মানুষ যা চায়, তা তো আর হয় না। নীরবতা ভাঙলো বোনের চিৎকারে, ‘এই ধীমান! অভিজিৎ রায়কে খুন করে ফেলছে,!! ‘ মা ঐদিনই মাথা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করালো, মুক্তমনা কেন, কোন ব্লগেই কোনদিনও যেন কিছু না লিখি।

আপনার জন্মদিনের জন্য লিখতে তাই এত দ্বিধা ছিল। মায়ের আদেশ নাকি আদর্শ? কোন দিকে যাব? লড়াইতে আপনার আদর্শ জিতে গেলো, দাদা। আমি আপনাকে স্মরণ না করে পারবো না, তাই রাত ৩:১৩ এ বসে বসে আপনার কথা ভাবছি।

দাদা, একটা ব্যাপার দেখেছেন, সারাজীবন স্কুল কলেজে 'শ্রীহরি সহায়' লেখা ছেলেটা আজ শ্রীহরিকে স্মরণ না করে, রবীবাবুর গান দিয়ে চিঠি শুরু করেছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনার লেখার স্ট্যাইল নকল করলাম, ঐযে 'মহাবিশ্বে প্রাণ ও বুদ্ধিমত্তার খোঁজে' বইয়ের সবগুলো লেখায় এভাবে শুরু করতেন, সেখান থেকেই মাথায় ঢুকে গেছে। এখন চাইলেও বের করতে পারি না।

দাদা, আপনার কি আমাকে মনে আছে? মনে আছে, সেই বিজয়দার গীতা নিয়ে প্রবন্ধটা পড়ে আপনাকে ইনবক্সে জ্বালাতন করেছিলাম? যেই গীতার ইতিউতি মাহাত্ম্য ছোটবেলা থেকেই পরিবার, আত্মীয়-স্বজন আর পাঠ্যবইয়ে পড়ে আসছি, সেই গীতার এমন ভ্রান্তি পড়ে আমার বিশ্বাসের ভীতটা টালমাটাল হয়ে গিয়েছিল। আপনি আরও ধরিয়ে দিলেন, 'ধর্ম ও বিজ্ঞান : সংঘাত নাকি সমন্বয়? ' এর প্রবন্ধ গুলো। কি সাংঘাতিক রাত ছিল সে সময়, তাই না দাদা?

আপনার লেখার সাথে পরিচয় কিন্তু দাদা আরও আগে। ঐ বিজয়দারই সম্পাদিত 'ডারউইন : একুশ শতকের ভাবনা ও প্রাসঙ্গিকতা ' বইয়ে। খুব সম্ভবত হয়েলের ফ্যালাসী নিয়ে লিখেছিলেন। এরপর প্রায়ই মুক্তমনায় যেতাম। আপনার সম্পর্কে জেনেছিলাম ওখানেই। এরপর বন্ধু ইমনের নোটে আপনার উৎসাহ, কে বলবে এই লোক এতোবড় মানুষ? মনে হয়, আরে এতো আমার ঘরের লোক! আপনি বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, দাদা, অমন উৎসাহের ফল্গুধারাটাই আর কোথাও নাই!

দাদা, চোখটা ঝাপসা হয়ে আসছিল, তাই একটু ঘুরে এলাম। বাইরে টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে। প্রকৃতিও মনে হয়, আমাদের দুঃখ বুঝতে পারে। নইলে, ছমাস পরে টিএসসিতে যে দিন গেলাম, ঐদিনও এমন বৃষ্টি হচ্ছিলো।

এতোক্ষণ ধরে একঘেয়ে কথা বলেই যাচ্ছি। বিরক্ত হচ্ছেন না তো? হলে হবেন। কাউকে বলতে পারি না, আবার বলতে ইচ্ছাও করে। আজ হাবিজাবি যা মনে আসবে, বলবো। বলার স্বাধীনতার জন্য যার এতো ত্যাগ, সেই লোক কি আমাকে থামিয়ে দিবে? দিবে না।

দাদা, সেদিন একটা উক্তি পড়লাম, 'When writers die, they become books, which is, after all, not a bad incarnation' খুব সম্ভবত Jorge Luis Borges এর। এটাই সত্যি দাদা। আপনার বইগুলো যখন দেখি, তখন মনে হয় আপনি আমাদের মাঝেই আছেন, থাকবেন। কোন চাতপাতি'র সাধ্য নেই, এই অভিজিৎকে মারার। এই অভিজিৎ আলো হাতে চলা নক্ষত্রের সন্তান, কোন বিজলি বাতি না যে চাইলেই নিভিয়ে ফেলবে।

দাদা, এখন কিছু আলোর কথা বলি। ছোটভাইকে নিয়ে ঢাকা কলেজে বিজ্ঞান মেলায় গিয়েছিলাম। সেখানে অনেক ইভেন্টের মাঝে দেয়ালিকা প্রদর্শনী ছিল। অনেক প্রযুক্তি নির্ভর, চটকদার জনপ্রিয়

বিজ্ঞানের দেয়ালিকার ভীড়ে একটা দেওয়ালিকা ছিল, বিশুদ্ধ তাত্ত্বিক বিজ্ঞান নিয়ে, পুরো প্রতিযোগিতার একমাত্র বাংলা নামের দেয়ালিকা 'ত্রৈধবিন্দু'। মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চা হোক - এই স্বপ্ন তো আমাদের সবার। স্কুলের তিন বাচ্চা ছেলে রিয়াজুস সালেহীন জাওয়াদ, দীপু কুমার সরকার আর লাবীব খান যেন ভবিষ্যতে আমাদের 'অভিজিৎ' হয়ে উঠে এই শুভ কামনা করে দেখি, উৎসর্গপত্রে লেখা ' সদ্য প্রয়াত বিজ্ঞান লেখক অভিজিৎ রায়কে '।

দাদা, গর্বে বুকটা ভরে উঠেছিল। মনে হচ্ছিল যে, আলোকবর্তিকা ওরা নিভিয়ে দিতে চেয়েছিল তা ছড়িয়ে পড়েছে আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের রন্ধ্রে-রক্তে-শ্রোণিতে। যে পাখির সুর ওরা স্তব্ধ করতে চেয়েছিল, সেই পাখির কণ্ঠ যেন আকাশে -বাতাসে বলে বেড়াচ্ছে,

"

তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে,

এ আগুন ছড়িয়ে গেল সব খানে॥

যত সব মরা গাছের ডালে ডালে

নাচে আগুন তালে তালে রে,

আকাশে হাত তোলে সে কার পানে ॥

আঁধারের তারা যত অবাক হয়ে রয় চেয়ে,

কোথাকার পাগল হাওয়া বয় ধেয়ে।

নিশীথের বুকের মাঝে এই-যে অমল
উঠল ফুটে স্বর্ণকমল
আগুনের কি গুণ আছে কে জানে।। "

দাদা আর পারবো না। আজ থামি।

ইতি

ধীমান

পুনশ্চ ১: প্রিয়ন জিনিসটা যে এত অদ্ভুত, সেটা উপলব্ধি করেছিলাম আপনার লেখা পড়ে। এজন্য আপনি একটা ধন্যবাদ প্রাপ্য

পুনশ্চ ২ : আমাকে তুমি করে বলবেন।



অপরাজিত অভিজিৎ

চঞ্চল কুমার

অভিজিৎ তুমি মিশে আছো
শিরা আর উপশিরায় ,
অভিজিৎ তুমি ক্লোরোফিল হয়ে
সবুজ করেছো আমায় ।

অভিজিৎ তুমি স্বপ্ন গড়েছো
সবুজের মাঝে লাল,
অভিজিৎ তুমি অমর হয়েছো
কাল থেকে মহাকাল ।

অভিজিৎ তুমি প্রেরনা দিয়েছো
দিয়েছো আমায় শক্তি ,
অভিজিৎ তোমায় করবো ধারন
ধারন করবো তোমার উক্তি ।

অভিজিৎ তুমি ধর্মান্ধের
মুখোশ দিয়েছো খুলে ,
অভিজিৎ তুমি শুকনো গলায়
শুধা দিয়েছো ঢেলে ।

অভিজিৎ তুমি দেখে যাও
কত অভিজিৎ ঘরে ঘরে ,
কাঁদছে শুধু তোমাকে হারিয়ে
কাঁদছে চিৎকার করে ।

অভিজিৎ তোমায় ভুলবো না মোরা
ভুলবো না কোনদিন ,
অভিজিৎ কেন যাও নি বলে
কি করে শুধিবো ঋন ।

অভিজিৎ এটা দেশের লজ্জা
পারে নি তোমায় ধরে রাখতে
সূর্যাস্তের অনেক আগেই
সূর্য গিয়েছে ডুবে ।



মুক্তমনার সাথে আমার দিনগুলো

তানবীরা

ভেবে রেখেছিলাম মুক্তমনার রজত জয়ন্তী কিংবা হীরক জয়ন্তীর জন্যে যখন লেখা আহবান করা হবে তখন আমার লেখালেখির গল্পটা সেই উপলক্ষ্যে লিখবো। লেখালেখির গল্পটা যেখানে শুরু হবে, সেখানে মুক্তমনা তথা অভিজিৎ ভাইয়ের কথা আসবে না সেটা কী করে হতে পারে? হ্যাঁ, আজকাল আর মুক্তমনায় হয়তো নিয়মিত নই, নিয়মিত নই আসলে কোন ব্লগ বা ফেসবুক গ্রুপেই। তারপরও টুকটাক লেখালেখি হয়ে যায়, আর যেখানে আমার লেখার গল্প সেখানে মুক্তমনা তথা অভিজিৎ রায় আছেন বই কী!

আমার কাছে মুক্তমনা আর অভিজিৎ রায় সমার্থক নাম।

অভিজিৎ রায় ছাড়া মুক্তমনা ভাবি নি আর কোন স্বপ্নে বা দুঃস্বপ্নেও ভাবি নি এই দিনটা উপলক্ষ্য করে কিছু কখনো লিখবো।

বিয়ে করে প্রথমে দেশছাড়া, তার কিছুদিন পর থেকে, ধরতে গেলে দেশ থেকে আনা বই, পোস্টে আসা সাপ্তাহিক ২০০০, লন্ডন থেকে আসা জনমত বাদ দিলে বাংলাদেশের সমস্ত প্রায় খবরাখবর ছাড়া। বাংলাদেশে তখনও এতো ওয়েব পোর্টাল জন্মায় নি।

আমি তখন ওলন্দাজ ভাষার সাথে কুস্তি করে নাস্তানাবুদ হয়ে নিজের গ্র্যাজুয়েশান নিয়ে চরম ব্যস্ত। তারপর মা হয়ে সাংসারিক ফুরসতে অন্তর্জালে এদিক ওদিক ঢুঁ মারি। এক আত্মীয়ের সুবাদে ভিন্নমতে আসি। ভিন্নমতে তখন গুটিকয়েক মানুষ লেখালেখি করেন যাঁদের কাউকে কাউকে ব্যক্তিগতভাবে চিনি আর অনেক অচেনা লেখকের মাঝে ক্ষুরধার যুক্তি নিয়ে লেখেন অভিজিৎ রায়। আস্তিকতা-নাস্তিকতা নিয়ে তুমুল বির্তক, যুক্তি, মাঝে মাঝে হাস্যরস কিংবা ব্যক্তিগত আক্রমণ সবই ছিল। এরপর-ভিন্নমত থেকে 'মুক্তমনা'।

অনেক সময় একটি লেখার বিপরীতে অন্য একটি লেখা নিয়ে বেশ অনেকদিন ধরেই বির্তক চলতে থাকতো। লেখা পড়তে পড়তে এর যুক্তিতর্ক এমনকি লেখকের সাথেও মানসিকভাবে যুক্ত হয়ে যেতাম। সেধরনের কোন লেখায় প্রতিক্রিয়া জানানো থেকেই মুক্তমনায় যুক্ত হই। কিন্তু তখন বাংলা টাইপ করতে জানতাম না, বাংলিশ টাইপ করতাম কিংবা ইংরেজিতে লিখতাম। বাড়িতে বিজয় কিবোর্ড ছিল, কিন্তু সেটার লে আউট দেখে বাংলা টাইপ করা বিশাল ঝক্কির কাজ মনে হত আর

তাই ইচ্ছে করলেই কিছু লেখাও হয়ে উঠতো না। যদিও ওয়ার্ডে কিছু লেখা হতো তারপর পিডিএফ আর করতে পারতাম না, ফ্রি পিডিএফ ফাইল করার অপশন বেশ অনেক পরে ইন্টারনেটে খুঁজে পেয়েছিলাম। সেসব কাটিয়ে উঠে যদি কোন কিছু কখনো লিখেছি, লেখাটা কোন রকমে লিখে শেষ করে অভিজিৎ ভাইকে মেইল করে দিয়ে ঝাড়া হাতপা। লেখা পিডিএফ করে কখনো কখনো লেখায় সুন্দর, সামঞ্জস্যপূর্ণ ছবি যোগ করে দিয়ে আপ্লোড করে দিতেন।

মেইলে তাগাদা দিলেন, তারপর লিঙ্ক পাঠালেন বর্ণসফট ডাউনলোড করার জন্যে। করছি করছি করেও অনেকদিন ফেলে রাখার পর যখন বর্ণসফট ডাউনলোড করলাম, বাংলায় লেখালেখির একটা বিরাট দরজা খুলে গেলো। কোন কিছু একবার হাতে ফিক্সড হয়ে গেলে আমি সহসা পরিবর্তন করতে চাই না, কিছুটা সনাতনিদের মত চরিত্র আমার। সবার কাছে 'অভ্র, অভ্র' শুনে গেলেও আমি বর্ণসফটই ব্যবহার করে যাচ্ছিলাম। বর্ণসফটের পর অভ্র, সেও অভিজিৎ ভাইয়ের বলাতেই ব্যবহার শুরু করলাম। জাহেদ, মেহুল, বিপ্লব, অর্ণব, নন্দিনী, নুরুজ্জামান, কণা, অজয় স্যার, জাফরুল্লাহ, ভজনদা, আকাশ মালিক সাহেব, লুনা শিরীন কত তর্ক বির্তক, কতো সুন্দর সময় কেটেছে এখানে। কতো কতো ঘন্টা কেটে গেছে।

লেখালেখি নিয়ে তর্কে জড়িয়ে গেলে অনেক সময় অভিজিৎ ভাই বিরক্ত হতেন। মেইল করতেন, কী দরকার ছিলো! ভাল লেখা অনুবাদ কর, আর্টিকেল পড়। লেখার লিঙ্ক দিতেন, বইয়ের নাম দিতেন। একজন আলোকিত মানুষের চেষ্টা থাকে তার চারপাশ আলোয় ভরিয়ে দিতে, সেদিক থেকে অভিজিৎ রায়ের চেষ্টার কোন কমতি ছিলো না। আমার মত কতজনকেই হাত ধরে লেখার হাতেখড়ি দিয়েছেন, বাংলা টাইপ করা শিখিয়েছেন। নির্দ্বিধায় বলতে পারি, ছোটবেলার লেখালেখা খেলা বহু আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল, অভিজিৎ ভাইয়ের মত তুখোড় একজন মানুষের উৎসাহ, উদ্দীপনা না পেলে লেখার অভ্যেসটা আর কখনোই সামনে আসতো না। আজ লেখার জন্যে যতোটুকু পরিচিতি আছে তার অবদান এই মানুষটিরই।

এই মানুষটি কি শুধু লিখতেন আর পড়তেন? না, এর বাইরেও মানুষের জন্যে তাঁর আরো অনেক দায়িত্ব ছিল, বন্যাদুর্গতদের সাহায্যের জন্যে ২০০৪ সালে প্রজেক্ট করেছিলেন, রৌমারিতে সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের পড়াশোনার জন্যে স্কুল খুলেছিলেন, ২০০১-এ নির্যাতিত ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্যে প্রতিবাদে ফুঁসে উঠেছিলেন, বন্দী ব্লগারদের জন্যে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছিলেন দেশেবিদেশে জনমত গড়ে তুলে। সমাজের কোন সমস্যাই ছিলো না যেটাতে তিনি সচেতন ছিলেন না কিংবা সুবিধাবাধীদের মুখ লুকিয়ে নিজের দায়িত্ব এড়িয়ে যেতেন।

তিনি তাঁর বক্তব্য নির্ভীক ভাবে লিখতেন। এসব দিকে অজয় স্যার আর অভিজিৎ ভাই, পুত্র আর পিতা একে অন্যের পরিপূরক ছিলেন। দুজনেই দুজনের কাজের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন রাখতেন। প্রায় সব সমসাময়িক ব্যাপারেই অভিজিৎ ভাইয়ের লেখা পড়ার সময় আমরা প্রায় নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতাম, অভিজিৎ ভাই যে-বিষয় নিয়ে লিখেছেন, সেই বিষয়ে তাঁর লেখাটি পড়লেই চলবে; আর কারো লেখা পড়তে হবে না। এতো খেটে, এতো পড়াশোনা করে, আদ্যোপান্ত খুঁটিনাটি ধরে খুব কম লেখকই কিছু লেখেন। সমস্ত তথ্য, তত্ত্ব জড়ো করে এক জায়গায় পরিবেশন করতেন তিনি। প্রচণ্ডরকমের সংগীতপিপাসু ছিলেন এই তরুণ বিজ্ঞানমনস্ক বিজ্ঞানলেখক। নিভৃতচারী এই ভদ্রলোক নিজের সম্পর্কে একটি কথাও বলতে চাইতেন না, নিজের কিছু নিয়ে গর্ব করা তো দূরে থাক। তবে নিজের লেখার স্বীকৃতি পেলে বড্ড আনন্দিত হতেন তিনি।

প্রকৃতির অবাধ্য নিয়মে যেমন গোত্র গড়ে, তেমনি আবার জীবনের টানে প্রকৃতির নিয়ম মেনেই রাস্তা আলাদা হয়ে যায়। মুক্তমনার অনেকেই আমরা সবাই যার যার মত আবার জীবনের অন্য পর্বে ব্যস্ত হয়ে গেলাম। কদাচিৎ মেইল কিংবা ফেসবুকে কারো কারো সাথে যোগাযোগ, কারো কারো সাথে ফোন বা কোথাও সামনাসামনি দেখা। রঙিন সেই দিনের স্মৃতিচারণ। আর ফেসবুকের কল্যাণে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না-থাকলেও পরোক্ষ যোগাযোগ থেকেই যায় বেশিরভাগ সময়।

তারপর এলো ভয়াবহ সেই রাত...যদিও অনেকদিন হয়তো এর মাঝে কেটে গেছে কিন্তু মনে হয়...এইতো সেদিন...

ভুল সময়ে ভুল দেশে জন্মেছিলেন আপনি অভিজিৎ রায়। প্রাণের দামে সেই ভুলের মাশুল আপনি শোধ করলেন ভাই। এ মৃত্যু পুরো জাতির জন্যে লজ্জার আর কলঙ্কের।

হ্যাপি বার্থডে অভিজিৎ ভাই, হ্যাঁ আপনাকেই শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, কারণ সত্যের মৃত্যু নেই। অভিজিৎ রায়েরা কখনো হারে না, তারা হারিয়ে যেতে পারে না। অভিজিৎ রায় বেঁচে থাকেন তাঁর শত শত বন্ধু, শুভানুধ্যায়ীদের কাছে, যারা কখনো কোন কারণে তার কাছাকাছি এসেছিলো তাদের হৃদয়ের মাঝে।

জানি আমি আপনি ভাল আছেন, ভাল থাকবেন।

ক'দিনের অপেক্ষামাত্র যোগাযোগ হয়ে যাবে হয়তো এই মহাবিশ্বের কোথাও আবার। কোন গ্রহে, কিংবা ইথারে তরঙ্গে, কে জানে...টু মেনি থিঙ্গজ...ইয়েট টু ডিসকোভার...

তানবীরা ০৮/০৯/২০১৫



উত্তরণকাল

একুশ তাপাদার

অভিজিৎ রায়ের জন্মদিন উপলক্ষে মুক্তমনায় আলোকিত হবার গল্প আহবান করা হয়েছে। আমি একজন আলোকিত মানুষ হয়ে গেছি এমন দাবি করা অসম্ভব ব্যাপার। আলোকিত হওয়া কোন এক স্থিতাবস্থাও নয়। আমার আজকের যে চিন্তা ক্রমাগত শান না দিলে আগামীকাল সে চিন্তায় মরচে ধরতে পারে। মরচে মানেই পিছিয়ে পড়া, পিছিয়ে পড়া মানেই অন্ধকার। কোন একটা মুহূর্তের জন্য আলোকিত হওয়া যায় হয়ত কিন্তু আলোকিত হয়ে থাকতে পারাটা সহজসাধ্য বিষয় নয়। অভিজিৎ রায় সত্যিকারের একজন আলোচিত মানুষ ছিলেন। প্রতিনিয়ত পুরানো চিন্তায় শান দিয়ে নতুন চিন্তার সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিতে দেখেছি তাকে। সেসব হিসাবে নিলে নিজেকে আলোকিত মানুষ ভাববার কোন কারণ পাইনা বড়জোর আলোকিত হবার চেষ্টারত এক মানবসন্তান মনে হয়। সেক্ষেত্রে এটি আমার আলোকিত হবার কোন কাহিনী নয়, জীবনের নানান পর্যায় এবং তাঁর থেকে উত্তরণের বর্ণনা বলা যেতে পারে।

আমার জন্ম সিলেট শহরে হলেও শৈশব ও কৈশোরের একটা বড় অংশ কেটেছে গ্রামের বাড়িতে। মুসলিম পরিবারে জন্মের পর বদ্ধমূল সংস্কার, প্রথা দেখে দেখে শিখেই বড় হওয়ার প্রথম পর্যায় কাটে। সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত ওখানেই পড়াশোনা করি। সপ্তম শ্রেণী পাশ করার পর পরিবার সহ সিলেট শহরে চলে আসি। এরপর ঘটে জীবনের প্রথম ছন্দপতন। গ্রামের স্কুলে আমার খুব বেশি বন্ধু ছিল এমন না কিন্তু শহরে আমাকে যে স্কুলে ভর্তি করা হল সেটাই ছন্দপতনের মূল কারণ। ভালো মানের ২/৩ টি স্কুলে ভর্তির সময় পেরিয়ে যাওয়ায় আমাকে ভর্তি করা হয় জামায়াতে ইসলামী নিয়ন্ত্রিত একটি স্কুলে। গ্রামের স্কুলে পড়াকালীন একুশে ফেব্রুয়ারিতে আমরা প্রভাত ফেরি করতাম, ছেলেমেয়েরা একসাথে বসে ক্লাস করতাম। কাজেই মোটামুটি উদার ও স্বাভাবিক একটি পরিবেশ থেকে হঠাৎ করে কঠোর রক্ষণশীল পরিবেশে এসে শুরুতেই প্রচণ্ড মানসিক ধাক্কা খাই। এখানে এসে দেখতে পাই ছেলেমেয়েদের ক্লাস কেবল আলাদাই নয়, সময়ও আলাদা। এমনকি মেয়েদের তলার বারান্দাগুলো পর্যন্ত নিশ্ছিদ্র ভাবে ঢেকে দেয়া। ছেলেদের ক্লাসগুলোতে পুরুষ শিক্ষক, মেয়েদের নারী শিক্ষিকা। কোন অমুসলিম শিক্ষার্থী নেই এমনকি কোন অমুসলিম শিক্ষকও নেই।

পরিবেশটাই কেমন জানি ভীতিকর। এই মারি, এই মরি অবস্থা। শুরুতেই কুঁকড়ে যাই, ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পিছিয়ে পড়ি। কেউ আমার মত ভাবে না, কারো সাথে মিল হয়না। নির্বান্ধব, নিঃসঙ্গ হয়ে প্রতিটা দুঃসহ দিন কাটাতে থাকি। ওই স্কুলে নবম শ্রেণি থেকে বোর্ডের বইয়ের বাইরে অন্য কোন পাঠ্যবই না থাকলেও অষ্টম শ্রেণীতে আবশ্যিক থাকা আরবি শিক্ষা বইটি আমার যন্ত্রণার মাত্রা বাড়িয়ে দেয় দ্বিগুণ। আরবিতে কোরান শিক্ষার অভিজ্ঞতা থাকলেও পাঠ্যবই হিসেবে এমন একটি

বই কোনভাবেই সহজবোধ্য হয়ে উঠছিল না। সহপাঠীরা যারা কিনা আগে থেকেই সে স্কুলে পড়ে আসছে তারা আরবি কবিতা দোলে দোলে সুরে সুরে পড়ত। আমার কাছে দুর্বোধ্য ঠেকত সব। যেকোনো ভাষাতেই কবিতা নিঃসন্দেহে শিহরণ জাগানিয়া, কল্পনার চিত্রপটে দোলা দেয়া বিষয়। কিন্তু উপস্থাপনের কারণে কিংবা পরিবেশের কারণে দুর্বোধ্যতার ভীতি ছাড়া কিছুই প্রতিভাত করত না তা। আর আরবি লেখার করুন অভিজ্ঞতা তো অবর্ণনীয়! তার উপর শিক্ষকদের পিটুনির ভয় যোগ হয়ে স্নায়ু-চাপে ভোগা প্রচণ্ড কাহিল একটি পরিস্থিতি হত আমার। কোনমতে অষ্টম শ্রেণী পার হয়ে 'আরবি যন্ত্রণা' থেকে রক্ষা পাই।

ওই স্কুলের আরও কয়েকটি বিষয় আমার কিশোর মনে রেখাপাত করত বলে মনে হয়। প্রায় প্রতিদিন বিভিন্ন কলেজ থেকে ছাত্র শিবিরের 'বড় ভাই'রা আসত। তাদের হাতে থাকত কিশোর কণ্ঠ ম্যাগাজিন এবং সমর্থক ফরম। তারা সাংঘাতিক রকমের ভদ্র আচরণ করত, এমন একটা স্বরে কথা বলত যেন কোন কিছুর ষড়যন্ত্র হচ্ছে। ১০ টাকা দামের কিশোর কণ্ঠ ফ্রি দিচ্ছে এমনভাবে হাতে ধরিয়ে দিয়ে কৌশলে টাকা নিয়ে নিত তাতেও খুব বড় কোন সমস্যা না থাকলেও সমস্যা বাঁধত সমর্থক ফরম নিয়ে। কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলার পরই সমর্থক ফরম ধরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করত। কোন কিছু বোঝার আগে সমর্থক কেন হব এমন প্রশ্ন করার সাহস না থাকলেও নানান অজুহাতে ওই ফরম পূরণ না করার সংগ্রাম যোগ হওয়ায় যন্ত্রণার মাত্রা বেড় গিয়েছিল। এই একটা বিষয়ে দেখতাম আমার সাথে বেশিরভাগেরই মিল। হয়তবা এই ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশে পড়ে যাওয়ার কারণে শিবিরের সমর্থক ফরম উপেক্ষা করা সহজ হয়েছিল।

জোহরের আযানের সময় দেয়া হত টিফিনের বিরতি। নামাজ পড়া ছিল বাধ্যতামূলক। ওই বয়সে সাধারণ মধ্যবিত্ত ছেলে যতটুকু ধার্মিক হয় আমিও তখন ঠিক ততটুকুই ধার্মিক কিন্তু টানা ক্লাস করে হাঁপিয়ে উঠার পর টিফিন বিরতিতে তো স্বতঃস্ফূর্তভাবে খেলার দিকেই মন ছুটে যাওয়াটাই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। মাঝেমাঝে পালিয়ে ওইসময় বিভিন্ন ইনডোর খেলায় মগ্ন থাকতে পারলেও বেশিরভাগ সময় তা যেত না। শিক্ষকরা যেন ষাঁড়ের মত ছুটে এসে গুঁত দিত। তাদের গুঁতর ভয়ে আমরা স্কুলের মসজিদে জড়ো হতাম, নামাজ পড়ার ভান করে পেছনের সারিতে দাঁড়িয়ে নব আবিষ্কৃত খেলাতেই মত্ত থাকতাম অনেকে। এভাবেই চলছিল। মানুষ একসময় যেকোনো কিছু সয়ে যায়। আমিও বিরুদ্ধ পরিবেশের অস্বাভাবিকতা সয়ে যাচ্ছিলাম। উল্লেখ্য করতে চাই, ওই স্কুলে প্রাতঃ সমাবেশে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হত না। জাতীয় দিবসগুলোতে ছুটির নোটিস পড়ার সময় প্রায় সব শিক্ষকই তাচ্ছিল্যতার ভঙ্গি করতেন। এমনকি একবার কোন এক ক্রিকেট টুর্নামেন্টে পাকিস্তানের খেলার দিন স্কুল এক ঘণ্টা আগে ছুটি দেয়া হয়েছিল। এসবই খুব স্বাভাবিকভাবে দেখা হত তখন। আমার আগের স্কুলের সাথে অমিল টের পেলেও বড় কোন প্রশ্ন আমার মধ্যেও দেখা দিত না তখন।

আগের স্কুলে বিজয় দিবসে নাটক হত, গান হত আবার ঈদ-এ মিলাদুন্নবীও পালন হত। একবার তো আমি ঈদে মিলাদুন্নবীতে হযরত মোহাম্মদের উপর উপস্থিত বক্তব্য দিয়ে প্রথম পুরষ্কার

পেয়েছিলাম, সেটি আমার জীবনের পাওয়া প্রথম কোন পুরষ্কার ছিল। কিন্তু এই স্কুলে কোন অনুষ্ঠান পালন হত না।

দশম শ্রেণীতে উঠার পর কয়েকজন সহপাঠী দেখলাম শিবিরের সক্রিয় সদস্য হয়ে উঠেছে। এরমধ্যে একজন শিবিরের রীতিনীতি দারুণ দক্ষতার সাথে পালন করে 'সাথি' হয়ে গেল। কেন জানি তার সাথেই নানান কারণেই বিরোধ লেগে থাকত। একদিন স্কুল থেকে বাসায় ফেরার পথে তাদের ক'জনের হামলার শিকার হই আমি। লজ্জায়, অপমানে কাউকে তখন বলা হয় না এসব। বাসায় তো অবশ্যই না। আমার পক্ষে ওদের মত কোন গ্যাং তৈরি করা সম্ভব না হওয়ায় এড়িয়ে চলতে লাগলাম। এড়িয়ে যাবার সীমানা এসএসসি কোচিং পর্যন্ত গড়ালে পরীক্ষায় কিছুটা প্রভাব পড়েছিল বটে। কয়েক বছর পরে এই ছেলেকেই হিন্দু পৌরনিক কাহানির উপর একটি মঞ্চ নাটকে অভিনয় করতে দেখে অবাক হয়েছিলাম। শুনেছিলাম শিবিরের সেই বেপোরয়া 'সাথি'র চিন্তা ভাবনাও নাকি পাল্টেছে। খবর নেয়া হয়নি আর।

যাইহোক এভাবে নানান অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে যেতে আমি এসএসসি পাশ করলাম। শিবিরের সমর্থক ফরম এড়িয়ে গেলেও নিয়মিত মসজিদের দিকে যাতায়াত বাড়তে লাগল। নিঃসঙ্গতা, অসহায়ত্বের কারণেও প্রার্থনা করা তখন খুব শান্তির বিষয় হয়ে উঠল।

কলেজে ভর্তি হয়েই ঘটে জীবনের দ্বিতীয় ছন্দপতন। পরবর্তীতে যা আমার কাছে উত্তরণ মনে হয়েছিল। গ্রামের বাড়ি গিয়ে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে বাম পা ভেঙ্গে ফেললাম। একাধিক অস্ত্রোপচারের পর প্রায় আড়াই মাস একটানা বিছানায় এবং প্রায় চারমাস পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাবার কারণে গৃহবন্দি হয়ে পড়লাম। (এই লেখাটি যখন লিখছি তখনও আরেকটি সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত বাঁহাতের পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় আছি।)
শারীরিক ক্ষতি হলেও এই সময়টায় মানসিক উত্তরণের একটা পর্যায় পার করি। পাঠ্যবইয়ের বাইরে আমার তখনো পড়ার গণ্ডি বলতে ফেলুদা, তিন গোয়েন্দা ইত্যাদি পর্যন্ত। এই সময়েই গড়ে উঠে সিরিয়াস বই পড়ার অভ্যাস। বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালি, অপরাজিত, তারাশঙ্করের কবি, মৈত্রেয়ী দেবীর ন হন্যতে, মির্চা এলিয়াদের লা নুই বেঙ্গলি ইত্যাদি উপন্যাসে ডুবে থাকি। বইয়ের মধ্যে খুঁজে পাই নতুন বন্ধু, নতুন স্বজন। সচরাচর প্রাত্যহিক চিন্তার বাইরেও যে বিপুল পৃথিবীর বিচিত্র আবেগ, নিরাবেগ। ঘটনা, দুর্ঘটনা, নানা মুখী জীবনদর্শন আছে টের পেয়ে অভিভূত হতে থাকি। ছোট্ট গণ্ডিতে পড়ে থাকা আগের অনেক ভাবনাকে তুচ্ছ লাগে। বিশাল এক জগতের হাতছানি পাই। মনের মধ্যে তৈরি হয় অনেক প্রশ্ন, অনেক দ্বিধা, অনেক রকমের চিন্তা।

দৈনিক পত্রিকার সাহিত্য পাতায় বিভিন্ন বইয়ের নাম পেতাম। টাকা জমিয়ে কিনতাম। তখনো আমি ধর্ম বিশ্বাসী মানুষ। একদম না মানতে পারা কুসংস্কারগুলো ধর্মের অংশ নয় এমন একটা মডারেট ভাবনা নিয়ে ঘুরে বেড়াতাম। তবে নতুন কোন কিছু পড়ে জানবার সাহস ছিল। সেভাবেই প্রবীর

ঘোষের 'অলৌকিক নয় লৌকিক' বইটির প্রথম খন্ড হাতে পেলাম। এক নাগাড়ে পড়ে বদ্ধমূল অনেক ধারনা পাল্টে গেল। নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার সাথে বিভিন্ন কেস স্টাডি মিলিয়ে দেখতাম। নতুন কিছু চিন্তা, নতুন যুক্তি পেয়ে চমৎকৃত হতে লাগলাম। এতদিনের বয়ে বেড়ানো হাস্যকর অনেক ভাবনার সাথে ইতি টানার সিদ্ধান্ত নিলাম। ২০০৪ সালে হুমায়ুন আজাদ যখন হামলার শিকার হন তখনো আমি মডারেট ধার্মিক মানুষ। তাঁর কোন বই তখনো আমার পড়া হয়নি। হুমায়ুন আজাদময় ইস্যুতে যখন দেশব্যাপী তোলপাড় হচ্ছে আমার এক প্রাইভেট শিক্ষক যিনি ছাত্র শিবিরের সাথে যুক্ত ছিলেন তিনি হুমায়ুন আজাদ নিয়ে তীব্র আক্রোশ দেখাতেন। তাঁর উপর হামলা কেন উচিত কাজ সেটা বোঝাতে চাইতেন। আমি তখন আগ্রহ নিয়ে হুমায়ুন আজাদের সব বই পড়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। লাইব্রেরীতে গিয়ে তখনকার সময়ে তুমুল আলোচিত 'পাক সার জমিন সাদ বাদ' বইটির খোঁজ করি। কিন্তু বইটি প্রতিদিন অসংখ্য কপি বিক্রি হওয়ায় বাজারে পাওয়া যাচ্ছিল না , না পেয়ে কিনে আনলাম 'লাল নীল দীপাবলি' আর 'কতো নদী সরোবর' বই দুটি। এই দুটি বই আমি তিনবার করে পড়লাম। এত দারুণভাবে কেউ লিখতে পারে ভেবে বিস্মিত হয়ে যাচ্ছিলাম। বাংলা ভাষা আর বাংলা সাহিত্য নিয়ে ভীষণ ভালোবাসা তৈরি হল, সেই সাথে হুমায়ুন আজাদের প্রতিও অন্যরকম টান তৈরি হল। একে একে পড়া হয়ে যায় 'আমরা কি এই বাঙলাদেশ চেয়েছিলাম', 'ছাপ্পান্নো হাজার বর্গমাইল', 'শুভব্রত এবং তাঁর সম্পর্কিত সুসমাচার'। কিনে আনি হুমায়ুন আজাদের কবিতা সমগ্র। হুমায়ুন আজাদে ডুবে থেকে কেটে যায় বেশ কিছুদিন। তাঁর 'নারী' বইটি পড়া হয়েছে আরও অনেক পরে। ২০০৪ সালের আগস্ট যখন জার্মানিতে গিয়ে মৃত্যুও হয় হুমায়ুন আজাদের ভীষণ খারাপ লেগেছিল এই ভেবে যে আর কোন নতুন বই বের হবে না তাঁর!

ততদিনে আমি ধর্মচর্চার অনেক বাইরে চলে এসেছি। আগের অনেক ধ্যান ধারনা পাল্টে যেতে শুরু করেছে। আগে ধর্মসংক্রান্ত যেসব বিষয়ে মনে প্রশ্ন আসলে নিজের মনে গিলে ফেলতাম সাহসের অভাবে এখন সাহস নিয়ে তা ঘাঁটাতে শিখে যাই। এমনি করতে করতে কোরান শরিফের বাংলা অনুবাদ পড়ে ফেলি। ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা আরও উঠে যায়। কোরান পড়ে মনে হয় কেবল মুসলিম পুরুষ মানুষদের প্রয়োজনেই গোটা পৃথিবী তৈরি হয়েছে বাদ বাকি সবকিছু তাদের ব্যবহার্য। এমন সংকীর্ণ, অস্বাভাবিক চিন্তা কীভাবে মানুষ গ্রহণ করতে পারে আমার বোধগম্য হচ্ছিল না। ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা উঠে গেলেও শুক্রবারের জুম্মা ও বছরে দুইবার ঈদের নামাজে আমাকে যেতে হত, পরবর্তী সময়ে বাসা থেকে বের হয়ে আশেপাশে ঘুরাঘুরি করে মা কে ম্যানেজ করতাম। অনেক পরে একটা পর্যায়ে এসে ধর্ম কর্ম না করার ব্যাপার বাসায় প্রতিষ্ঠা করতে পারি।

যেহেতু তখন আমার চিন্তাধারা বুঝবে এমন কোন বন্ধু ছিল না তাই সেরকম বন্ধু -সঙ্গ, আড্ডা কোথায় পাওয়া যায় খুঁজছিলাম। এইচএসসি পাশ করার পর সিলেটে প্রথমআলো বন্ধুসভার আড্ডাই যাই। ওখানে পেয়ে যাই আমার মত অনেককে। একসাথে মিলে অনেক সাংস্কৃতিক, সামাজিক উদ্যোগে জড়িয়ে পড়ে দারুণ সময় কাটতে থাকে। জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ মানুষের সাথে এখান

থেকেই পরিচয়। সৃজিতা মিতুর সাথেও তখনি পরিচয় হয়। আমার ধারণা মিতুর চিন্তার জগতে অবিশ্বাসের কিছু রসদ ঢুকিয়ে দেয়ার পেছনে আমারও ভূমিকা ছিলো।

আমরা চলচ্চিত্র নিয়েও অনেক আয়োজন করতে থাকি। তারেক মাসুদের সাথে পরিচয় হয়, তাঁর সিনেমা নিয়ে বিশাল প্রদর্শনী আয়োজন করি। এক সময় প্রথমআলো আমাদের স্বাধীন কর্মকাণ্ড পছন্দ না করে তাদের লেজুড়বৃত্তি করার আহবান করলে সকলে মিলে ওই সংগঠন ছেড়ে দিয়ে প্রান্তিক পর্ষদ নামে একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে তুলি। শহর সিলেটে এই প্রান্তিক পর্ষদই বিএনপি ও তত্ত্বাবধায়ক আমলের বিরুদ্ধ সময়ে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার দাবিতে কর্মসূচি দেয়ার সাহস করেছিল। পরবর্তী সময়ে সিলেট গণজাগরণ আন্দোলনে এই সংগঠনের সংগঠকরাই মূল চালিকা শক্তির ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। প্রান্তিক পর্ষদের সভাপতি দেবাশিষ দেবু সিলেট গণজাগরণ মঞ্চের মুখপাত্র হন। রাজীব রাসেল, কবির য়াহমদসহ আমরা আরও বিভিন্ন সংগঠনের সমমনা বন্ধুদের জড়ো করে এক সার্কেলে নিয়ে আসতে পারি।

এসব সংগঠন করার ফলে বই পড়ার চর্চাটা বেড়ে যায় পাশাপাশি চিন্তাভাবনার আদান প্রদান জোরালো হতে থাকে। ওইসময়েই আরজ আলী মাতুব্বরের রচনা সমগ্র পড়া হয়ে যায়। চিন্তা ভাবনার জগতে খুলতে থাকে একটার পর একটা জট। ২০০৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন বাংলা কমিউনিটি ব্লগের সাথে পরিচয় ঘটে। ২০০৮ সাল থেকে ব্লগিং শুরু করি। সত্যি কথা বলতে তক্ষুনি বিপ্লব করে ফেলব এমন একটা চিন্তা কাজ করতে থাকে মাথায়। হঠাৎ করে ধর্মের বেড়াজাল থেকে মুক্ত হয়ে ধার্মিকদের সাথে যুক্তি তর্ক আর প্রশ্নের সমুদ্র বইয়ে দেয়ার বাসনা পেয়ে বসে। এটাকে আমি একটা মনস্তাত্ত্বিক পর্যায় হিসেবে দেখি এখন। একটা খুব বদ্ধ পরিবেশে থাকার পর হঠাৎ মুক্ত হাওয়া পাওয়ার স্বাভাবিক বহিঃপ্রকাশ। আজকাল এটাকে 'উগ্র নাস্তিকতার' ট্যাগ দিয়ে ব্লগার খুনের কারণ হিসেবে দায়ী করতে চান অনেকে। মানুষের চিন্তা দিনে দিনে পরিশীলিত হয়। ধর্ম ও ঈশ্বরে অবিশ্বাস একই থাকলেও ৮ বছর আগের বহিঃপ্রকাশের ধরন আর এখন থেকে ৫ বছর পর বহিঃপ্রকাশের ধরন ভিন্নতর হবে। বলার ভঙ্গিতে আরও উন্নততর পন্থা আত্মস্থ করব এটাই স্বাভাবিকতা।

২০০৮ সালে অনন্ত বিজয় দাশ ও বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী কাউন্সিল, সিলেটের নাম শুনি। অনন্তদার সাথে প্রথম দেখা হয় সম্ভবত ২০০৯ সালের প্রথমদিকে। সিলেট জেলা স্টেডিয়াম এলাকায় একদিন তাঁর সাথে দুর্দান্ত কিছু সময় কাটাই। যুক্তিশীল চিন্তা ভাবনা নিয়ে এগিয়ে যাবার সাহস পাই। এরপর থেকে অনন্ত দার সাথে গভীর সখ্যতা গড়ে উঠে। তবে ব্লগের বাইরে আমি খুব বেশি লেখালেখি করতাম না বরং ঝোঁক ছিল যেকোনো কিছু সংগঠিত করার প্রতি। দেশেও একটার পর একটা ইস্যু আসতে থাকে। কখনো যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি কখনো বাউল ভাস্কর্য স্থাপনের দাবির আন্দোলন সংগঠিত করতে জড়িত থাকি আমরা। শহরে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড চালু রাখা, যেকোনো ধরনের নৃশংসতা, যৌন নিপীড়নের বিরুদ্ধে নানান কর্মসূচির মধ্য দিয়ে সমমনা একটা সার্কেল গড়ে উঠে। এই সার্কেল থেকে একটা বড় কোন স্যাকুলারিষ্ট মুভমেন্ট হয়ত ভবিষ্যৎ করতে পারব এমন বিশ্বাস জন্ম নেয় সবার মনে।

সিলেটে ২০১৩ সালের গণজাগরণ আমাদের এই সার্কেলকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠে। একসময় মনে হয়েছিল এই আন্দোলনকে আমরা ধর্মনিরপেক্ষতার আন্দোলনে রূপ দিতে পারব। দেশ থেকে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করা, সংবিধান থেকে রাষ্ট্র ধর্ম, ধর্ম বানী সরিয়ে প্রগতিশীল, সাম্য ও মানবিকতার ভিত্তিতে সংবিধান ও আইন প্রণয়নের দাবিও জোরালো করতে পারব। কিন্তু ১৫ ফেব্রুয়ারির পর সবকিছু পাল্টে যেতে থাকে। রাজীব হায়দারকে হত্যা করার পর আমাদের প্রতিপক্ষ যে চাল দেয় তাঁর জবাবে আমাদের পাল্টা চাল ছিল দুর্বলতার নিদারুণ বহিঃপ্রকাশ। নাস্তিক রাজীবকে আমরা অস্বীকার করি। আমরা পড়িমরি করে প্রতিষ্ঠা করতে থাকি সে নাস্তিক ছিল না। যেন আমরা মৌলবাদীদের কথা মেনেই নেই যে নাস্তিক হলে হত্যা করা যাবে। সিলেটে যদিও বা এসব বিষয়ে আপোষ করতে চাইনি কিন্তু ঢাকার প্রভাব এড়ানো যায়নি। 'নাস্তিক রাজীব' এর লাশ শাহবাগে আন্দোলন মঞ্চে নিয়ে জানাজা করা, 'আমার দেশ'র প্রোপাগান্ডা হজম করে পরবর্তী বেশ কয়েকটি সমাবেশ ধর্মবানী পাঠ করে শুরু করা অর্থাৎ নিজেদের অযথা আস্তিক প্রমাণে ব্যস্ত রেখে আন্দোলনের মূল গতিপথ থেকে দূরে সরে যাই আমরা। উগ্রবাদী প্রতিপক্ষ বুঝে যায় আমাদের দুর্বলতা আর এই জায়গায় বারবার আঘাত করতে থাকে তারা। আমরা গলা ফাটিয়ে বলতে পারিনি - 'আমি নাস্তিক কিন্তু আমাকে হত্যা করার অধিকার কে দিয়েছে?' নাস্তিক কাউকে হত্যার পরই তাদের আস্তিক প্রমাণে চেষ্টা করে পরোক্ষভাবে নাস্তিক হত্যা জায়েজ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। না হলে এই বাংলাদেশে অভিজিৎ রায়, অনন্ত বিজয় দাশদেরকে হত্যা করার সাহস ওরা পেত না।

আমাদের জন্য বর্তমান সময়টা খুব বন্ধ্যা। সেই ফেব্রুয়ারি থেকে একের পর এক সহযোদ্ধার নৃশংসভাবে খুন হয়ে যাওয়া, নিজেদের জীবনের নিরাপত্তার সংকট মিলিয়ে সৃজনশীল, মননশীল সবধরনের চিন্তা শক্তি স্থবির হয়ে আছে। এই সময়ে আমাদের নতুন অনেক বিষয় নিয়ে লেখার কথা ছিল, অনেক নতুন চিন্তা নিয়ে মগ্ন হবার কথা ছিল কিন্তু কিছুই করতে পারছিনা। নিজেদের স্বাভাবিক কর্মকান্ড থামিয়ে দিয়েছি।

আরও একদিন পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে পারব? আর কোন বন্ধুর খুন হয়ে যাবার খবর পাব না তো? এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। আতঙ্কে আশঙ্কায় কাটছে জীবন। আমার মনে হয় আমাদের ফের ঘুরে দাঁড়াতে হবে। আগের মতই মুক্তবুদ্ধির চর্চা চালিয়ে যেতে হবে। উগ্রবাদীরা আমাদের চিন্তা, যুক্তির কাছে নিদারুনভাবে হেরে গিয়ে অস্ত্র তুলে নিয়েছে। তাদের এই উন্মত্ততা পরাজয়ের বহিঃপ্রকাশ। তাদের দর্শনে খুন করা ছাড়া আর কোন অস্ত্র নেই।

অভিজিৎ রায়ের এবারের জন্মদিনের দিনই অনন্ত বিজয় দাশ হত্যার চারমাস পূর্ণ হচ্ছে। আমার এই এলোমেলো লেখা অনন্তদার স্মৃতির প্রতি, তাঁর চমৎকার সব বিশ্লেষণের প্রতি, তাঁর শরীর দুলিয়ে হাসির প্রতি। যে হাসিতে বাংলাদেশকে একটি মানবিক, ধর্মনিরপেক্ষ, সত্যিকারের প্রগতিশীল রাষ্ট্র হিসেবে দেখার প্রত্যাশা ছিল।



কোপার্নিকাস, ব্রুনো, গ্যালিলিও এবং অভিজিৎ

নৃপেন্দ্র সরকার

প্রাচীণ কালে নিজেদের পারিপার্শিক অবস্থানটুকুকেই সারা দুনিয়া মনে করা হত। তখন অনেক কিছুই অজানা ছিল। সেই সুযোগে চতুরের চাতুরতার মাধুর্য দিয়ে অন্যকে মুগ্ধ করেছে। অনেকেই নিজেদের হীন বুদ্ধিমত্তাকে শক্ত ভিতে দাঁড় করার জন্য কাল্পনিক ঈশ্বর সৃষ্টি করে বলেছে - সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর। আমি তার প্রতিনিধি বা অবতার। তার নির্দেশেই তার কথাই বলি। তোমরা শুনলে তোমাদের এই ভাল, সেই ভাল হবে। না শুনলে জঘন্যতম নরকে পচে মরতে হবে। এভাবেই সৃষ্টিকর্তাদের সৃষ্টি হয়েছে। ধর্ম সৃষ্টি হয়েছে। আপাতদৃষ্টে দুনিয়াটা সমতল। নড়ে না, চড়ে না। চতুর ঈশ্বরপুত্র সেটাই চালিয়ে দিয়েছে। ঈশ্বর সূর্যটাকে পূর্ব দিকে উঠায় এবং পশ্চিম দিকে ঘোলা জলে ডুবায়। চতুর লোকেরা বলেছে ঈশ্বর পর্বত সৃষ্টি করেছে মাথার উপরের আকাশটাকে খুটা হয়ে ধরে রাখার জন্য। সেই আকাশেই ঈশ্বরের নিবাস। তার নাম স্বর্গ। ঈশ্বরের আনুগত্যশীলরা মৃত্যুর পরে ঐ স্বর্গে সুন্দরীদের নাচ দেখবে। অবারিত যৌন সুখ অনুভব করবে। মদ্য পান করবে। সিল্কের কাপড় পড়বে। যারা অনুগত হবে না তাদের জন্য নরক যন্ত্রনার ব্যবস্থা আছে। মূলা এবং শাস্তি দুটোই দেখানো হল। উপজাতি সৃষ্টি হল। সাম্রাজ্য হল। সাম্রাজ্য বৃদ্ধি এবং রক্ষায় মানবতাশূন্য দূর্ধর্ষ তাবেদারের অভাব হল না। এটাই সংক্ষেপে ঈশ্বর এবং ধর্ম সৃষ্টির ইতিহাস।

কিন্তু বিজ্ঞানের আবিষ্কার ধর্ম বিশ্বাসকে আঘাত হানতে থাকল বার বার। ১৫৪৩ সালে প্রকাশিত কোপার্নিকাসের সূর্য-কেন্দ্রিক তত্ত্ব ধর্মীয় মুরুব্বীদের মাথায় বজ্রাঘাত হানল। তিনি বললেন - পৃথিবী স্থির বস্তু নয়। সূর্যকে কেন্দ্রে রেখে পৃথিবী তার চারদিকে ঘুরছে এবং নিজেও লাট্টুর মত ঘুরছে। ধর্মান্ধরা কোপার্নিকাসের ওপর খড়্গহস্ত হল। কিন্তু মেরে ফেলল না।

গ্যালিলিও গ্রহদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে চললেন। বের করলেন চাঁদের মত অন্যান্য গ্রহ কয়টা করে উপগ্রহ আছে। ধর্মীয় মাতব্বরদের মাথায় হাত পড়ল। গৃহবন্দী করে রাখল গ্যালিলিওকে। ব্রুনো বললেন - আমরা সূর্য এবং এর গ্রহ-উপগ্রহ নিয়ে যে সৌরজগতে বাস করি, তা ছাড়াও প্রচুর সৌরজগত আছে। সব মিলিয়ে এদের কেন্দ্রবিন্দু বলতে কিছু নেই। ধর্মীয় পাঁঠাদের বদ হজম হতে শুরু করল। আর সহ্য করতে পারল না। ব্রুনোকে পুড়িয়ে মারল। ধর্ম এবং ঈশ্বর রক্ষা পেল। ধর্মান্ধদের হীন, নীচ অভিপ্রায় চরিতার্থ হল।

মহাবিশ্ব সৃষ্টি রহস্য, এর ব্যাপ্তি এবং সম্প্রসারণ তত্ত্ব উদ্ঘাটনে পশ্চিমা বিজ্ঞানীদের অবদানই বেশী। ক্রমশঃ বিশ্বাসী মূর্খ, প্রতিবন্দীদের সংখ্যা কমে এল। ধর্মগুরুরা হীনবল হল। দুর্বল ধর্মগুরুরা তাই বিজ্ঞানের সাথে সংঘর্ষ এড়িয়ে চলতে শিখল।

কিন্তু হিন্দু এবং ইসলাম ধর্ম বাহকরা পিছিয়ে থাকল। কারণ এখনও এই ধর্মগুলোর প্রচুর আবাল, মূর্খ, বোকা-সোকা, প্রতিবন্দী বিশ্বাসীতে ভর্তি। কিন্তু ইদানীং এরাও শিখে গেছে বিজ্ঞানকে থামিয়ে রাখা যাবে না। তাই চতুর চাপাবাজ প্রতারকরা অধুনা একটা নতুন কৌশলের আশ্রয় নিয়েছে - "আরে, এসব বিজ্ঞানের কথা তো ঈশ্বর অনেক আগেই আমাদের আদি ধর্ম পুস্তকে লিখে রেখেছেন।"

কিন্তু সত্য এবং মিথ্যা দুটো একসাথে কীভাবে গ্রহন সম্ভব? যে পুস্তকে লেখা আছে পৃথিবী স্থির এবং সমতল। সেই পুস্তকেই লেখা থাকা কি সম্ভব যে পৃথিবী গোল এবং সূর্যের চার দিকে ঘুরছে?

এখানেই অভিজিতের উপস্থিতি - 'না ধর্ম গ্রন্থে কোন বিজ্ঞান নেই।' একটি ইবুক সম্পাদনা করলেন - "ধর্ম এবং বিজ্ঞান - সংঘাত নাকি সমন্বয়।" সংঘাত তো বটেই। পৃথিবী চক্কর দিয়ে ঘুরে এসেও কি বিশ্বাস করতে হবে পৃথিবী সমতল? বিশ্বাস করতে হবে যে সূর্য প্রতিদিন ঘোলা জলে ডুবে আর পরের দিন পূর্ব দিক থেকে উঠে?

অভিজিৎ পৃথিবী ছাড়িয়ে মহা বিশ্ব সৃষ্টির প্রান্তিক তথ্য নিয়ে এলেন প্রাঞ্জল ভাষায়। বু ঝিয়ে দিলেন মাত্র ৬০১৫ বছর আগে ধপাস করে মানুষ এই পৃথিবীতে আসেনি। সমস্ত প্রাণীজগৎ মিলিয়ন মিলিয়ন বছরের বিবর্তনের ফসল। তিনি জোড় গলায় জাকির নায়েকের দাবীকে অগ্রাহ্য করলেন। বেদে বিজ্ঞানের আবিষ্কারকে উড়িয়ে দিলেন। ক্ষিপ্ত হল দুদলই। একদল ধিক্কার জানাল। আর একদলের এক জঙ্গী বলল - "অভিজিৎ রায় আমেরিকায় থাকে। বাংলাদেশে আসলে তাকে খুন করা হবে।" ২৬শে ফেব্রুয়ারী ২০১৫ অভিজিৎ বাংলাদেশের মাটিতে খুন হলেন। ব্রুনো খুন হয়েছিলেন ১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দে রোমে । এই মহাপুরুষরা জীবন দিয়ে গেছেন মানবতার সেবায়। এদের হাতেই গড়ে উঠেছে মানব সভ্যতা। এরা সভ্যতা উন্নয়নের ইঞ্জিনীয়ার। যারা সভ্যতার উন্নয়ন চায় না তাদেরই দরকার ব্রুনো এবং অভিজিতদের খুন করার।

ডঃ অভিজিৎ রায় মূলত বিজ্ঞান লেখক ছিলেন। বিজ্ঞানের জটিল বিষয়গুলো বাংলাভাষীদের জন্য সহজ, সুন্দর এবং সাবলীল ভাষায় লিখেছেন। রেখে গেছেন অনেক অসাধারণ প্রবন্ধ এবং বই, যেমনঃ "আলো হাতে আঁধারের যাত্রী', "মহাবিশ্বে প্রাণ ও বুদ্ধিমত্তার খোঁজে" "অবিশ্বাসের দর্শন", "শুন্য থেকে মহাবিশ্ব", "সমকামিতাঃ বৈজ্ঞানিক এবং সমাজ-মনস্তাত্বিক অনুসন্ধান", "বিশ্বাসের ভাইরাস", ইত্যাদি। মহাবিশ্বের ফিজিক্সের প্রতি তাঁর তীব্র আকর্ষণ ছিল। মহাবিশ্বটা যে কত বড় তার একটি সুস্পষ্ট ধারণা বাংলাভাষীদের দেওয়ার জন্য প্রচুর লিখেছেন। ৪ঠা জুলাই ২০১২ পরীক্ষাগারে হিগস্ বোসন কণা প্রমানিত হল। অনতিবিলম্বে অভিজিৎ তাঁর বিস্তারিত বিশ্লেষণ নিয়ে হাজির হলেন -("সার্ন থেকে হিগস বোসন - প্রলয় নাচন নাচলে যখন আপন ভুলে)। লেখার শিরোনাম যেমন কবিত্বপূর্ণ, পুরো লেখাটাই তেমনই কবিত্বপূর্ণ। অথচ লেখায় আছে ফিজিক্সের সুক্ষ্মতম বিষয়।

মহাবিশ্বময় ফার্মিয়ন এবং বোসন কণাদের রাজত্ব, বৈশিষ্ট ব্যাখ্যা সহ আছে সুইজাল্যান্ডের ২৭ কিলমিটার পেরিমিটার দীর্ঘ আন্ডারগ্রাউন্ড এক্সপেরিন্টাল টানেলে এক্সপেরিমেন্টের বিস্তারিত বিবরণ এবং ব্যাখ্যা।

আমরা যে মহাবিশ্বটায় বাস করি তা ১৩ দশমিক ৭ বিলিয়ন বছর আগে প্রচন্ড বিস্ফোরণ থেকে শুরু। শুরু থেকেই মহাবিশ্বটি ক্রমান্বয়ে সম্প্রসারিত হয়েই চলেছে। এ ভাবেই নতুন নতুন মহাবিশ্বের জন্ম হচ্ছে। অনুমান করা হয় ১০^৫০০টি মহাবিশ্ব ইতিমধ্যেই সৃষ্টি হয়েছে।
প্রতিটি মহাবিশ্বই যে কত প্রকান্ড তা ভাবতেও পারা যায় না। কল্পানাতীত এত প্রকান্ড মহাবিশ্বে ঈশ্বরের স্থান কোথায়? এই প্রশ্নটি করলেই ধর্মে আঘাত লাগে। ধার্মিকরা মাতাল হয়ে উঠে। পরিকল্পনা শুরু হয় - অভিজিৎকে সরাতে হবে।

সাম্প্রতিক কালে হাবল টেলিস্কোপ আমাদের নিকটতম গ্যালাক্সি Andromeda এর আংশিক ছবি তুলেছে। প্রায় এক ট্রিলিয়ন (১০১২)সূর্য (নক্ষত্র) আছে Andromeda গ্যালাক্সিতে। অভিজিৎ বেঁচে থাকলে এতদিনে বিস্তারিত একটা লেখা বেরোত Andromedaএর তারকারাজি নিয়ে। এরকম নতুন একটা সংবাদ এলেই আমি অভিজিতের অভাব অনুভব করি।

আমরা আমাদের পৃথিবীরই কণার সমন্বয়ে সৃষ্টি। Andromedaএর কোন একটি জ্যোতিষ্কের (সূর্যের) কোন একটি গ্রহে যদি কোন প্রাণের উন্মেষ হয়ে থাকে তাদের শরীরেও আছে আমাদের শরীরের মত একই কণাসমূহ। অভিজিত এই কথাগুলোই সুন্দর করে লিখতেন।
আজ থেকে প্রায় দশ বছর আগে বাংলাদেশের একটি ছেলে লিখেছিল - "মুক্তমনা আমার বিশ্বাসকে বদলে দিয়েছে।" এটা একটা অসাধারণ সত্য কথন। অভিজিৎ হ্যামিলনের বংশীবাদক। অভিজিতের বাঁশীর সুর হাজার হাজার বাংলাভাষী তরুণের অন্তরে গেঁথে গেছে। এরা প্রতিবন্দিত্ব থেকে মুক্ত হয়েছে, হচ্ছে। অভিজিতের অভিযাত্রা থামানোর উপায় নেই।

অভিজিৎ বিজ্ঞানের প্রান্তিক গবেষনার খবরগুলো প্রাঞ্জল ভাষায় আমাদের কাছে তুলে ধরতেন। মহাবিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্ব আমি বিষদভাবে শিখেছি অভিজিতের কাছেই। ছোটবেলায় স্কুল আমাদের মগজে ঢুকিয়ে দিয়েছে আদমই পৃথিবীর প্রথম মানুষ। হিসেব করলে দেখা যায় এটা আজ থেকে মাত্র ৬,০১৫ বছর আগের কথা। বলা হয় সেই আদম বেচেছিল ৯৩০ বছর। এসব যে ঠাকুরমার ঝুলি জাতীয় গালগপ্প এটা খেয়াল করে দেখলাম অভিজিৎ রায়ের লেখা থেকেই। ১৩.৭ বিলিয়ন (১৩,৭০০,০০০,০০০) বছর আগে অকস্মাৎ আমাদের মহাবিশ্বের সূচনা। খন্ডবিখন্ড অগ্নিপিন্ড এদিক-ওদিক ছুটে চলেছে। ধুলিকনার মত এরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে লক্ষ কোটি আলোক বর্ষ দূরে। তেমনি একটা কণা আমাদের নক্ষত্র, সূর্য। সূর্যেরই একটা ছোট্ট অংশ পৃথিবী। তারই মাঝে আমরা মানুষ। মহাবিশ্বেরই কণিকা নিয়েই আমাদের দেহ। সেই একই কণিকা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে লক্ষ-কোটি আলোক বর্ষ দূরে - কোথায় কে জানে। অথচ আমরা সেই মানুষ অলীক ঈশ্বর নামক

ভুতে বিশ্বাস করে আছি। আর ভুতের নামে মানুষ খুন করার লাইসেন্স বিলি করছি। অভিজিৎ এসব বিষয়গুলো সুন্দর করে বলতেন, লিখতেন। সেগুলো পুস্তকাকারে ছড়িয়ে আছে। তরুণরা পড়ে প্রতিবন্দীদশা থেকে মুক্তি পেয়ে বেড়িয়ে আসছে। এই মহা সত্যকে চাপাতি দিয়ে কয়দিন ঠেকিয়ে রাখা যাবে? মুক্তমনা, যুক্তিমনা তরুণরা চাপাতির ভয়ে ক্ষণিকের জন্য আন্ডারগ্রাউন্ডে থা কবে। এদের শক্তি যত বাড়বে মোল্লা-পুরোতদের শক্তি তত কমবে। পশ্চিমা বিশ্বে ধর্মের রাজত্ব যেভাবে শেষ হয়েছে, বাংলাদেশেও সেভাবেই হবে। শুধু সময়ের ব্যাপার মাত্র।

হিন্দু ধর্মের বিধিবিধান আমাকে প্রশ্নবিদ্ধ করত ছোটবেলা থেকেই। আর তখন থেকেই অন্য আর একটি ধর্মের প্রতি আমি আকৃষ্ট হই। সেই ধর্মের ঐশী পুস্তকটি আমার চোখ খুলে দেয়। উপলব্দি করতে সক্ষম হই, ঢুনিয়ার সমস্ত ধর্মই মিথ্যার উপর দাঁড়িয়ে আছে। আর এসময়েই অভিজিত রায়ের মুক্তমনার সাথে সম্পর্ক গড়ে উঠে। তাঁর চোখ দিয়েই আমি মহাবিশ্বটাকে দেখতে শুরু করি। আমার সংশয় কেটে যায়। ডঃ অভিজিৎ রায়ের লেখা আমাকে দৃঢ় স্তম্ভের উপর দাঁড় করিয়ে দেয়। ঈশ্বর নিশ্চিত অলীক পদার্থ। ভূতের মতই ঈশ্বর অস্তিত্বহীন। তাই ঈশ্বরে বিশ্বাসীরা আমার কাছে মানসিক প্রতিবন্দি ছাড়া আর কিছু নয়। আমি আর ঈশ্বরকে ভয় করি না। ভয় করি ঈশ্বরে বিশ্বাসী মূর্খ প্রতিবন্দীদেরকে।

অভিজিতের অভাব সততই অনুভব করি। অভিজিতের মৃত্যুটা আমি এখনও মেনে নিতে পারছি না। মনে হয় দুঃস্বপ্নটা কেটে গেলেই অভিজিতের নতুন লেখা আবার পড়তে পারব। অভিজিতের মত বিরাট ব্যক্তিত্বকে আঘাত করার মত কেউ থাকতে এটা ধারণা করতে পারিনি। তিনি নিজেও ভাবেননি। তাই সমস্ত ভয়-ভীতি তুচ্ছ করে স্বীয় জন্মভূমে ফিরে গিয়েছিলেন তাঁর নতুন বই প্রকাশনা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে অগনিত ভক্তদের টানে। দৈহিকভাবে অভিজিৎ আর নেই এটাই এখন সত্য। কিন্তু তাঁর লেখা এবং সত্যের আলোকবর্তিকা কোন চাপাতি নিভিয়ে দিতে পারবে না। অভিজিৎ আমার চেয়ে বিশ বছরেরও বেশী ছোট। কিন্তু অভিজিৎই আমার গুরু। তাঁর হাত দিয়েই আমি নিজেকে শক্ ভিতের উপর দাঁড় করাতে পেরেছি। বাংলাদেশের হাজারো তরুণ প্রজন্ম তাঁর বই পড়ছে। পড়বে। ধর্মীয় মূর্খতা থেকে বেরিয়ে আসবে। ধর্ম বিশ্বাসী, মূর্খ, আবাল প্রতিবন্দীদের সংখ্যা কমতে শুরু করবে শীগ্গীর। ধর্মের ধ্বজ্জাধারীরা দুর্বল হবে। দেশ বিশ্বাসের ভাইরাস থেকে মুক্ত হবে। মিথ্যার অরাজকতার অবসান হবেই হবে। বাংলাদেশে প্রচুর তরুণ-তরুণী ধর্ম থেকে বেরিয়ে এসে মুক্তবুদ্ধির চর্চা করছে। দশ বছর আগেও বাংলাদেশে “নাস্তিক” শব্দটার কথা শুনিনি। এদের সংখ্যা এখন হাজারে গুনতে হয়। ব্রিটেনেই বাংলাদেশের এক বিরাট অংশ ধর্ম থেকে প্রকাশ্যে বেড়িয়ে এসেছে।

সুপ্রিয় অভিজিৎ, তোমাকে আমি সর্বক্ষন স্মরণ করি। প্রতিক্ষণ মনে হয় এই বুঝি আমার ঢুঃস্বপ্নের অবসান হল, ইন্টারনেটে গেলেই আগের মত তোমার লেখা পাব। আজ ১২ই সেপ্টেম্বর। এই শুভ

দিনেই তোমার শুভ জন্ম হয়েছিল। তুমি আলো হাতে এসেছিলে। আজ তুমি নাই। আমরাও থাকব না। কিন্তু তোমার মশাল প্রজ্জ্বলিত থাকবে চিরদিন। তরুণ প্রজন্মকে তুমি যুক্তিবাদী, মানবতাবাদী, এবং বিজ্ঞানমনস্ক হওয়ার পথ দেখিয়েছ। তুমি কিছুই অবশিষ্ট রাখোনি। সামনে আছে শুভদিন। মোল্লা-পুরুতরা, সাধু-সন্যাসীরা আর আগের মত শক্তিশালী নয়। এরা অবহেলিত গুষ্টি। ধর্মবিশ্বাসীদের সংখ্যা কমে আসছে। পশ্চিমা দেশে ধর্ম নড়বড়ে হয়ে গেছে। বাংলাদেশ সহ বাকী বিশ্বেও তাই হবে। তোমার পথ সত্যের পথ, বিজ্ঞানের পথ। তুমি বাংলাদেশে কয়েক হাজার মুক্তমনা, বিজ্ঞান মনস্ক, যুক্তিবাদী তরুণ-তরুণী তৈরী করে গেছো। এরা বাকীদের গড়ে তুলবে। তোমার জয়যাত্রা অব্যাহত থাকবে। বাংলাদেশের মাটিতে তোমার নামে সড়ক হবে, বিশ্ববিদ্যালয় হবে, গবেষণাকেন্দ্র হবে, হাসপাতাল হবে। তুমি আমার হৃদয় ভরা শ্রদ্ধা গ্রহণ করো।

নৃপেন্দ্র সরকার,
টেক্সাস।

একটি প্রতিবাদ একটি শোকগাথা

অমল রায়



দেশ-কাল-জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র-লিঙ্গ-ইত্যাদি যেকোন পরিচয় নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য যে মানুষটির ছিল অফুরন্ত ভালবাসা, সকল প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের উর্ধ্বে উঠে "মানবতন্ত্র"-কে যিনি জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন, সেই মানুষটিই যদি মানুষ নামধারী কিছু অমানুষের হাতে নৃশংসভাবে খুন হয় তখন সামান্য মনুষ্যত্বও যাদের মধ্যে অবশিষ্ট আছে এমন মানবহৃদয়ও আহত না হয়ে পারে না !

গত ২৬ ফেব্রুয়ারী মানবতাবাদী লেখক আমেরিকা প্রবাসী অভিজিৎ রায় তাঁর স্বদেশভূমিতে ঘাতকদের চাপাতির আঘাতে নির্মমভাবে নিহত হন এবং তাঁর স্ত্রী, আরেকজন মানবতাবাদী লেখিকা, রাফিদা বন্যা আহমেদ মারাত্মক ভাবে আহত হন। এই ভয়ঙ্কর ঘটনার দায় স্বীকার করেছে একটি ধর্মান্ধ ইসলামী মৌলবাদী গোষ্ঠী। এমনি একটি গোষ্ঠী ১৯৭১ সালে ধর্মের নামে তাদের নিজের দেশের লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষকে হত্যা করতে, লক্ষ লক্ষ নারীকে ধর্ষণ করতে পাক-জল্লাদদের সহযোগী হিসাবে কাজ করেছে। সেই ধর্মান্ধ শ্রেণী স্বাধীনতার মাত্র কয়েকদিন আগে বেছে বেছে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবিদের হত্যা করেছে। এই চক্র স্বাধীনতার ৪৪ বছর ধরে বাংলাদেশে জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হচ্ছে। আজ তারা ইসলাম রক্ষার নামে হিন্দু-বৌদ্ধদের উপর আক্রমন করছে, তাদের মন্দির, প্যাগোডায় আগুন দিচ্ছে - তারা হুমায়ুন আজাদকে মারাত্মক ভাবে আহত করে

মৃত্যুর কোলে ঠেলে দিয়েছে, তারা রাজীব হায়দারকে পৈশাচিক ভাবে খুন করেছে। এই ধর্মান্ধ নর - পশুদের আক্রমনের সাম্প্রতিকতম শিকার অভিজিৎ আর বন্যা।

অভিজিৎ কোন রাজনৈতিক নেতা ছিলেন না, তিনি কোন উস্কানিমূলক বক্তৃতা করেও বেড়াতেন না। মানব সভ্যতার ইতিহাসে যে সকল মানুষেরা তাদের লেখনীর মাধ্যমে মানুষকে তাদের ধর্মান্ধতা সহ যে কোন অবৈজ্ঞানিক কুসংস্কার থেকে মুক্ত করার জন্য চেষ্টা করে গেছেন অভিজিৎ ছিলেন তাঁদের দলে। অভিজিৎ লিখেছেন সকল ধর্মের অন্ধকার দিকগুলি নিয়ে - ধর্মের যে উপাদানগুলি কোন মানুষকে একজন পরিপূর্ণ মানুষ হওয়ার পরিবর্তে কেবল একজন হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, মুসলমান ইত্যাদিতে পরিণত করে তার বিরুদ্ধে, ধর্মের যে দিকগুলি মানুষের সৃষ্টিশীল মননের চারিদিকে অন্ধকারের প্রাচীর তৈরী করে তার বিরুদ্ধে, ধর্মের যে দিকগুলি মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করে তার বিরুদ্ধে, ধর্মের যে দিকগুলি নারীকে হেয় প্রতিপন্ন করে,তার বিরুদ্ধে, ধর্মের যে দিকগুলি এই জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে জানার জন্য মানুষকে অনুসন্ধিৎসু করার পরিবর্তে মিথ্যা কল্প-কাহিনী তৈরী করে মানুষের মনকে বদ্ধ করে মানুষের অগ্রযাত্রাকে বাধাগ্রস্থ করে তার বিরুদ্ধে। অভিজিৎ শুধু ধর্মান্ধতা আর কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লিখেই থেমে থাকেন নি -তিনি লিখেছেন বিজ্ঞানের সব জটিল বিষয়াদি নিয়ে - বিজ্ঞানের সব সাম্প্রতিক উদ্ভাবন নিয়ে সহজ সরল ভাষায় তিনি লিখেছেন অসাধারণ সব প্রবন্ধ, আর বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের জটিল বিষয়াদি প্রাঞ্জলভাবে উপস্থাপনে তিনি ছিলেন একজন সুদক্ষ কারিগর ! শুধু কি তাই, বিজ্ঞানের সাথে সাথে সাহিত্যর প্রতিও ছিল তাঁর অশেষ আগ্রহ।

বাংলাদেশের মত দেশে যেখানে মানুষের প্রগতির পক্ষে বাক স্বাধীনতার দ্বার প্রায় রুদ্ধ - ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে কথা বললে যেখানে মানুষকে ধর্মবাদীদের কোপানলে পড়তে হয় সেখানে অভিজিতের এক অনবদ্য অবদান “মুক্তমনা” নামের ওয়েবসাইটটির প্রতিষ্ঠা, যেখানে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে বিজ্ঞান আর যুক্তির আলোকে বিভিন্ন বিষয়ের চুলচেরা বিশ্লেষণ করার। সঙ্গত কারণেই সেখানে অনেক মননশীল মানুষই বিভিন্ন ধর্মের অমানবিক দিকগুলি তুলে ধরার সুযোগ পেয়েছেন - ধর্মের নামে মানুষকে হেয় করা, ধর্মের নামে নারী নির্যাতন, ধর্মের নামে যুগের পর যুগ চলে আসা অন্ধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কথা বলার। এর প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বলা চলে বাংলাদেশের নতুন প্রজন্মের মধ্যে এক ধরনের আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে - অনেক তরুণ-তরুণী ধর্মান্ধতা ও আজন্ম কুসংস্কারের অভিশাপ থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করে আলোর পথে আসতে পেরেছে - সেই ক্ষেত্রে অভিজিতের অবদান অনস্বীকার্য।

এবারের একুশের বইমেলায় প্রকাশিত হয়েছে তাঁর দুটি গবেষণাধর্মী গ্রন্থ, একটি এই মহাবিশ্বের জন্ম সংক্রান্ত সাম্প্রতিকতম ধারণার উপর ভিত্তি করে পদার্থবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা আর গণিতশাস্ত্রের সব জটিল বিষয়াদি নিয়ে (প্রখ্যাত গনিতবিৎ ড: মীজান রহমানের সাথে যৌথভাবে লিখিত) বাংলায় একটি অসাধারণ বই “শূন্য থেকে মহাবিশ্ব”, আর অন্যটি আর্জেন্টিনার বিদূষী বিদেশিনী ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর সাথে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গভীর প্রীতির সম্পর্কের বিষয়ে একটি গ্রন্থ ” ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো: এক রবি বিদেশিনীর খোঁজে” । গভীর আত্মপ্রত্যয় আর আকাশচুম্বী উৎসাহ

আর উদ্দীপনা নিয়ে অভিজিৎ আর বন্যা গিয়েছেলেন জন্মভূমিতে বাঙালির প্রাণের উৎসব একুশের বইমেলায় তাঁর এই দুটি গ্রন্থের উদ্বোধন করতে। সেদিন সন্ধ্যায় তাঁরা বইমেলা থেকে বের হয়ে প্রাণের অনন্ত উচ্ছ্বাসে অগনিত মানুষের ভীড়ে বাংলা একাডেমির ফুটপাথ ধরে বাসার দিকে ফিরছিলেন ! আশে পাশে ছিল অনেক পুলিশ ! অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্যি এর মধ্যেই ঘাতকরা অভিজিৎআর বন্যাকে পিছন দিক থেকে এসে চাপাতি দিয়ে কোপাতে শুরু করলো ! রক্তাক্ত ক্ষত-বিক্ষত অভিজিৎ ধরাশায়ী হলেন - তাঁর মাথা থেকে ফিনকি দিয়ে রক্তের ধারা বহমান ! তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর মারাত্বক ভাবে আহত রক্তাক্ত স্ত্রী আর্ত চিৎকার করছেন সাহায্যের জন্য ! কেউ এগিয়ে এল না ! অনেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাসা দেখছে ! এ যেন কোন এক ভয়ঙ্কর চলচ্চিত্রের এক বীভৎস দৃশ্য !! যে ঘাতকরা অভিজিৎকে খুন করলো, যে ঘাতকরা বন্যাকে রক্তাক্ত করলো - তাদের হাত কি একটুও কাঁপলো না, তাদের মস্তিষ্কে কি একটিবারের জন্য একটু দ্বিধার দ্বন্ধ তরঙ্গায়িত হলো না, তাদের হৃদয়ে কি মমতার লেশ মাত্র অবশিষ্ট ছিল না ?? কি করে পারল তারা মানুষের জন্য ভালবাসায় ভরা অভিজিৎ আর বন্যার মত এমন দুটি নিষ্পাপ মানব-মানবীকে আঘাত করতে !! ঘাতকের এমন নির্দয়তায় পশু-হৃদয়ও বুঝি করুনায় বিগলিত হবে - বৃক্ষদের প্রাণেও বুঝি বোবা কান্না উথলিয়া উঠবে - কিছু মানুষরুপি পশুদের এমন নির্মমতায় পশুরাও বুঝি লজ্জায় কুণ্ঠিত হবে ! এই মানুষরুপি পশুরা নাকি ঈশ্বরে বিশ্বাসী, এই মানুষরুপি পশুরা নাকি ধর্মে বিশ্বাসী - জানি না কি তাদের ধর্ম - জানি না কেমন তাদের ঈশ্বর ! যে ঈশ্বর, যে ধর্ম কাউকে অভিজিৎ আর বন্যার মত মানুষকে হত্যা করার প্রেরণা যোগায় - এমন ঈশ্বর আর এমন ধর্মের প্রতি সমস্ত মানবজাতির ঘৃনা বর্ষিত হোক - পৃথিবী থেকে এমন ধর্মের শীঘ্রই বিলুপ্তি ঘটুক - মানবজাতি সত্যিকার মানুষ হবার সুযোগ পাক !

ধর্ম-ভিত্তিক কোন রাষ্ট্র যে জনগনের কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণই বহে আনে - রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে সম্পূর্ণ আলাদা করে রাখা যে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার অপরিহার্য শর্ত তা আর নতুন করে বলার অবকাশ নেই। পৃথিবীর সকল উন্নত দেশ সমূহ এই শর্তগুলি রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডে পালন করেই সেই সব দেশ আজ সভ্য দেশের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সেই সকল উন্নত দেশ সমূহে ধর্ম আজ কোনভাবে টিকে থাকলেও সেখানে তা আজ একান্তই মানুষের ব্যক্তিগত বিষয়। সাধারণ মানুষের ধর্মবিশ্বাস বা অবিশ্বাসের ব্যাপারে রাষ্ট্রের নাক গলানো আজ সেখানে কল্পনার বিষয় - উপরন্ত সাধারণ মানুষও তাদের ধর্মীয় পরিচয়কে সযতনে অন্যের কাছে গোপন রাখাই একজন সভ্য মানুষের কর্তব্য ও দায়িত্ব বলে বিবেচনা করে। কিন্তু দূর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের মত দেশগুলিতে এখনো ধর্ম নিয়ে একেবারে বলিহারী অবস্থা ! প্রায় দুইশত বৎসর ব্রিটিশ শাসনের পর ১৯৪৭ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত প্রায় ২৪ বৎসর এই দেশটি ছিল পাকিস্তান নামক একটি ধর্মভিত্তিক অপশাসিত রাষ্ট্রের অংশ। তারপর ১৯৭১ সালে এক সাগর রক্তের বিনিময়ে আমরা পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র তৈরী করলাম। সঙ্গত কারণেই বাংলাদেশের প্রগতিকামী মানুষ সেদিন আশা করেছিল এই নতুন রাষ্ট্রে এই ঘাতক মৌলবাদী সম্প্রদায় যারা ইসলাম ধর্ম রক্ষার নামে দেশটাতে গণহত্যা চালিয়ে ছিল তারা কঠিন দন্ড পাবে এবং সেই সাথে ধর্মকে রাজনীতি থেকে আলাদা করে

বহু ধর্মের মানুষের সমন্বয়ে গঠিত বাংলাদেশ হবে একটি আধুনিক গনতান্ত্রিক ও ইহজাগতিক (Secular) রাষ্ট্র ! চিন্তাশীল মানুষরা আশা করেছিল জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে এই দেশটি হবে সকল স্তরের মানুষের জন্য একটি স্বাধীন দেশ, যেখানে সকল মানুষের থাকবে সম-অধিকার, সকলের থাকবে মত প্রকাশের স্বাধীনতা। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি এর শুরুটা ভাল হলেও ধীরে ধীরে রাষ্ট্রটি সেই গনতন্ত্র আর ধর্ম নিরপেক্ষতার আদর্শ থেকে সরে আসতে শুরু করলো - তারপর ১৯৭৫ সালে বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধুর নৃশংস হত্যাকান্ডের পর দেশটিতে চালু হলো সেনাতন্ত্র - একটি গণতান্ত্রিক আর ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের বদলে আস্তে আস্তে এটি পাকিস্তানি ভাবধারায় একটি ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত হবার পথে চলতে শুরু করলো। এক সময় ইসলাম রাষ্ট্র ধর্মে পরিণত হলো। যেখানে পাকিস্তানিদের দোসর রাজাকার, আল-বদর আর আল-শামসদের গণহত্যার মত মানবতা বিরোধী অপরাধের জন্য কঠিন বিচারের আওতায় আনার কথা ছিল তার পরিবর্তে সেই জঘন্য অপরাধীরা রাষ্ট্রীয়ভাবে আশ্রয় -প্রশ্রয় পেতে শুরু করলো - এক সময় বাঙালির গৌরব গাথা মুক্তিসংগ্রামের মুখে কালিমা লেপন করে পাকিস্তানিদের দোসর শাহ আজিজ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হল আর মুক্তিযোদ্ধাদের বিদ্রুপ করে কুখ্যাত রাজাকার মৌলানা মান্নান হলো বাংলাদেশের ধর্মমন্ত্রী। এই ভাবে দীর্ঘ ২১ বৎসর দেশটি প্রগতি-বিরোধী পথে চলার পর ১৯৯৬ সালে যখন বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব দানকারী দলটি ক্ষমতায় এলো তখন সঙ্গত কারণেই মানুষ আশা করেছিল দেশটি আবার ঘুরে দাঁড়াবে। কিন্তু অতীব পরিতাপের বিষয় এই দলটিও দেশকে গণতন্ত্র, ধর্ম নিরপেক্ষতা আর মানবতাবাদ প্রতিষ্ঠা করার লক্ষে না অগ্রসর হয়ে ধর্মবাদিতাকে প্রশ্রয় দিতে শুরু করলো - এই সুযোগে একাত্তরের পরাজিত শত্রু ইসলামী মৌলবাদী গোষ্ঠী আরো প্রবল প্রতাপে প্রগতির পথকে রুদ্ধ করার লক্ষে অগ্রসর হতে থাকে।

বহু বছর পরে হলেও যদিও সাম্প্রতিক কালে বর্তমান সরকার একাত্তরের যুদ্ধপরাধী রাজাকারদের বিচার শুরু করেছে - (এর জন্য তাদের সাধুবাদ জানাই)- কিন্তু সাথে সাথে এই সরকার আবার ধর্মবাদীদের (ধর্ম নিয়ে যারা রাজনীতি করে) নানা ভাবে আস্কারাও দিয়ে যাচ্ছে। সরকারের এই দ্বিমুখী আচরণে দেশ আজ এক বেহাল অবস্থার সম্মুখীন। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় ধর্মান্ধরা উচ্চকণ্ঠে ধর্মের বিষ বাষ্প চারিদিকে ছড়িয়ে বেড়ায় - তাদের প্রতিরোধ করা তো দূরের কথা রাষ্ট্র তাদের নানা ভাবে আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়ে চলছে ! স্বাধীনতার পর থেকে তারা বেড়ে বেড়ে আজ তারা দেশের জন্য বিরাট হুমকি স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশে বহুদিন ধরে মুক্ত চিন্তার প্রসার বাধাগ্রস্থ ! দেশে আজ মুক্তচিন্তার মানুষদের জীবনের নিরাপত্তা চরম ভাবে বিঘ্নিত।

হুমায়ুন আজাদকে যে ধর্মীয় উন্মাদরা কুপিয়ে রক্তাক্ত করেছিল, রাজীব হায়দারকে যে মৌলবাদী গোষ্ঠী নৃশংস ভাবে খুন করলো সেই ঘাতদের আজও বিচার হয়নি। আজ এক মাসের অধিক সময় পার হয়েছে, অভিজিৎকে যারা প্রকাশ্যে পৈশাচিক ভাবে হত্যা করলো, বন্যাকে যারা ভয়ঙ্কর ভাবে আহত করলো সেই খুনিদের ধরার ব্যাপারে আজ পর্যন্ত তেমন কোন অগ্রগতি নেই। শুধু নাই নয় ,

আশ্চর্যের বিষয় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকেও অভিজিৎ হত্যার পর তাঁর পরিবারের প্রতি শোক জ্ঞাপন করতে হয়েছে গোপনে, আজ ধর্মীয় মৌলবাদীদের ভয়ে তিনি প্রকাশ্যে একটি বিবৃতি দিতে ভয় পান !! এমন ভাবে চলতে থাকলে বাংলাদেশ যে একদিন ধর্মীয় মৌলবাদীদের স্বর্গ রাজ্যে পরিণত হবে, আফগানিস্তান বা পাকিস্তানের চেয়েও একটি বেশি পশ্চাৎপদ দেশে পরিণত হবে কেউ এমন ধারণা পোষণ করলে তা কি নিতান্তই অমূলক বলে মনে হবে??

২৩ মার্চ, ২০১৫ সাল, ক্যানাডা

বিশেষ দ্রষ্টব্য: অভিজিতের এই মর্মান্তিক হত্যাকান্ড নিয়ে এই লেখাটি যখন লিখি তখন কল্পনাও করতে পারিনি যে অচিরেই এমন বীভৎস ঘটনার আবার পুনরাবৃত্তি ঘটবে ! এই বেদনা, এই ক্ষোভ ভাষায় প্রকাশ করা খুবই দুরূহ যে অভিজিৎকে হত্যা করার মাত্র ৩২ দিনের মাথায় (৩০ মার্চ) সেই দুর্বৃত্তরা খুন করলো ওয়াশিকুর রহমান বাবুকে, ৭৫ দিনের মধ্যে (১২ মে) অনন্ত বিজয় দাশকে এবং ১৬২ দিনের মাথায় (৭ আগস্ট) নীলাদ্রি চট্টোপাধ্যায়কে। এত অল্প সময়ের ব্যবধানে এতগুলো আলোকজ্জ্বল মুক্তচিন্তক মানবতাবাদী লেখকের এমন পৈশাচিক ভাবে হত্যাকান্ডের প্রতিবাদের ভাষা বা নিন্দা জানানোর ভাষা কেমন হওয়া উচিত আমার জানা নেই, তবে এইটুকু নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, যে সমাজ, যে দেশ রাজীব, অভিজিৎ, ওয়াশিকুর, অনন্ত আর নীলাদ্রির মত মানুষদের রক্ষা করতে অক্ষম - সেই সমাজ, সেই দেশ সভ্যতার মাপকাঠিতে অত্যন্ত পিছনের সারির দেশগুলির অন্তর্ভুক্ত এবং এমন দেশ এই একবিংশ শতাব্দীতে একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন মধ্যযুগীয় দেশ হিসাবে সারা বিশ্বের কাছ পরিগণিত হওয়ার যোগ্য !

স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের অধিকার মানুষের জন্মগত নাগরিক অধিকার ! প্রতিটি নাগরিকের এই অধিকার রক্ষা করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের ! সেই সাথে যে কোন নাগরিকের নিরাপত্তা বিধান করাও রাষ্ট্রের দায়িত্ব ! এই দায়িত্বটি যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা পালন করতে ব্যর্থ হয় সেই রাষ্ট্রযন্ত্র একটি বিকলাঙ্গ ও ব্যর্থ রাষ্ট্র ! মানব ইতিহাসের অনেক কালো অধ্যায় পার হয়ে এই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চরম উৎকর্ষের এই একবিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীর অনেক দেশেই আজ মানুষের মানুষের বাক স্বাধীনতার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ! রাষ্ট্র সেখানে প্রত্যেকটি নাগরিকের নিরাপত্তা ও তাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় অঙ্গীকারবদ্ধ ! কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি যে বাংলাদেশ আজ সেই বিচারে অতিশয় পশ্চাৎপদ একটি দেশ! বাংলাদেশ সরকার মুক্তবুদ্ধির প্রগতশীল মানুষদের নিরাপত্তার ব্যাপারে চরমভাবে উদাসীন ! তাই ধর্মান্ধ বর্বর মানুষ নামধারী কিছু হায়েনাদের হাতে রাজীব হায়দার, অভিজিৎ রায়, ওয়াশিকুর রহমান বাবু, অনন্ত বিজয় দাশ এবং অতি সম্প্রতি নীলাদ্রি চ্যাটার্জিকে জীবন দিতে হলো ! বর্তমানে বাংলাদেশে যে কোন প্রগতিশীল মানুষের জীবন অনিরাপদ ! বাংলাদেশে এই বর্তমান পচনশীল রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিবর্তন না হলে বাংলাদেশে একের পর এক এমন আলোকোজ্জ্বল মানুষের হত্যাকান্ড যে চলতেই থাকবে সেটিই মনে হয় ভবিতব্য ! এমতাবস্থায় আমরা যারা সভ্য মানুষ হিসাবে সমাজের কাছে পরিচিত তাদেরকি কোনই দায় নেই ?? এত গুলো আলোকোজ্জ্বল নবীন প্রাণের এমন খুনের ঘটনায় সারা বাংলাদেশের প্রগতিশীল মানুষেরা সমস্বরে প্রতিবাদে ফেটে পড়ুক -

বর্তমান সরকারকে বাধ্য করুক এই ধর্মান্ধ খুনীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারকরে বিচারের সম্মুখীন করতে, নইলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মানুষের কাছে আমরা একটি দুর্বল, ভীরু, অমানবিক এবং অপরাধী জাতি হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকব ! আর একটি কথা - আর একটিও এমন প্রাণ যেন ধর্মান্ধ বর্বরদের হাতে বলিদান না হয় - এর জন্য কিভাবে পরিরোধ গড়ে তোলা যায় এই ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তাশীল হওয়ার জন্য বাংলাদেশের প্রতিটি বিবেকবান মুক্তবুদ্ধির মানুষের কাছে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি ! সবশেষে বলি- রাজীব, অভিজিৎ, ওয়াশিকুর , অনন্ত আর নিলয়ের রক্ত কখনো বৃথা যেতে পারে না - তাদের রক্তধারা বেয়ে জন্ম নিবে আরো লক্ষ কোটি নীলাদ্রি, ওয়াশিকুর, রাজীব অনন্ত আর অভিজিৎ - এবং তারাই একদিন বাংলাদেশকে অন্ধকারের গহবর থেকে মুক্ত করে আলোর পথে নিয়ে আসবে- বাংলাদেশ তার বর্তমানের দূর্নাম ঘুচিয়ে সারা বিশ্বের কাছে ধর্মান্ধতার অভিশাপ মুক্ত একটি মানবিক ও আধুনিক রাষ্ট্র হিসাবে পরিচিতি লাভ করবে ! সেই আলোর পথে, সেই শুভ দিনের নিশানায় বাংলাদেশ অনতিবিলম্বে যাত্রা শুরু করুক এই আমার শুভ কামনা !



ক্রাইম সিন, ডোন্ট ক্রস

বিকাশ মজুমদার

রেকি করা হয়ে গেছে,
আগেই জানিয়ে দেয়া হয়েছে কখন আসবে কবি,
তোরা রেডি থাকবি চাপাতি হাতে,
ওরা চা খেতে আসবে দুজনে একসাথে।

ওরা আসলে বিশ্বাসই করে না যে আক্রান্ত হতে পারে,
ভাষাকে এত ভালবাসে যে চলে আসবে আমেরিকান বার্গার ছেড়ে।

তোরা রেডি হয়ে নে,
চাপাতি কাগজে মুড়ে নে,
যেন হাতের ছাপ না থাকে।

সাপ্লাই চেইন, লজিস্টিকস ইজ ওকে,
পরবর্তী মূল্যায়নে তোদের কেপিআই হবে পাঁচে পাঁচ।

এবার শুনে নে কি করতে হবে।

মাত্র কয়েক মিনিটের কাজ,
মাস্ট বি শার্প অন এ্যাটাক,
ইউটিউব থেকে কয়েকটি ক্লিপ দেখে নে।
চপ একটা দারুণ শব্দ, হ্যাক থেকে বেটার।
পিছন দিক থেকে মাথা আর ঘাড় বরাবর চপাবি,
পূর্ব অভিজ্ঞতা কাজে লাগা,
সেকেন্ডে কয়েকটি কোপ,
এত দ্রুত যেন মনে হয় দৈবিক ভ্রমণ সময়কাল।
জায়গাটা টিএসসি বলেই তোদের প্লাস পয়েন্ট।
সবাই ছবি তুলবে দূরে দাঁড়িয়ে।
ফেসবুকে টাটকা ছবি দেয়ার মজাই আলাদা,
সবার আগে সর্বশেষ সংবাদ।
নাস্তিকের সস্তা ঘিলু পড়ে থাকবে রাস্তায়,
আধ শুকনো রক্তে উড়বে মাছি,
পুলিশের হলুদ রিবনে লেখা ক্রাইম সিন, ডোন্ট ক্রস।

নাস্তিক মরলে বরং রাজনীতিতে নতুন জোয়ার আসে।



“আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী”

নাস্তিকের ধর্মকথা

অভিজিৎ রায়ের সাথে আমার প্রথম পরিচয়টা তেমন একটা সুখকর বলা যাবে না ... বলতে গেলে হেলায়, নির্বোধ অবজ্ঞায় দারুণ একটা সুযোগ হারিয়েছি ... কত সালের দিকে? ২০০৫ সাল হবে হয়তো (** কিংবা আরো আগে কি? কেন জানি মনে হচ্ছে আরো আগে- কিন্তু বইটার প্রকাশকাল তো দেখি ২০০৫ -এ ...) ... সে সময়ে বাম একটা ছাত্র সংগঠনের সাথে যুক্ত, তাদেরই উদ্যোগে গঠিত শিক্ষা সম্পর্কিত আন্দোলনের একটি প্লাটফর্মের সভাপতি অজয় রায় স্যার দারুণ শ্রদ্ধেয় আমাদের, বিভিন্ন সভা- সেমিনারে স্যারের কথা খুব উদ্বুদ্ধ করতো, স্যারকে একই সাথে মনে হতো মাটির মানুষ ও লড়াকু একজন ... সেই পাকিস্তান আমলের শিক্ষা আন্দোলন থেকে শুরু করে বাংলাদেশ পর্বের যাবতীয় আন্দোলন- সংগ্রামে স্যার ছিলেন বরাবর সামনে সারিতে! এমন একজন লড়াকু, প্রকৃত বিপ্লবী মানুষের উপস্থিতিই ছিল আমাদের মত নবীন কর্মীদের জন্যে টনিকের মত! মুশকিল হচ্ছে, স্যার প্রচণ্ড শ্রদ্ধার- তাই বলে স্যারের ছেলেপুলেদেরো একইরকম শ্রদ্ধা করবো- সেটা তো হতে পারে না- অনেকটা এইরকম ত্যাদোড় টাইপের চিন্তার কারণে অভিজিৎ রায়কে হাতের কাছে পেয়েও দূরে ঠেলে দিয়েছি ...

আমার রাজনৈতিক সংগঠনের বা দলের একটা অনুষ্ঠান ছিল- টিএসসি মিলনায়তনে। তার এক ফাঁকে দেখলাম, অজয় রায় স্যার এক বান্ডিল বই আনালেন। সেই বই টিএসসি অডিটরিয়ামের সামনে টেবিলে সাজানো হলো, সংগঠনের কর্মীরা দায়িত্ব নিয়ে বসে বিক্রি করা শুরু করলো! হাতে নিয়ে দেখি বইয়ের নাম- আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী, লেখক- অভিজিৎ রায়! শুনলাম- তিনি অজয় রায় স্যারের জ্যেষ্ঠ সন্তান, আমেরিকায় থাকেন। বই লিখেছেন। আমার মনে হলো- কত গুরুত্বপূর্ণ বই থাকতে এটা কেন আমাদের সংগঠন বিক্রি করবে! ধারণা করলাম, অজয় রায় স্যারের অনুরোধে আমাদের সংগঠন এ কাজ করছে। ফলে, আমার কাছে- গুরুত্ব দিয়ে বইটি উলটে পাল্টে দেখারো প্রয়োজন মনে হয়নি ... নিতান্ত অবহেলায় সামান্য উলটে পাল্টে যতটুকু দেখেছি- তাতে আগ্রহ তো তৈরি হয়ইনি, আরো বিরক্তি তৈরি হয়েছে- ‘আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী’- কাব্যিক নামের কারণে ভেবেছিলাম- এটা গল্প/ উপন্যাস টাইপের কোন সাহিত্য-টাহিত্য হবে হয়তো, ভেতরে আবার দেখি- বিজ্ঞান-বিজ্ঞানীদের টুকটাক আলোচনা, কি না কি গজাখিচুরি জিনিস লিখেছে ভেবে রেখে দিয়েছি ... অভিজিৎ রায়, আমাদের অভিজিৎ দা’র সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ এখানেই শেষ ... অজয় রায় স্যারের জ্যেষ্ঠ পুত্র, আমেরিকায় থাকেন- একটি বই লিখেছেন ... ব্যস এতটুকুই চেনা তাঁকে! ফলে, তাকে বেশি মনে রাখার দরকারো নেই ... সুতরাং একরকম ভুলেই ছিলাম- বলা চলে মুক্তমনা ওয়েবসাইটের সাথে পরিচিত হওয়ার আগ পর্যন্ত ... (পরে, আমার মনে হয়েছে-এই বইটার নাম এমন কাব্যিক না হয়ে খটোমটো কিছু হলেও হয়তো ভালো হতো ... এভাবে হেলায় রেখে দিতাম না হয়তো ...)

২০০৫ সালে পড়াশুনার পাট চুকেবুকে চাকুরিতে যুক্ত হওয়ার পরে ইন্টারনেট দুনিয়ার সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আমার, তার আগে ভার্সিটির হলকেন্দ্রিক জীবনে কোন কোন হলে নেট কানেকশন আসে, আবার প্রশাসন ডিসকানেক্ট করে দেয়-অনেকটা ইঁদুর বিড়াল দৌড়ের মত করে। যদিও আমরা দাবী তুলেছিলাম হলে হলে ইন্টারনেট কানেকশন দিতে হবে, ব্যক্তিগতভাবে সেভাবে কানেক্টেড হইনি ... বন্ধুদের যারা যুক্ত হয়েছিল- দেখতাম তারা মহা আগ্রহে বিভিন্ন ম্যাসেঞ্জারে, চ্যাটরুমে চ্যাট করতো- অপরিচিত নানাজনকে 'এ-এস-এল' প্রশ্নটি দিয়ে শুরু করতো এবং জবাব মনোপুত না হলেই 'বাই' বলে দিত ... এই কাজে আগ্রহ পাইনি, ফলে সেভাবে ইন্টারনেট দুনিয়ায় ঢুকাও হয়নি। চাকুরি জীবনে ল্যাপটপ আর নেট কানেকশন পাওয়ার পরে কাজের ফাঁকে ফাঁকে ইন্টারনেট এর জগতে বিচরণ শুরু হয়, গুগলডটকম এ সার্চ দিয়ে কত দারুণ দারুণ সাইটে ঢুকছি, অপার বিস্ময়ে সেগুলো গোগ্রাসে গিলছি, আর্ট-কালচার- ইতিহাস আর দেশ বিদেশের পলিটিকাল মুভমেন্ট- এসবই ছিল মূল আকর্ষণের জায়গা ... এই ঘুরতে ঘুরতেই হঠাত একদিন পেয়ে গেলাম মুক্তমনাডটকম নামে একটা সাইট! বাংলা ভাষায় এমন একটা সাইট থাকতে পারে- সেটা ছিল কল্পনারও অতীত ... সময় সুযোগ পেলেই অফিসে চুপে চাপে কোনার দিকে সিটে বসে অন্যান্য সাইট ওপেন রেখে সেসবের ফাঁকে মুক্তমনা ওয়েব সাইটে ঢু মারতাম ... কামরান মির্জা, ফতেমোল্লা, আবুল কাশেম, আকাশ মালিক, ... এমন কতজনকে যে আবিস্কার করলাম- আমি একদম জানতামই না যে, আরজ আলী মাতুব্বর- তসলিমা নাসরিন- হুমায়ুন আজাদ - আহমদ শরীফ এরকম কয়েকজন ছাড়া আর কেউ নাস্তিকতা বিষয়ে- ধর্মের সমালোচনামূলক লেখা লেখছেন- তাও আবার বাংলায়! এবং পেলাম অভিজিৎ রায়কে ... মুক্তমনার স্রষ্টা, মুক্তমনার প্রাণ ... মুক্তমনায় র্যাবশনালিটি নামে একটা সেকশন ছিল- সেটায় ঢুকলে অসংখ্য প্রবন্ধ পাওয়া যেত ... ধর্মকে এমন সরাসরি আক্রমণ, কিন্তু সম্পূর্ণ যুক্তির উপরে ভিত্তি করে সিরিয়াস টাইপ লেখা- ঐ সময়ে বাংলায় খুব বেশি ছিল না! তসলিমা নাসরিন, হুমায়ুন আজাদ- কিছু লিখেছেন, ওপার বাংলা থেকে পেতাম প্রবীর ঘোষ, ভবানী প্রসাদ সাহু, দেবী প্রসাদের বই পত্র- সেগুলোর ধরণ ছিল নির্দিষ্ট রকম! কিন্তু কোরআন, হাদীস ধরে ধরে, মুহম্মদ এর জীবনী ধরে ধরে এমন সব লেখা আমি মুক্তমনাতেই প্রথম পেয়েছি! সবচেয়ে দারুণ যে ব্যাপারটা মনে হয়েছে- আরজ আলী মাতুব্বর, হুমায়ুন আজাদ, তসলিমা নাসরিন, আহমদ শরীফ, প্রবীর ঘোষ, ভবানীপ্রসাদ সাহু- কেবল হাতে গোনা এই কজনই না- সাহস নিয়ে ধর্মান্ধদের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে লিখে যাচ্ছেন আরো অনেকেই ... মুক্তমনার লেখক প্যানেলের সংখ্যাটাও তাই আমার কাছে ছিল বিশাল গুরুত্বপূর্ণ। আজকের সময়ে অসংখ্য ব্লগ প্লাটফর্ম, অনেক তালিকাভূক্ত ও তালিকাহীন নাস্তিক লেখকদের ভীড়ে- সে সময়ে মুক্তমনার আবেদন যে কি ছিল বুঝা কঠিন হতে পারে ... কিন্তু ঐ সময়ে আমাদের মত নিঃসঙ্গ নাস্তিকদের জন্যে মুক্তমনা ছিল আশার প্রদীপবাতির মত। 'আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী'- মুক্তমনা ছিল সেই আলো হাতে চলা আঁধারের যাত্রী, অভিজিৎ রায় ছিলেন আলো হাতে চলা আঁধারের যাত্রীদের কাপ্তান, নাবিক ...!

২০০৭ সালে সামু ব্লগের খোঁজ পেয়ে যাই এক বন্ধু মারফত ... সে সময়ে আমি রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে- আমার রাজনৈতিক জীবনের সব বন্ধুদের থেকে বিযুক্ত থেকে- নিজের পরিবার নিয়ে

জীবন যাপন করছিলাম ... কি যেন ভেবে সিদ্ধান্ত নিলাম- ব্লগে রেজিস্ট্রেশন করার ... হাতের কাছেই ছিল- আরজ আলী মাতুব্বর সমগ্র, সেই বই থেকে দেখে দেখে দুটো প্রশ্ন কপি করলাম- নাস্তিকতা বিষয়ক, নিক নিলাম নাস্তিকের ধর্মকথা- পোস্ট দিয়ে দিলাম ... প্রোফাইল পিক হিসাবে আরজ আলী মাতুব্বরের ছবি লাগিয়ে দিলাম ... নাস্তিকতা বিষয়ক লেখালেখি- বিশেষ করে বিভিন্ন ধার্মিক পোস্টে তর্ক বিতর্ক শুরু করে দিলাম এই নিক থেকে ... আজ এতদিন পরে যখন ভাবি- ঠিক ঐ মুহূর্তে কেন নাস্তিকতা বিষয়ে লেখালেখি শুরু করতে গেলাম- সেটা তো হতে পারতো- রাজনীতি, দেশ, সমাজ, বিজ্ঞান- এমন নানা বিষয়েই ... তখন মুক্তমনার ভূমিকা স্বীকার না করে পারি না ... মুক্তমনাডটকম ঐ সাহসটি জুগিয়েছিল যে, নাস্তিকতা নিয়েও লেখা যায় ... আমাদের জেনারেশন তসলিমা নাসরিনের নির্বাসন প্রত্যক্ষ করা জেনারেশন- তখন আমি মাধ্যমিক শেষ পর্যায়ের ছাত্র, আমাদের জেনারেশন হুমায়ুন আজাদের উপর নৃশংস হামলা প্রত্যক্ষ করা জেনারেশন- তখন আমি ভার্সিটি স্টুডেন্ট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই লম্বা মিছিল করা, পুলিশের বাড়ি খেয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার অভিজ্ঞতাপুষ্ট, তসলিমা নাসরিন - হুমায়ুন আজাদের প্রভাব আমার উপর অনেক, জানি আমাদের ও আমাদের সমসাময়িক জেনারেশনের নাস্তিকদের উপর তাদের প্রভাব অনেক! একইভাবে, এই মুক্তমনা ওয়েব সাইটের প্রভাবও আমার উপরে ভীষণ রকম বেশি ... মুক্তমনার লেখকদের প্রভাব অনেক বেশি ... আমার কেন জানি মনে হয়- এই ওয়েবসাইট না থাকলে, তসলিমা নাসরিন না নির্বাসিত হলে, হুমায়ুন আজাদের উপরে নৃশংস হামলা না হলে, এবং আরজ আলী মাতুব্বর না থাকলে- "নাস্তিকের ধর্মকথা" নিকের পয়দা হতো না ... অন্য নিকের পয়দা হয়তো হতো- রাজনীতি, ইতিহাস, সমাজ, দেশ বা অন্য যেকোন বিষয়ে যেকোন একটা নিক নিয়ে সামু ব্লগে লেখতাম ... নাস্তিকতা নিয়ে হয়তো সেভাবে মাথা ঘামাতাম না ...

২০০৭ থেকে সামু ব্লগে লেখালেখি- তর্ক বিতর্ক চলতে চলতেই- হঠাত আগ্রহ হলো- মুক্তমনাতে লেখা পাঠাতে ... সামু ব্লগের আমার একটা লেখা আরেকটু ঘষামাজা করে- ভয়ে ভয়ে মেইল করলাম! মেইল এড্রেস চার্বাক_বিডি! চার্বাক দর্শন নিয়ে আমার এমন আকর্ষণ যে, মনে হয়েছিল- ইশ, এমন মেইল এড্রেস আমিই তো রাখতে পারতাম ... অভিজিৎ দা- সাদরে ওয়েলকাম করে আমার সেই লেখাটা ছাপিয়ে দিলেন! সেই থেকে অভিজিৎ দা আর ফরিদ আহমেদকে মাঝে মধ্যে মেইল করে লেখা পাঠাতাম- তারা ছাপিয়ে দিতেন ... । এতটুকুই ছিল সম্পর্ক! সামু ব্লগে পুরো সময় কাটাই- ধার্মিকদের সাথে তুমুল উৎসাহে তর্ক বিতর্ক করি- সেই তর্ক বিতর্কগুলোকেই আরেকটু সাজিয়ে গুছিয়ে নিজের পোস্ট তৈরি করে ফেলি- আর এই পোস্টগুলোর মধ্যে যেগুলো একটু মানসম্পন্ন বলে মনে হয়- সেগুলো মুক্তমনায় পাঠিয়ে দেই ... এভাবেই চলছিল- এর মধ্যে একদিন জানতে পারি, মুক্তমনাতেও ব্লগিং অপশন শুরু হবে! খুশী হলাম খুব! একদিন অভিজিৎ দা মেইল দিয়ে মুক্তমনায় আমার ইউজারনেম পাসওয়ার্ড জানালেন! মানে, এখন থেকে আমি চাইলে মুক্তমনায় সরাসরি লেখা পোস্ট করতে পারবো- মেইল করে পাঠাতে হবে না ... ! মুক্তমনা ব্লগার হয়ে গেলাম ...।

তবে, সত্যি বলতে কি মুক্তমনায় সময় কমই কাটাতাম, কেননা আমার লেখালেখির বড় রসদ আমি পেতাম ধার্মিকদের ধর্মীয় পোস্টে- তর্ক বিতর্ক করতে করতে, যেটা সামু ব্লগে পাওয়া যেত। মুক্তমনায় আমার পোস্টে মাঝে মধ্যে দু একজন ধার্মিকের কমেন্ট পেতাম, কিন্তু সেগুলোতে মুক্তমনা বন্ধুরা এমনভাবে জবাব দিতো যে, আমার করার কিছু থাকতো না! ফলে, ব্লগার হিসাবে মুক্তমনায় খুব বেশি একটিভ ছিলাম- এটা বলা যাবে না। বন্ধুদের পোস্ট পড়তাম- মাঝে মধ্যে কমেন্ট করতাম- আর বেশ কিছুদিন পর পর আমার ব্লগ পোস্ট- এই হচ্ছে মুক্তমনায় পদচারণা। মাঝখানে কিছুদিন আমু ব্লগেও গিয়েছিলাম- কিন্তু যাদের আহবানে সেখানে গিয়েছিলাম- সেই মডারেটর প্যানেলের নীতিহীনতা- আমু ব্লগের প্রতি আগ্রহ দূর করে দেয়, সচলায়তনেও গিয়েছিলাম- তাদের কঠিন নিয়ম নীতি, অতিথি থেকে সচল হওয়ার জন্যে নিজ পরিচয় তাদের এডমিনকে জানানোর বাধ্যবাধকতা- সেখানেও থিতু হওয়ার আগ্রহ উবে দেয়। সামু ব্লগেই বিচরণ চলতে থাকে- সাথে ছিল মুক্তমনা। মুক্তমনায় বিচরণ কম হলেও- সবসময় মুক্তমনাকে নিজের ঘর-বাড়ির মতই মনে করতাম ... মুক্তমনা ছিল (এখনো আছে) একেবারে নিজের জায়গা! মুক্তমনার ব্লগার, লেখকরা ছিলেন আপনজন ...

এর পরে আসে ফেসবুকের জামানা ... শুরুতে ফেসবুকের ব্যাপারে আমার একধরণের বিতৃষ্ণা ছিল ... ব্যক্তিগত ডায়েরি- হাঁটে ময়দানে প্রকাশ করা, ঘন্টায় ঘন্টায় প্রোফাইল পিক চেঞ্জ করা, ছবি আপলোড করা (এখন তো সেলফি এসে একেবারে মহামারি)- ইত্যকার নার্সিজমের চর্চাকেন্দ্র হিসাবে ফেসবুককে দেখতাম, বিরক্ত হতাম এবং দূরে থাকার চেষ্টা করতাম ...। কিন্তু একটা সময়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম হিসাবে এর গুরুত্ব বুঝতে পারি এবং ফেসবুকের ছোট ছোট স্ট্যাটাসের মাধ্যমে, নোটের মাধ্যমে, অনেকের সাথে চিন্তা শেয়ার করা যায়, আদান প্রদান করা যায়, এমনকি তর্ক-বিতর্কও করা যায় - এটাও অনুধাবন করতে পারি, বিশেষ করে সামু ব্লগের গুরুত্ব কমার পরে পরে যখন দেখলাম ফেসবুক নিজেই অনেকটা ব্লগের ভূমিকাও পালন করছে। সেই সাথে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার পেলাম-সেটা হচ্ছে, যোগাযোগ- সমমনাদের সাথে খুব সহজেই যোগাযোগ করতে পারছি, প্রাণ খুলে কথা বলতে পারছি, দ্বিমত থাকলে তর্কও করতে পারছি ...। এই ফেসবুক এর মাধ্যমেই অভিজিৎ দা'র সাথে কিছুটা যোগাযোগ পরিচয় বাড়ে, নানা আদান প্রদান হতে থাকে। এমনিতে আমার এই দিক থেকে আমি সবসময় ব্যক্তিগত আলাপ চারিতা এভোয়েড করতাম, খুব অল্প কজনের সাথেই সেটা হতো! ফলে, অভিদার সাথেও কথা হতো অনেকদিন পর পর। আমার হয়তো- বিজ্ঞানের একটা বিষয়ে খটকা, সহজ উপায় হিসাবে অভিদা'র কাছে হাজির হলাম- বিগ ব্যাং, শক্তির নিত্যতা- ইত্যকার প্রশ্ন করে বিরক্ত করলাম- তিনি বিরক্ত না হয়ে মহা উৎসাহে সহজ করে জবাব দিতেন। আবার দেখা গেল- ফেসবুকে অমি পিয়াল-জেবতিক এদের কোন ভূমিকা নিয়ে বিচলিত আছি- এর কড়া জবাব দেয়া দরকার অনুভব করছি- নিজের সময়ও কুলিয়ে উঠতে পারছি না- ভাবছি অভিদাকে নক করে দেখি তিনি যদি কিছু লেখেন- হুট করে দেখি আমি নক করার আগেই তিনি আমাকে একটা লিংক দিয়ে ইনবক্স করছেনঃ "লিখেই ফেললাম!" এই মানুষটার সাথে আমার নানা বিষয়ে দ্বিমত, ভীষণ দ্বিমত, রাজনৈতিক বিচার পদ্ধতি, মার্কসবাদ ইত্যাদি নানা বিষয়ে তার সাথে আমার দুস্তর ভিন্নমত- কিন্তু অবাক হয়ে দেখতাম- বাংলাদেশে সেক্যুলারিজম প্রসারে -

প্রচারে, বিশেষ করে বাংলা অনলাইন ছুনিয়ায় মুক্তচিন্তা প্রসারের ব্যাপারে ভয়ানক রকমভাবে তার সাথে আমার চিন্তার নৈকট্য! এই নৈকট্যের ব্যাপার খুব ভালো করে টের পাওয়া শুরু করলাম - আমাদের মুক্তমনাদের উপর আক্রমণ শুরু হওয়ার পর থেকে। আসিফ মহিউদ্দিনকে গ্রেফতার দিয়ে যার শুরু। আমি মুক্তমনায় লেখলাম, অভিদা ঐ সময় সম্ভবত অনলাইন ছুনিয়া থেকে কয়েকদিনের জন্যে বাইরে ছিলেন- ফিরে এসে সাধুবাদ দিলেন, তার কাজটি আমি করে দিয়েছি বলে। এভাবে চলেছে। মাঝখানে অন্যান্য কাজের চাপে 'নাস্তিকের ধর্মকথা' আইডি অনলাইনে প্রায় ইনএক্টিভ হয়ে থাকে। ২০১৩ সালে জানুয়ারি মাসে এসে আবার আক্রমণ! এবার সরাসরি শারীরিক আক্রমণ! এবারো আসিফের উপর। মুক্তমনায় আমি লেখি- অনেকেই লেখে। অভিদা মুক্তমনার বাইরেও লেখেন। মুক্তমনা পরিবার এই হত্যা প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নেয়। এই সময়কালে অভিদা'র সাথে অফলাইনে কথা হতো। দুজনই অনুভব করতে থাকি- ভয়ানক এক আক্রমণ নামতে যাচ্ছে- মুক্তমনা ব্লগারদের উপরে। আমি বিচলিত ছিলাম আমাদের অনেক বন্ধুরা ভয়ে লেখা বন্ধ করে দিচ্ছে দেখে। অভিজিৎ দা তখন থেকে যেন অভিভাবক। তাকেই নক করে জানালাম- এভাবে তো হবে না, ভয় পেয়ে গেলে তো চলবে না- এভাবে ময়দান ছেড়ে দেয়া চলবে না। অভিজিৎ দাও জানালেনঃ

'হ্যা, দেশটা খুব বাজে দিকে চলে যাচ্ছে। কিন্তু ভয় পেলে তো প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতই শক্তিশালী করা হবে। আসলে সবাই মিলে চিন্তা করার সময় এসেছে কি করা যায়। এভাবে সব কিছু তো মেনে নেয়া যায় না।'।

কিন্তু মাসখানেকের মধ্যেই টের পেলাম- যতখানি ভেবেছিলাম, তারো চাইতে ভয়ানক আক্রমণ ধেয়ে এসেছে- মুক্তমনাদের উপরে। গণজাগরণ মঞ্চের আন্দোলন যখন নতুন প্রজন্মের হাতে একটা ইতিহাস সৃষ্টির পথে- ঠিক সেই সময়ে থাবা বাবা খুন হয়। আজ আনসার বাংলা টিমের কর্ম পদ্ধতি যতটুকু আমরা জানতে পেরেছি- তাতে বুঝতে পারি, থাবা বাবাকে খুনের পরিকল্পনা শাহবাগ গণজাগরণের আরো আগেই নেয়া। যেকোন অপারেশনের অন্তত একমাস আগে খুনীদেরকে তাদের টার্গেট চিনিয়ে দেয়া হয়, তার সাথে টার্গেট এনালাইসিস, প্রশিক্ষণ, রেকি করা/ফলো করা, পরিকল্পনা ফাইনাল করা- সব কিছু মিলিয়ে শাহবাগ আন্দোলন শুরুর পরে পরিকল্পনা করে ১০ দিনের মাথায় যে এই হত্যাকাণ্ড সম্ভবপর ছিল না- সেটা নিশ্চিত বলা যেতে পারে। কিন্তু ঐ সময়ে আমরাও ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি। মেইন স্ট্রিম মিডিয়া থাবা বাবাকে শাহবাগ আন্দোলনের নেতা বানিয়ে দেয়, একই সাথে হেফাজত আর আমার দেশ গ্রুপও তাকে শাহবাগ আন্দোলনের নেতা বানিয়ে দেয়- কেবল পার্থক্য হলো- হেফাজতিরা তাকে বানালো চরম উগ্র নাস্তিক, আর বিডিনিউজ২৪ থেকে শুরু করে শাহবাগ আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল মিডিয়াগ্রুপ জানাতে লাগলো- থাবা বাবার ব্লগ- ফেসবুকে ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে তেমন কিছু পায়নি, বরং সেখানে আছে জামাত-শিবিরকে নিষিদ্ধের দাবি, যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি ... ইত্যাদি! অর্থাৎ থাবা বাবা যেন বা নাস্তিকই নয়, নাস্তিক হলেও ব্যক্তিগত জীবনে নাস্তিক- ব্লগে অনলাইনে নাস্তিকতা নিয়ে তেমন কিছু লেখেননি, তাকে হত্যা করা হয়েছে কারণ, তিনি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চেয়েছেন, তাকে হত্যা করা হয়েছে- কারণ তিনি জামাতের নিষিদ্ধের দাবী তুলেছেন! অথচ, এদিকে আমার দেশ, সংগ্রাম টাইপের পত্রিকাগুলো থাবা বাবার লেখা পর্যন্ত ছাপিয়ে দেয় ... এরই মধ্যে গণ জাগরণ মঞ্চ একের পর এক ভুল পদক্ষেপ নেয়া শুরু করে- থাবা বাবাকে গণ জাগরণের প্রথম শহীদ বানানো দিয়ে যার

শুরু, তারপরে ঘটা করে শাহবাগে থাবা বাবার জানাজা পড়া, তাদের কর্মসূচিতে মসজিদ-উপসানালয়ে দোয়া দরুদ পূজার আহবান জানানো- এসবের মধ্য দিয়ে গণজাগরণ মঞ্চ নিজেকে আস্তিক প্রমাণের আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকে! হেফাজতিরাও পেয়ে বসে, বিশেষ করে- ঘাপটি মেরে থাকা জামাতিরা, এমনকি প্রধান বিরোধীদল বিএনপিও সুযোগ নেয়ার চেষ্টা করে- অর্থাৎ শাহবাগ আন্দোলনকে নষ্ট করার লক্ষে হেফাজতিদের সাথে মিশে কাজ করতে থাকে, এবং একসময় -থাবা বাবা থেকে শাহবাগীরাই হয়ে যায় নাস্তিক। আর- গণ জাগরণ মরিয়া হয়ে ঘোষণা দিতে থাকে তারা নাস্তিক না, অতিশয় আস্তিক ... এই আস্তিক্য প্রমাণের ছাপ পড়ে তাদের কর্মসূচিতে ... সবকিছুর ফলাফল, নাস্তিকদের ফাসীর দাবিতে গোটা দেশের মোল্লারা ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে- নাস্তিক- ব্লোগার- শাহবাগী সমার্থক হয়ে দাঁড়ায় তাদের কাছে, হেফাজতিরা বড় বড় শো ডাউন করতে থাকে। আর শাহবাগ শুকাতে থাকে। তার চাইতে বড় ক্ষতি হয়ে দাঁড়ায়- দেশে মুক্তবুদ্ধির চর্চার! নাস্তিকতা একটা ভয়াবহ অপরাধ হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেয়ে যায়!

এখানেই শেষ না, বরং বলা যায় শেষের শুরু! শাহবাগ আন্দোলন শুকানোর দায়ভার নাস্তিকদের দেয়া শুরু করে দেয় অনেক শাহবাগী! আওয়ামীলীগপন্থী তথা ওলামালীগ পন্থী অনলাইন এক্টিভিস্ট, শাহবাগ কর্মী, সিপি গ্যাং- এরা শুরু থেকেই নাস্তিকদের বিরুদ্ধে ছিলই, এবারে যুক্ত হয় আরো অনেক প্রগতিশীল কর্মীরাও। থাবা বাবার লেখা, ধর্মকারীর লেখাপত্র যখন সারা দেশে আমার দেশ পত্রিকার মাধ্যমে প্রচার হচ্ছে এবং শাহবাগীরা মানেই নাস্তিক - এমন প্রচার যখন প্রাধান্য পাচ্ছে, গণ জাগরণ মঞ্চের অনেক আন্দোলনকর্মীর রাগ এসে যেন থাবা বাবার উপরে পড়ে। অথচ, এরা এটা বুঝতে পারলেন না- এই লেখাগুলো থাবা বাবারা লিখেছেন আরো অনেক আগে থেকেই! তুমুল ভাবে তারা নাস্তিকদের জ্ঞান দেয়া শুরু করলেন - কেন উগ্র নাস্তিকতা ঠিক নয়, কেন উগ্র নাস্তিকতা জঙ্গীবাদের মতই সাম্প্রদায়িকতা ... ইত্যাদি। অনেকের রাগ থাবা বাবার উপরে, থাবা বাবা কেবল নিজের খুনের জন্যে দায়ী নয়, সে দেশ জুড়ে সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প ছড়ানোর জন্যেও দায়ী ... । অবাক হয়ে খেয়াল করলাম- ঠিক একই ভাষায় উগ্র নাস্তিকতার বিরুদ্ধে কথা বলছে আমাদের মুক্তমনাদেরও অনেকেই! বামমনাদের অনেকেই!! প্রগতিশীল আন্দোলনের অনেকেই!!! এর চাইতে বিচলিত, এর চাইতে বিপন্ন আর কোন সময়ে বোধ করিনি! ওদিকে সরকার বাহাদুরও নাস্তিকদের বিরুদ্ধে কঠোর ভূমিকা নেয়ার অঙ্গীকার করলো, হেফাজতিদের আশ্বস্ত করতে চাইলো ..., নাস্তিক গ্রেফতারও শুরু হয়ে যায়! গ্রেফতার হওয়ার ভয়ে আত্মগোপন করি, ফেসবুক প্রোফাইল ডিএক্টিভেট করি, সামু ব্লগ থেকে অনেক পোস্ট ডিলিট করে ফেলি ... অন্যদিকে এরকম মুক্তমনা, বাম, প্রগতিশীল বন্ধুদের সাথে তর্ক করি, ঝগড়া করি, রেগে গিয়ে গালি গালাজ করি, আনফ্রেন্ড করি, ব্লক করি ... কি এক পাগলাটে অবস্থা ...! এই সময়ে সবচেয়ে শক্ত ও দারুণ ভূমিকা নিতে দেখেছি- অভিজিৎ রায়কে- আমাদের অভি দা- একা একটার পর একটা লেখা লিখে জানিয়েছেন- উগ্র নাস্তিকতা বলে কিছু নেই- কলমের উগ্রতার জবাব কলম দিয়েই দিতে হয় ...! আমি ভয় পেয়ে আমার আইডি থেকে এই ডিবেট, এই আলোচনা ঐ সময়ে করতে পারিনি, করেছি- অন্য আইডি থেকে- ব্যক্তিগত মেসেজ চালাচালিতে বা কারো স্ট্যাটাসের কমেন্টে! কিন্তু যেটা খুব দরকার ছিল - একটা শক্ত অবস্থান নেয়া- সেটা একমাত্র অভিজিৎ দা-ই সেসময়ে নিতে পেরেছিলেন! আসিফ

মহিউদ্দিন, আরিফুর রহমান সহ আরো অনেকেই শক্ত অবস্থান নিয়েছেন, কিন্তু তারা নিজেরাই তো তথাকথিত উগ্র নাস্তিকতার অভিযোগে অভিযুক্ত- ফলে দরকার ছিল অভিজিৎ দার মত কারো এমন একটা শক্ত অবস্থান নেয়ার ... সেটা তিনি নিয়েছিলেন! এই কথাটি, এই অবদানটি এভাবে বলছি- কারণ, এবারো যখন টানা নাস্তিক নিধনের উৎসব শুরু হলো, তখন আমাদের মুক্তমনায় ফরিদ আহমেদ- সেই একই ভাষায় উগ্র নাস্তিকতাকে দায়ী করলেন! আসিফ মহিউদ্দিনের কাবাকে রাঙানোর ছবি পোস্টকে কেন্দ্র করে- বিভিন্ন মুক্তমনা বন্ধুরা- আসিফের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে জানালো- এইসব উগ্রতার কারণেই আজ নাস্তিকদের এমন করুন দশা, মুক্তমনার মতো ওয়েবসাইটে-"নাস্তিক হত্যায় আমাদের দায়" নামে পোস্ট পাবলিশ হয়! যাদের কাছে প্রত্যাশা সবচেয়ে বেশি, তাদের এমন সব অবস্থান দেখে মাঝে মধ্যে হতাশা তৈরি হয়, পুরাটা সময় - আমি শুধু অভিদাকে হাতড়ে বেড়াই, ভাবি- অভিদা থাকলে এবারো তিনি নিশ্চয়ই শক্তভাবে দাঁড়াতেন... নাস্তিকদের- মুক্তমনাদের কোন কর্মপদ্ধতি বেশি কার্যকর- এই প্রশ্নে আমি ফরিদ আহমেদ, সুব্রত শুভ সহ যারা কথা বলছেন- তাদের সাথে খুবই একমত! আমি অবশ্যই মনে করি, আমার যদি উদ্দেশ্য হয়- একটা সেক্যুলার সমাজ নির্মাণ, আমার যদি উদ্দেশ্য হয়- আস্তিক, ধার্মিক, বিশ্বাসী মানুষদের মাঝে কাজ করে তাদের পাল্টানো- তবে কখনোই তাদের প্রতি চুড়ান্ত অবজ্ঞা, অশ্রদ্ধা, ঘৃণা প্রকাশের মাধ্যমে এতটুকু অগ্রসর হওয়া সম্ভব না! তাদের বিশ্বাসকে, অনুভূতিকে আঘাত দিয়ে, আহত করে তাদের পাল্টানো বা পথে টানা কঠিন, বরং উল্টোটা হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি- আহত হয়ে তারা আরো বেশি করে বিশ্বাসকে আকড়ে ধরতে পারে! শুরুতেই যদি কানে তুলা দিয়ে রাখে, তবে আমাদের কথা তাদের কানে পৌঁছাবে কি করে, আর আমাদের চিন্তা, যুক্তি তাদের চিন্তা -মননে- বোধে কিভাবে ক্রিয়া করবে? কিভাবে প্রশ্ন তৈরি করবে? কিভাবে নিজেদের মধ্যে লালিত বিশ্বাসকে প্রশ্নের মধ্যে ফেলবে? এই জায়গা থেকে আমি অবশ্যই মনে করি, ধর্ম- ধর্মীয় বিশ্বাস- ধর্মীয় প্রাণপুরুষদের নিয়ে স্যাটায়ার, টিটকারী, অপমানসূচক কথাবার্তা- এসবের চাইতে যুক্তিবুদ্ধির পথ অনেক কার্যকর, বিজ্ঞান চেতনা বা বিজ্ঞান মনস্কতা তৈরি করা, তাদের মধ্যে প্রশ্ন তৈরি করে দিতে পারা অনেক অনেক কাজের! আরজ আলী মাতুব্বরের সহজ সরল প্রশ্নগুলো যে কত ধর্মপ্রাণ মানুষের ঘুম কেড়ে নিয়েছে, কতজনকে আলোর পথ দেখিয়েছে- দেবীপ্রসাদের 'যে গল্পের শেষ নেই', বন্যা আহমেদের 'বিবর্তনের পথ ধরে', প্রবীর ঘোষের 'অলৌকিক নয় লৌকিক', অভিজিৎ রায়ের 'বিজ্ঞানময় কিতাব'- এই বই/ প্রবন্ধগুলো নীরব ঘাতকের মত কত যে ধার্মিকের বিশ্বাসের মর্মবস্তুকে আঘাত করে চলেছে! কোন সন্দেহ নেই যে, এরকম যুক্তিপূর্ণ আলোচনা, লেখাপত্রই অনেক অনেক বেশি কাজের। কিন্তু, তার মানে এই না যে, আরেকজন স্যাটায়ার করতে পারবে না, টিটকারী করতে পারবে না, কাবাকে রংধনু রঙে রাঙাতে পারবে না! কেন আমি বা আমরা ভাবছি- আমাদের সকলের একই রকমের উদ্দেশ্য থাকবে? কেন আমি ভাবছি যে, আমরা সকলেই আস্তিকদের ধরে ধরে মায়া মমতা দিয়ে বুঝিয়ে শুনিয়ে নাস্তিক বানানোর মিশনে নেমেছি? কোন একজন তো - কেবল মনের আনন্দে একটা মজা বা স্যাটায়ার করতে পারে বা তার মনের রাগ ক্ষোভ ঝাড়তেও একটা লেখা লেখতে পারে! একজন নাস্তিক তার পরিবার, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব- চারপাশের যাবতীয় ধার্মিক ব্যক্তিদের হাতে নানা ভাবে নিগৃহীত, লাঞ্ছিত, অপমানিত হয়ে যদি সে ধার্মিকদের নিয়ে, ধার্মিকদের ধর্ম বিশ্বাস নিয়ে- মনের ঝাল মেটায় তার লেখনিতে- সেটার জন্যে কেন আমি তার প্রতি রুষ্ট হবো?

বুঝতে হবে, সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামনব বলে যাদের দাবী করা হয়- তাদের জীবদ্দশাতে এমন সব আচার, জীবনাচরণ পাওয়া সম্ভব যা হাস্যরস তৈরি করতেই পারে! মহান চরিত্রের অধিকারী হিসাবে আখ্যা দেয়া মুহম্মদকে বা কৃষ্ণকে কেউ যদি লম্পট বা লুচ্চা বলে- তাতে কোন ভুল নেই যেহেতু, সেহেতু তাকে এর জন্যে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো যায় না! অসংখ্য ভুলে ভরা কোরআন, বেদ, বাইবেলকে যখন ধার্মিকরা যাবতীয় জ্ঞান ও বিজ্ঞানের আধার বলে দাবী করে- তখন এর চাইতে হাস্যকর বিষয় আর কি হতে পারে? ফলে- কেউ যদি সেই হাসি তামাশা টিটকারী করে- তাতে আমি কোন ভুল পাই না, অপরাধ তো নয়ই ...! বড়জোর তাদের এতটুকু বলতে পারি, ভাই এভাবে ধার্মিকদের পাল্টাতে পারবা না, ভাই- এভাবে মুহম্মদ- কৃষ্ণকে হাজারবার লুচ্চা বলেও ধার্মিকদের মনের শ্রদ্ধা এতটুকু কমাতে পারবা না, কোরআন-বাইবেল এর উপর চায়ের কাপ রেখে, পা দিয়ে মাড়িয়ে, পুড়িয়ে এই গ্রন্থগুলোর অলৌকিকতা সম্পর্কে এতটুকু সন্দেহ দূর করাইতে পারবা না! ব্যস- এতটুকুই বলতে পারি! কিন্তু কেউ যখন বলে- এভাবে ধার্মিকদের ধর্মানুভূতিতে আঘাত দেয়া ঠিক না, এমন করা ঠিক না, এতে ধার্মিকরা আরো জঙ্গী হয়ে উঠবে, এর কারণেই নাস্তিকদের ধরে ধরে খুন করা হচ্ছে ... ইত্যাদি, তখন আমি তীব্রভাবে দ্বিমত করি, আপত্তি জানাই এবং আরো জোরেশোরে দাবী তুলতে চাই যে, সমস্ত ধর্মগ্রন্থ, ধর্মপুরুষ, ধর্মালয় নিয়ে স্যাটায়ার, সমালোচনা, হাসি তামাশার অধিকারও আমাদের আছে, থাকা উচিৎ!

২০১৩ সালে যখন হেফাজতিরা, আমার দেশ গ্রুপ থেকে শুরু করে তথাকথিত প্রগতিশীল, মডারেট-ভদ্র মুক্তমনারা পর্যন্ত প্রমাণ করে ছাড়লো যে, থাবা বাবা একজন উগ্র নাস্তিক, একজন বাজে লেখক, ইসলামকে নিয়ে চটি টাইপের অশ্লীল লেখার লেখক, তখন অভিজিৎ রায় শক্ত ভাবে দাঁড়িয়ে বলেছেন,

'রাজীব কেমন লিখতো, তার লেখা মানোত্তীর্ণ কিনা, তার লেখা যুক্তিবাদী আন্দোলনকে পেছনে হটিয়ে দিচ্ছে কিনা - এ নিয়ে হাজারো তর্ক করা যায়, কিন্তু একটি বিষয়ে আমরা বোধ হয় একমত হতে পারি - মত প্রকাশের জন্য মৃত্যু তার অভীষ্ট হতে পারে না'।

'থাবা বাবা যুক্তিবিহীন অশ্লীল বক্তব্য দিয়ে ধর্মীয় বিষয়ে কটাক্ষ করেছেন' এমন অভিযোগের জবাবে অভিজিৎ রায় বলেছেনঃ

'রাজিবের চেয়ে ঢের অশ্লীল, কুৎসিৎ এবং বিদ্বেষী বক্তব্য ধর্মগ্রন্থ এবং ধর্মপ্রচারকদের জীবনেই পাওয়া যায়। নারীকে শস্যক্ষেত্রের সাথে তুলনা করা, বিধর্মীদের কতল করা, শুদ্রদের পশ্চাৎ দেশে গরম লৌহ শলাকার ছ্যাকা দেয়া, যুদ্ধবন্দিনী কিংবা পালকপুত্রের স্ত্রীকে দেখে লালায়িত হয়ে সহবাস করার আয়াত বা শ্লোকগুলো রাজীবের লেখার চেয়েও ঢের বেশি অশ্লীল। ততোধিক অশ্লীল হচ্ছে মনু সংহিতা কিংবা মকসদুল মোমেনীনের মত কুগ্রন্থগুলো। নয়?"

ব্যাপার হচ্ছে- অশ্লীল, যুক্তিহীন লেখাই শেষ কথা নয়, বা মূল বিষয় নয়, আসল কথা হচ্ছে- ধর্মানুভূতিতে আঘাত পাওয়া। থাবা বাবাকে মারা হয়েছে বা আসিফ মহিউদ্দিনকে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে- কারণ তারা ধর্মানুভূতিকে আঘাত দিয়ে লিখেছেন। আমাদের অনেকেই ভাবছি- তাদের লেখা একটু বেশী খোলামেলা টাইপের আক্রমনাত্মক, মানের দিক থেকেও ভালো না- গালিগালাজ,

খিস্তিখেউড়ে ভরা, সুতরাং এসবে তো ধর্মানুভূতি আহত হতেই পারে। কিন্তু আমরা এমনটা ভাবতে গিয়ে ভুলে যাচ্ছি- এই ধর্মানুভূতি ব্যাপারটাই কতখানি হাস্যকর একটা বিষয়, এটা কতখানি আপেক্ষিক ও বায়বীয় ব্যাপার! কবে যে কার কাছে কোনটা ধর্মানুভূতিতে আঘাত দিবে, বলা মুশকিল! মিলাদের সময়ে ইয়া নবী সালায় মালায় কা- দাঁড়িয়ে বলা হবে না বসে বলা হবে এটাকে কেন্দ্র করে দুই গ্রুপ পরস্পরের বিরুদ্ধে ধর্মানুভূতিতে আঘাতের অভিযোগ টেনে সংঘাতে লিপ্ত হয়েছে- এমন নজিরও আছে। ২০১৩ সালে হেফাজতিরা তালিকা তৈরি করে সরকারের জমা দেয়ার সময় অনেক ব্লগারের ব্যাপারে ধর্মানুভূতিতে আঘাতের তথ্য প্রমাণও জমা দিয়েছিল। তাতে অভিজিৎ রায়ের নামে যে ফাইলটি ছিল- সেখানে বড় অংশ জুড়ে ছিল- সমকামিতার পক্ষে অভিজিৎ রায়ের বক্তব্য, লেখালেখি, বই পত্র! থাবা বাবার মত ঘৃণিত নাস্তিকের হত্যার প্রতিবাদ জানানোও কারো কারো কাছে যে ধর্মানুভূতিতে আঘাতের সমান- সেটা ঐ সময়ে অভিজিৎ দা'র অনলাইন নিউজ পোর্টাল সমূহে প্রকাশিত প্রবন্ধের নিচে থাকা কমেন্টগুলো দেখলেই বুঝা যেত! ২০১৫ সালে এসে আমরা অনেক দাম দিয়ে বুঝলাম।

২০১৩ সালেই যেটা শুরু হয়েছিল, মাঝখানে বছর দুয়েকের বিরতি দিয়ে এ বছর আবার সেটা শুরু হয়েছে! ঘটনাগুলো মিলিয়ে দেখলে বুঝা যায়- এরকম পরিকল্পনা সম্ভবত ২০১৩ সালেই ছিল, প্রতিমাসে একজন করে নাস্তিক হত্যা, শুরুতে আসিফ মহিউদ্দিন জানুয়ারি মাসে, তারপরে ফেব্রুয়ারিতে থাবা বাবা ... হয়তো পরিকল্পনায় মার্চ- এপ্রিল নাগাদ আরো কেউ একজন ছিল ...। গণ জাগরণ মঞ্চ, হেফাজত ইত্যকার নানা পরিস্থিতি, নাস্তিকদের ফাসীর দাবীতে সারাদেশে জনমত গঠন, নাস্তিকদের গ্রেফতার- প্রভৃতির মধ্য দিয়ে সারাদেশে নাস্তিকদের বিরুদ্ধে একটা পরিবেশ তৈরি করা- সব মিলিয়ে সম্ভবত খুনীরা ঐ সময়ে সাময়িক বিরতি টেনেছিল। তারপরে বছর দুই ধরে প্রস্তুতি নিয়েছে, ক্যাডার রিক্রুট করছে, শক্তি সামর্থ্য অর্জন করেছে এবং এ বছর এসে মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে নেমে পড়েছে, একের পর নাস্তিক হত্যার মহা-উৎসব শুরু করেছে! কোন কুক্ষণে যে, অভিজিৎ রায়, আমাদের অভিদা- দেশে এসেছিলেন! এসে জঙ্গীদের নাস্তিক হত্যার এই মহোৎসবের প্রথম বলি হলেন! তার পরে একে একে ওয়াশিকুর বাবু, অনন্ত বিজয় এবং সর্বশেষ নিলয় নীল- মূল্যবান তরতাজা প্রাণ তারা কেড়ে নিল ...! আমরা হারালাম, আলো হাতে আঁধারের যাত্রীদের!

ফেব্রুয়ারি বইমেলার শেষ দিকে হুমায়ুন আজাদকে চাপাতির মুখোমুখি হতে হয়েছিল! ১১ বছর পর একই সময় কালে, প্রায় একই জায়গায় অভিজিৎ রায় আর বন্যা আহমেদের উপর চাপাতির আঘাত নেমে আসে। আমি অফিস থেকে ফিরে রাতে খেতে বসেছিলাম, এক বন্ধুর ফোনে শুনলাম ভয়ঙ্কর এই ঘটনাটা, শুনলাম আহতাবস্থায় দুজনই ঢাকা মেডিক্যালে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার ফোনে শুনলাম- খবর খুব খারাপ, অভিজিৎ দা সম্ভবত নাই ... সেই রাতে হরতাল- অবরোধের বোবা রাতগুলোর একটা- যখন রিকশায় উঠছি, ফোনে শুনতে পেলাম- টেলিভিশনে স্ক্রলে দেখাচ্ছে- অভিজিৎ দা আর নাই ...। ঢাকা মেডিকেল এর ইমার্জেন্সীর সামনে ছোট জটলার মধ্যে বোবা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি, বুঝে উঠতে পারি না- কি হলো, কিভাবে হলো, এখন কি করণীয়! অভিজিৎ দা কবে

এলেন, কেন এলেন, কেন এলেন- মাথায় শুধু এটাই ঘুরতে থাকে! পরদিনের টিএসসি'র প্রতিবাদ মিছিল-সমাবেশেও একইরকম হতভম্ব দাঁড়িয়ে থাকি ...! জীবনটা মনে হতে থাকে- যেন আটকে গেছে, আর বোধ হয় একে নড়ানো বা সরানো সম্ভব নয়! অভিজিৎ দা'র চলে যাওয়ার মধ্য দিয়ে আবিস্কার করলাম- এই মানুষটা আমার ভীষণ আপন ছিল, এত প্রিয়, এত শ্রদ্ধার, এত ভালোবাসার আসনে যে তিনি ছিলেন- দুটোদিন আগে টের পেলেও হয়তো, আমার (নাস্তিকের ধর্মকথার) নিভৃত যাপন দূরে ঠেলে তার সাথে দেখা করতাম, হাত দুটো ধরে 'আলো হাতে আঁধারের যাত্রী'কে আমার শ্রদ্ধাটুকু জানাতে পারতাম ...

অভিদা আরো ৪০/৪৫ টি বই, হাজার খানেক ব্লগ-ফেসবুক পোস্ট, পত্রিকার আর্টিকেল লেখতে পারতেন! বিজ্ঞানের নানা কঠিন বিষয় সহজ ভাষায় আমাদের সামনে হাজির করতে পারতেন। অন্ধকার, কুসংস্কার, ধর্মীয় কুপমন্ডুকতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তার খুরধার লেখনিতে আমাদের উদ্বুদ্ধ করতে পারতেন। আজকের এই চরম আধারে তিনি আলো হাতে আমাদের পথ দেখাতে পারতেন। কি অপরিমেয় ক্ষতি! আমি হারালাম আমার একজন প্রকৃত বন্ধু, বড় ভাই, অভিভাবক এবং সুহৃদকে যিনি যেমনই লেখিনা কেন, পিঠ চাপড়ে উৎসাহ দিতে ভুলতেন না! মানুষটাকে জানাতে পারলাম না পর্যন্ত যে- তুমি আমার পরম আপন জন, আমার বন্ধু, আমার ভাই, আমার অভিভাবক, আমার পরম শ্রদ্ধার একজন ...!

এই মানুষটা কি ভয়ানক সুন্দর! তার সৃষ্টি, তার লেখা, সংগ্রাম- এসব বাদ দিয়ে একজন মানুষ হিসাবেই তিনি ভীষণ চমৎকার! তর্ক বিতর্ক ক্যাচাল ঝগড়া- সব কিছুকে তিনি চিন্তার জগতের দ্বিমত হিসাবেই রাখতে পারতেন, ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে তার প্রভাব তিনি ফেলতে দিতেন না এতটুকু। তর্ক-বিতর্কের সময়ে এতটুকু ছাড় তিনি দিতেন না, কিন্তু পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধটুকু ঠিকই বজায় থাকতো! আজকে আমাদের মুক্তমনা নাস্তিকদের নানা মত, নানা পথ, নানা ক্যাচালের সময়ে একেকজনে দাত-মুখ খিচানো দেখে আমার কেবলই মনে হয়- এই মানুষটার কাছ থেকে কত কি শেখার আছে আমাদের ... ! আর, তার বিনয়! আজ আমাদের সামান্য ফেবু সেলিব্রেটি থেকে রথী মহারথীদের "আমি", "আমি", "আমি" এবং "মুই কি হনুরে"র ভিড়ে অভিদা ছিলেন ভয়ানক ব্যতিক্রম! তাকে নিজের কথা বলতে হতো না, তার কাজের মধ্য দিয়েই তাকে পাওয়া যেত, বুঝা যেত তার বড়ত্ব! হুমায়ুন আজাদ, তসলিমা নাসরিন প্রজন্ম হিসাবে গড়ে ওঠা আমাদের অনেক মুক্তমনা বন্ধুদের যখন খুব হামবড়া ভাব দেখিয়ে "আমি" "আমি" করতে দেখি- তখন ভাবি- অভিদাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা প্রজন্ম নিশ্চয়ই আমরা পাবো- যাদের মাঝে বিনয় থাকবে, একই সাথে থাকবে ভয়ানক তেজ- যে তেজ যাবতীয় অন্যায়- অন্ধকার- কুসংস্কারকে পুড়ে ছাই করতে উদ্যত হবে ...! আর, অভিদা'র সবচেয়ে বড় ব্যাপারটা - যা ইতোমধ্যে অনেকের লেখাতেই এসেছে- সেটা হচ্ছে, অন্যকে অনুপ্রাণিত করার ক্ষমতা! এই কাজটা পরম নিষ্ঠার সাথে করে গেছেন! ছোট থেকে বড়, সকলকেই তিনি মুক্তমনা লেখক বানানোর মিশনে নেমেছিলেন যেন! যেখানে যে মুক্তচিন্তা নিয়ে লেখছে- তাকেই তিনি আপহোল্ড করতেন, এবং উৎসাহিত করতেন! মন দিয়ে তাদের লেখা পড়তেন, তার মতামত জানাতেন এবং ভীষণভাবে আরো লেখার জন্যে অনুপ্রাণিত

করতেন। ছোট করে অজয় রায় স্যার আর বন্যা আপার কথা না বললেও হচ্ছে না ... ! তাদের অব্যাহত সংগ্রাম দেখি আর অবাক হয়ে ভাবি- কিভাবে পারছেন তারা? কোথা থেকে পান তারা এত শক্তি? ব্যক্তিগত শোককে কিভাবে তারা তাদের সংগ্রামে পরিণত করেন? অবাক হয়ে যাই, যত দেখি আরও অবাক হই! তাদের কাছ থেকে শক্তি পাই, মনে হয়- হাল ছাড়ার সময় আসেনি এখনো- যেতে হবে বহু দূর ...

অভিদার লেখা, তার সৃষ্টি নিয়ে অনেকে আলোচনা করবেন, করেছেন- আমি সেদিকে বিস্তারিত যাচ্ছি না! এই লেখাটা আমার ব্যক্তিগত মনোলগের মত করেই লেখার চেষ্টা করেছি! অভিজিৎ রায় আমার কাছে অভিজিৎ রায়- কারণ তার মুক্তমনা ওয়েবসাইট, আমদের মুক্তমনা ওয়েবসাইট! তিনি যদি, আর কিছু নাও করতেন- আর কোন বই নাও লেখতেন- শুধু এই মুক্তমনার কারণেই তাকে স্মরণ করতে হতো- আমাদের দেশে মুক্তচিন্তা, মুক্তবুদ্ধি, নাস্তিকতা, সেক্যুলারিজম প্রসারে মুক্তমনার অবদান অদ্বিতীয়। অভিদা'র বইগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রভাব বিস্তারী হচ্ছে-"সমকামিতা: বৈজ্ঞানিক এবং সমাজ-মনস্তাত্ত্বিক অনুসন্ধান"। কেননা বাংলা ভাষায় এই বিষয়ের উপরে এরকম বই এটাই প্রথম এবং এখনো পর্যন্ত সম্ভবত একমাত্র! বাংলাদেশে যদি কখনো সমকামিদের বা এলজিবিটিদের আন্দোলন তৈরি হয় ও সফলকাম হয়, তবে- তাদের এই বইটার কথা স্মরণ রাখতেই হবে! এবারো যখন সমকামিতা নিয়ে অনলাইনে যুক্তি তর্ক শুরু হলো, অবধারিতভাবে রেফারেন্স হিসাবে এই বইটা চলে এসেছে, তার চাইতেও বড় কথা- বিস্ময়করভাবে সমকামিদের অধিকারের পক্ষে যে আজ এত মানুষ দাঁড়ালো- তার পেছেওনেও সবচেয় বড় অবদান এই বইটির (আফসোস! অভিদা দেখে যেতে পারলেন না)! আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী, মহাবিশ্ব ও বুদ্ধিমত্তার খোঁজে, সমকামিতা, শুন্য থেকে মহাবিশ্ব- বিজ্ঞানকেন্দ্রিক এই বইগুলো পড়লে অনুযোগ তৈরি হতো, হয়- তার মাপের একজন বিজ্ঞান লেখক কেন বিজ্ঞান নিয়ে এত কম লিখছেন! স্বতন্ত্র ভাবনা (সংকলন), অবিশ্বাসের দর্শন, বিশ্বাস ও বিজ্ঞান (সংকলন)- ধর্মানুভূতিকে প্রচণ্ড আঘাত দিয়ে এই ধরণের অনুভূতি-বিশ্বাস সব ভেঙ্গেচুড়ে ঝেটিয়ে বিদায় করার মত দারুণ তিনটি বই ...। আর মুক্তমনা জুড়ে আছে- আরো অসংখ্য চমৎকার সব প্রবন্ধ! কিন্তু এসবের মাঝে- আমার মাথায় কেবল ঘুরছে- সেই বইটার কথা, যেটি আমি প্রথমে হেলায় রেখে দিয়েছিলাম! আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী! এই বইটিতে আলো হাতে চলা আঁধারের যাত্রীদের কথা যখন অভিজিৎ রায় লিখছেন, তখন নিজেও কি সেই পথের যাত্রী হওয়ার তাড়না বোধ করেননি, প্রেরণা টুকু পাননি? বইটি যখন পড়ি, তখন চোখের সামনে ভাসতে থাকে- এ সময়ের আলো হাতে চলা একজন আঁধারের যাত্রী- অভিজিৎ রায়...।

আমি অনুভব করতে থাকি, অভিদা চলে গিয়েও আমাদের মাঝে অনেক বেশি করে আছেন! তিনি এখনো আলো হাতে আঁধারে পথ দেখাতে দাঁড়িয়ে আছেন! আমিও নিজের ভেতরে তাড়নাবোধ করি! অভিদার হাতের আলো আমাদের সকলের হাতে উঠে আসুক। প্রতিটা মুক্তমনা হয়ে উঠুক আজকের আলো হাতে চলা আঁধারের যাত্রী।



“বরং দ্বিমত হও”

nymeria

অভিজিৎদা কে নিয়ে কিছু লিখতে হলে অবধারিতভাবে চলে আসে অনন্তদার “যুক্তি” ম্যাগাজিনের নাম, কারণ সেই থেকেই তো শুরু। ২০১০ সালের বইমেলায় লিটল ম্যাগ চত্বরে ঘোরাঘুরির সময় এক বন্ধুর আগ্রহে কিনে ফেলি “যুক্তি” ম্যাগাজিন। এসএসসি পর্যন্ত বিজ্ঞান বিভাগে পড়াশোনা করেছি, অথচ প্রাণের সূচনা আর এগিয়ে চলার পেছনে “বিবর্তনাবাদ” বলে সবচেয়ে যৌক্তিক যে ব্যাখ্যাটা আছে তা সম্পর্কে তেমন কিছু জানা ছিলনা।

ভাসাভাসাভাবে শুনতাম বিবর্তনবাদ “তত্ত্বমাত্র” যার মূল বক্তব্য হচ্ছে আমরা সবাই “বানর” থেকে এসেছি! জাকির নায়েক কোরান-বাইবেল-বেদ-এন্ড হোয়াট নট থেকে উক্তি আর ব্যাখ্যার তোড়ে সব অপোনেন্টকে নাস্তানাবুদ করে দিচ্ছেন এটা দেখে আশেপাশের সবাই যখন তৃপ্তিতে আহা উহু করত তখন মনে হত কিছু একটা মিলছেনা, লোকটাকে চালবাজের চেয়ে বেশি কিছু আমার মনে হতনা আমার। কিন্তু আমার যত সন্দেহ আর অবিশ্বাস এগুলোর পাকাপোক্ত ব্যাখ্যা ঠিক কিভাবে কোথায় পাব তা জানা ছিলনা, উলটো মাঝে মাঝে মনে হত আমারই কোন একটা সমস্যা আছে, নইলে আর কারো মনে তো এত সন্দেহ বা প্রশ্ন জাগেনা! ঠিক তখনই “যুক্তি” পড়ে জানলাম আমি একা নই, এই প্রশ্নগুলো করেছেন শুধু হুমায়ুন আজাদ বা আহমদ শরীফের মত ধরাছোয়ার বাইরের মানুষেরা নয়, আরো অনেকে।

“যুক্তি” থেকে মুক্তমনা ব্লগের ঠিকানা পেয়ে ঢু মারলাম, একের পর এক লেখা পড়তে লাগলাম আর আমার সন্দেহগুলো একে একে বল পেতে লাগল, ভেঙে পড়তে লাগল ধর্ম আর প্রথার মত আপাত “ইনভিন্সিবল” অযৌক্তিক বিষয়গুলোর ভিত। বিবর্তন তত্ত্বের সৌন্দর্য ও শক্তি সম্পর্কে ধারণা হল, “বিজ্ঞানময় কিতাব” এর মত অযৌক্তিক দাবিগুলোকে যুক্তি দিয়ে অগ্রাহ্য করার সাহস পেলাম। মহাবিশ্ব, সমকামিতা, শূন্য, প্রাণ, চুম্বনের ও ভালবাসার বিজ্ঞান, ভ্রমণ, সাহিত্য...একের পর এক বিস্ময়রাজ্যে ঘোরাঘুরি শুরু হল মুক্তমনার প্ররোচনাতেই।

মুক্তমনা থেকে জীবন বদলানো দুটো শিক্ষা পেয়েছিলাম- প্রথমটি হল “বরং দ্বিমত হও...” আর দ্বিতিয়টি হল কেউ কিছু একটা দাবি করলেই তা মেনে না নিয়ে কিভাবে যাচাই করে দেখতে হয়। দাদার একেকটা লেখায় দশ বিশ থেকে প্রায় শ খানেক রেফারেন্সও দেখে নিজের পড়াশোনার পরিসর, জানার পরিসরকে খুবই ক্ষুদ্র মনে হত- নেশার মত হয়ে পড়েছিল ব্লগ পড়া। মুক্তমনা ব্লগের অজানা-অচেনা-অদেখা মানুষগুলো আমার সময়ের এমনই অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গিয়েছিল যে

যখনই সুযোগ পেতাম মুক্তমনায় থাকতাম। এমনও সময় গিয়েছে যখন এত দ্রুত আর এত বেশি মন্তব্য টাইপ করতাম যে প্রায়ই “ধীরে বৎস ধীরে” ওয়ার্নিং পেতাম!

অভিজিৎদা এবং আরো অনেকের উৎসাহে একসময় লেখাও শুরু করি, সে ছিল আমার জীবনের এক উত্তাল সময়। আমার কাঁচা চিন্তাভাবনা থেকে উৎসারিত লেখায় আলোচনা, উৎসাহ আর মন্তব্য দিয়ে সাহায্য করেছেন সব অদেখা ভাই-আপু-বন্ধুরা। খুব উত্তেজনা নিয়ে একসময় সরাসরি দেখা করি মুক্তমনার কিছু বন্ধুর সাথে। অদ্ভুত আর মজার কিছু সময়, ঘোরলাগা কিছু আড্ডা -বইমেলায়! দুঃস্বপ্নেও ভাবিনি “বইমেলা” ব্যাপারটা একসময় অবিশ্বাস্য কিছু দুঃসময়ের স্মৃতির সাথে একাকার হয়ে যাবে।

মৃতদেহকেও যে খুন করা যায়, লাশেরও যে পরিচয় থাকতে হয়, তা আমরা সেই শাহবাগ আন্দোলনের সময় রাজীব হায়দারের মৃত্যুর পরে দেখেছি, অভিজিৎদার মৃত্যুর পর থেকে তার পুনরাবৃত্তি আরো জঘন্যরূপে শুরু হয়েছে। যেন দুপেয়ে একটা প্রানীর একটিই পরিচয়- জীবিত ও মৃত অবস্থায় তাকে হতে হবে মুসলিম-হিন্দু-বৌদ্ধ-ক্রিশ্চান-আস্তিক বা নাস্তিক, যেন মানবিকতার সংজ্ঞা তৈরি হতে হবে খৎনা বা ধর্ম দেখে, যেন “মানুষ” পরিচয়টাই মাঝখান থেকে হারিয়ে যেতে হবে!

যারা অভিজিৎদার মত মানুষদেরকে জীবনে ও মৃত্যুতে প্রতিনিয়ত হত্যা করে চলেছে- দাদা একটা ব্লগ লেখার জন্য যে পরিমান বই পড়তেন তার কণামাত্রও সারাজীবনে তারা পড়েনি। তারা জানেনা Being a true humanitarian is difficult, because it is the simplest of all the concepts. তারা বুঝবেনা নিচের এই কথাগুলো লিখতে হলে বুকে যে কতটুকু হৃদয় থাকতে হয়, মানবিকতা নিয়ে কি পরিষ্কার একটা ধারণা থাকতে হয়!

“Atheism is characterized by an absence of belief in the existence of supernatural gods or goddesses. To me, it is a rational concept to oppose any unscientific and irrational belief.

But being an atheist does not automatically guarantee you to be entirely free from prejudice or hatred, unless you have a genuine feeling for humanity. Whether you are religious or not, the nut cracks are everywhere. History suggests, there were indeed many non-religious heartless autocratic rulers who mercilessly killed numerous countrymen, now we know there is Craig Stephen Hicks too who has a hatred for Muslims. These criminals deserve no sympathy, no excuse.

The NC Chapel Hill killings are inhumane, disgusting, gruesome and should be denounced by every human being having a slightest level of conscience.
Today my thoughts are with Dea Shaddy Barkat, Yusor Mohammad, and Razan Mohammad Abu-Salha."

এই কথাগুলো মনে মনে আওড়াই প্রায়ই, এইরকম মানুষ হবার চেষ্টা করি। আমাদের চেষ্টাতেই অভিজিৎদা বেঁচে আছেন, থাকবেন।

মুক্তমনা
MUKTO-MONA

http://mukto-mona.com/avijit/index.php